বুদ্ধদেব বসুর মিথ-অবলম্বী কাব্যনাটকের ভাবাদর্শ ও শৈলীবিচার

তারানা নুপুর
রেজিস্ট্রেশন নম্বর:১৪১
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৩-২০০৪
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

449602
Dhaka University Library
449602

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
জুলাই, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

449602

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **তারানা নুপুর** কর্তৃক উপস্থাপিত **'বুদ্ধদেব বসুর মিথ-অবলম্বী কাব্যনাটকের ভাবাদর্শ ও শৈলীবিচার'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

৩৭/০৭/১০

ড. বেগম আকতার কামাল
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ২-৩৬

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সাহিত্যে মিথের ব্যবহার ও কাব্যনাটকে মিথ ২-২১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বুদ্ধদেব বসুর মিথ-ভাবনার স্বরূপ : কবিতা, অনুবাদ ও প্রবন্ধ ২২-৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৮-১৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে মিথের ব্যবহার : জীবনবোধে ও দর্শনে ৩৮-৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ কাব্যনাটকে মিথ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য : কাঠামো বিন্যাসে ও চরিত্র উদ্ভাবনে ৫৯-৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ সংলাপ ও ভাষাশৈলী ১০০-১৫৩

উপসংহার ১৫৪-১৫৬

পরিশিষ্ট ১৫৭-১৬০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বুদ্ধদেব বসুর মিথ-অবলম্বী কাব্যনাটকের ভাবাদর্শ ও শৈলীবিচার শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ডক্টর বেগম আকতার কামাল-এর তত্ত্বাবধানে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল. গবেষণাপত্ররূপে রচিত। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে তাঁর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার অন্যতম প্রবর্তনা। তাঁর সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি উন্মুক্ত ছিলো আমার জন্য। বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কিত সমস্ত গ্রন্থ, এমনকি সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্রিকা ও তথ্যাদি সরবরাহ করে তিনি নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন আমাকে। এই গবেষণায় আমার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে পরিপূর্ণতা দানে তাঁর অবদান অপরিসীম।

আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি আমার শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন-এর ঋণ, যাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মটিকে করেছে পরিশীলিত। বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়টি সম্পর্কে যিনি প্রথম আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ জ্ঞাপন করেন, তিনি আমার শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

বুদ্ধদেব বসুর মিথ-অবলম্বী কাব্যনাটকের ভাবাদর্শ ও শৈলীবিচার শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত দু'টি অধ্যায় বিদ্যমান। প্রথম অধ্যায় দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত – এক. 'সাহিত্যে মিথের ব্যবহার ও কাব্যনাটকে মিথ'; দুই. 'বুদ্ধদেব বসুর মিথ-ভাবনার স্বরূপ : কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদ। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের মিথের সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃতি নির্ণয় করে সাহিত্যে মিথ-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণসূত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে এই ধারার সাহিত্য-প্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে কাব্যনাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে কাব্যনাটকে মিথ-ব্যবহারের রূপরেখা ও ইতিহাস সম্পর্কে বিবৃত করা হয়েছে প্রথম পরিচ্ছেদেই। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদকে কেন্দ্র করে তাঁর মিথ-চেতনার ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

বুদ্ধদেব বসুর মিথ-অবলম্বী কাব্যনাটকের ভাবাদর্শ ও শৈলীবিচারী শীর্ষক গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত – এক. 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে মিথের ব্যবহার : জীবনবোধে ও দর্শনে'; দুই. মিথ-ব্যবহারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য : কাঠামো বিন্যাসে ও চরিত্র উদ্ভাবনে; তিন. সংলাপ ও ভাষাশৈলী। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে মৌলিক পাঁচটি কাব্যনাটকে পুরাণের বহিরাশ্রয়ে আধুনিক জীবন ও প্রতিবেশের রূপায়ণসূত্রে বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনের নানা কৌণিকতা উন্মোচিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে কাব্যনাটকে বুদ্ধদেব বসুর মিথ ব্যবহারের স্বরূপ, অর্থাৎ পৌরাণিক আখ্যানের গ্রহণ-বর্জন-আধুনিকীরণের সূত্রসমূহ এবং চরিত্র উদ্ভাবন ও রূপায়ণের মিথিক উৎস ও নতুন তাৎপর্য। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর কাব্যনাটকগুলোর সংলাপের স্বরূপ চিহ্নিত – অর্থাৎ, শব্দ-ব্যবহার, অলংকরণ বৈশিষ্ট্য এবং সাংগীতিক তাৎপর্য বিধৃত। 'উপসংহার' অংশে এসব অনুসন্ধান ও আলোচনার সারমর্ম উপস্থাপিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ যে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেখানে প্রকরণ-প্রসঙ্গটি তেমনভাবে গুরুত্ব লাভ করেনি। এই

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের শিল্পশৈলীর বিভিন্ন বৈচিত্র্য এবং তার ক্রমোৎকর্ষ সম্পর্কেও বিশদভাবে বর্ণনার প্রয়াস রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বুদ্ধদেব বসুর কেবল পাঁচটি মৌলিক কাব্যনাটক – যথাক্রমে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, (১৯৬৬) *কালসন্ধ্যা*, (১৯৬৯) *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০) *প্রথম পার্থ (১৯৭০)* ও *সংক্রান্তি* (১৯৭৩) এই গবেষণার পরিধি। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য নাটক এবং পাশ্চাত্য নাটকের অনুলিখন এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। উক্ত দুই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি কৃতজ্ঞতা ও স্নেহাশিস জানাই আমার অভিসন্দর্ভের কম্পিউটার মুদ্রাকর শামীম আহমেদকে, যার দিনান্ত পরিশ্রম ব্যতীত এ অভিসন্দর্ভ যথাসময়ে উপস্থাপন করা আমার পক্ষে দুরূহ হতো। আমার বাবা, দিনের পর দিন যাঁর সযত্ন পরিচর্যায় প্রস্তুত আমার মনন ও বোধ, তাঁর প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আমার এ অভিসন্দর্ভ মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে আমার সাংসারিক দায়িত্ব শিথিল করে গবেষণার কাজে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন আমার স্বামী। আমার পুত্র মাভৈঃ, দীর্ঘদিন ধরে তার দাবি ও অধিকারকে শমিত রেখে আমাকে আবদ্ধ করেছে তার ক্ষুদ্র ঋণে।

১৭ জুলাই ২০১০

তারানা নুপুর
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যে মিথের ব্যবহার ও কাব্যনাটকে মিথ

মিথ মানবসভ্যতার এক অন্তহীন রহস্য ও অনন্ত জিজ্ঞাসা। মানব-চেতনার জ্ঞাত-অজ্ঞাত, সংগুপ্ত-প্রকাশিত, ঐহিক-পারত্রিক ভাব-ভাবনা লৌকিক বা অতিলৌকিক রূপকের অন্তরালে পরম্পরাসূত্রে মিথের অবস্থান মানবমননের সজ্ঞান-ও নির্জ্ঞান সত্তায় এবং ব্যক্তিমনন, গোষ্ঠীমনন, সমাজমননের অনির্দেশ্য যাত্রাপথে দীর্ঘ পরিক্রমণের পর ক্রমশ তা পরিণত হয় সমগ্র মানব-অস্তিত্বের অচ্ছেদ্য অংশে। ক্রমাগ্রসর মানব-অস্তিত্বের সঙ্গী বলে মিথ কোনো ধ্রুব বিষয় নয়। যুগে যুগে নতুন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে তা সূক্ষ্ম রূপান্তরের অব্যাহত এক প্রক্রিয়া। কোনো কারণে এ ধারা স্থবির হলে মিথ পরিণত হতো মৃত, ধূসর কোনো প্রাচীন আখ্যানে; কালগর্ভে বিলুপ্তি ছিলো অবধারিত। কিন্তু, মিথ মনন, অনুধ্যান ও শিল্পের এমন এক সমুন্নত সংগ্রহ, যা সার্বজীনন, চিরন্তন। কারণ, মিথ মানবজীবনের আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার স্থায়ী উপাদান- *immemorial Patterns of response to the human situation in its most permanent aspeats*[১] মিথ চিরজীবী তার দেশ-কাল নির্বিশেষ ধর্মে, পুনঃপুনঃ জায়মানতায়, সৃজনের অন্তহীন সম্ভাবনায়। 'প্রাচীনতম মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রণোদিত অলৌকিক রসের কাহিনীমালার নামই মিথ।'[২] সৃষ্টির আদিম প্রত্যুষে দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি ও বিশ্বরহস্যের সান্নিধ্যে যা ছিলো আদি-মানুষের বিস্ময়াবিষ্ট কল্পনার যুক্তিগ্রাহ্য প্রকাশ-*The science of a Pre-scientific age*, সেই সব অবাস্তব গল্পগাথার উপর মানুষের চলমান সমাজ প্রবাহের পলি সিঞ্চনে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয় মিথ-বিশ্ব।[৩] আদিম মানুষের বিস্ময়মুগ্ধতা ছিল সূর্যের উদয় ও অস্তগমনে, ঋতু-আবর্তনে আকাশে রংধনুর বর্ণিল বিকাশে, কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে বিশ্বরহস্য ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যখন প্রায় মানুষের করতলগত, তখনও আদিম মানুষের সেইসব কল্পকথা, দেবদেবীগাথা ও অলৌকিক জগতের আবেদন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। হয়ত সেইসব ভ্রান্তধারণা এবং অলৌকিকতা আর গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু, তার মৌলিক উপাদানটি 'আর্কিটাইপ' অর্থাৎ *Primordial image, an original pattern or model from which others of the same kind are derived*-রূপে সংরক্ষিত থাকে আমাদের 'সামূহিক নির্জ্ঞানে'।[৪] ফলে আধুনিক মানুষ তার সময়ের বাস্তবতায় ব্যাখ্যা করে মিথকে, নতুনভাবে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে (সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি)। এভাবে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মিথ নিয়ে তৈরি হয় 'মিথলজি' এবং আধুনিক মানুষের কাছে মিথ গণ্য হয় ধর্ম বা বিজ্ঞানের মতই একটি 'বিমূর্ত বাস্তবতা'রূপে।[৫]

মিথ ও মিথ-নির্ভর সাহিত্য সমালোচনার প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটে প্রায় এক শতাব্দীর অধিক সময়। ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১), ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১) প্রমুখ মনীষী মিথ-সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে মনন-জগতে যে নতুন আলোকপাত করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ ও তত্ত্ব-পদ্ধতি, যার পুরোধা হিসেবে নরথ্রপ ফ্রাই (১৯১২-১৯৯), মড বডকিন (১৮৭৫-১৯৬৭), জেন হ্যারিসন (১৮৫০-১৯২৮) প্রমুখ স্বীকৃত। এঁরা প্রত্যেকেই দেখাতে চেষ্টা করেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে মিথের অলৌকিকতা অগ্রহণযোগ্য সত্য কিন্তু তার আবেদন মানবমননের 'সামূহিক নির্জ্ঞানে' অনস্বীকার্য। আর এ কারণেই আজও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে মিথ-নির্ভরতা বা মিথ-অনুষঙ্গ।

ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) থেকে লেভিস্ত্রস (১৯০৮-২০০৯) – প্রত্যেকেই মনে করে মিথ যৌথ অবচেতনাজাত। কিন্তু মড বডকিনের (*Moud Bodkin*) মতে তা, কেবল মস্তিষ্কের ভেতর বংশগতিবাহিত উপাদান মাত্র নয়, বরং সাংস্কৃতিকভাবে অর্জিত উপকরণও বটে, যা জানা যায়, বা শেখা হয় সফলতর প্রজন্মান্তরে। এমনকি তা সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে বহমান। ইয়ুং এর ক্ষেত্র মনোবিজ্ঞান, লেভিস্ত্রসের নৃতত্ত্ব এবং বডকিনের সাহিত্য – এটাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভিন্নতার কারণ।[৬] সেজন্যই মিথ কেবল আদিম মানুষের পবিত্র

Dhaka University Institutional Repository

পাথেয় কিংবা আচরণীয় জীবনের অভিজ্ঞান নয়, বরং তা মানব-চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প-সাধের আনুপূর্ব স্বাক্ষর। এই কারণেই একালে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি বা শিল্পীর কাছেও সেই প্রাচীন গোষ্ঠীগাথা প্রবর্তনার এক মহৎ ক্ষেত্র, শিল্পের প্রাথমিক উৎস। আধুনিক মানুষের চেতনাকে অনুরণিত করতে পারে বলেই স্বাধ্যায়বান শিল্পীর নিকট তা নন্দিত।

মিথ সর্বজনীন এমনকি বিশ্বজনীন হওয়ায় সমাজ-সভ্যতার জন্য তা অপরিহার্য। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী শিল্পীরা মনে করেন – কামারের জন্য অপরিহার্য যেমন তার হাতুড়ি, মেকানিকের জন্য রেঞ্চ, আমাদের চেতনার নির্মাণে তেমনি এক মোক্ষম হাতিয়ার মিথ।[৭] নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এমনকি রাজনীতিবিদ ভিন্ন ভিন্ন অনুসন্ধিৎসা থেকে মিথের নিকটবর্তী হতে পারেন, ইতিহাসের সত্যতা সন্ধান করতে পারেন, কিন্তু একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকের পক্ষে উপযোগিতা মুখ্য নয়, বরং আবেদনটিই সত্য। কারণ মিথের ভেতর শিল্পী অন্বেষণ করেন মানবিকতাবোধ, সৌন্দর্যচেতনা, সংবেদনার সূক্ষ্মতা। জার্মান মিথতাত্ত্বিক কার্ল কেরেনি তাঁর ঐশীচেতনার পাশাপাশি মিথ-আস্বাদনের এই নান্দনিক দিকটির কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, মিথ বিশ্লেষণযোগ্য বিষয় নয়, বরং অনুভববেদ্য – 'অনুভূতির নির্ভরতা ও ভাবস্বকীয়তা মিথ উপলব্ধির জরুরি উপাদান। নিগূঢ় ও স্থায়ী এক ধরনের প্রক্রিয়ার মাঝে তার অবস্থিতি। এর বিশ্বজনীনতা প্রকৃতির সাথে তুলনীয়। মিথ বিষয়ে সারবান কোনো অভিজ্ঞতা লাভে তাত্ত্বিক বিচারবোধের কাছে সমর্পণের দরকার হয় না। বা এর উৎস সম্বন্ধে অতিকথনেরও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু নিজের ভেতরের আপাত সহজ সরল অন্তঃশায়ী মিথ-চেতনাকে অবিলম্বে জাগিয়ে তোলা।'[৮] বিষয়ের চেয়ে ধারণা, জ্ঞানের চেয়ে সংবেদনা, অধিক সক্রিয় থাকে বলেই মিথ ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক আন্তরিক। 'মননশীল তন্ময়তা' নিয়ে মিথের জগতে অনুপ্রবেশ করে শিল্পী-মানসে জেগে উঠতে পারে অখণ্ড সত্তা। শিল্পীর এই মানস-ভ্রমণ ও অন্তর্দর্শনই মিথাবলম্বী বিশুদ্ধ শিল্পরচনার সহায়ক। তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ অপেক্ষা মিথের সহজাত রসোপলব্ধি বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) নিকটও ছিল কাঙ্ক্ষিত, প্রয়োজন অপেক্ষা আনন্দ তাঁর মিথ-আস্বাদনের মূলকথা- 'আমরা কে কী চাই, কোন প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহাভারতে পর্যটক হয়েছি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তারই উপর নির্ভর করছে। যদি বেরিয়ে থাকি নগণ্য সারবান কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে, অথবা কুঠার হস্তে অরণ্যকে উদ্যানে পরিণত করার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাহলে অবশ্য খণ্ডীকরণ ও ব্যবচ্ছেদই আমাদের ব্যবহার্য উপায়। কিন্তু যদি চাই এক বিশাল তরঙ্গোচ্ছল পুরাণস্রোতে অবগাহন করতে, আর সেই জলের তলা থেকে মাঝে মাঝে যে-সব সুন্দর, ভীষণ অদ্ভুত ও মনোমুগ্ধকর ভাবমূর্তি মুহূর্তের জন্য উত্থিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, তাদের দূরপ্রসারী তাৎপর্য কিয়দংশেও উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে, যা-কিছু আমাদের হিসেবে বিসদৃশ বা অসংগত বা বিভ্রান্তিজনক সেই সবই আমাদের যথাযথ বলে মেনে নিতে হবে।'[৯] মিথ ও শিল্পের এই সংবেদশীল সংযোগসূত্রই মিথ-সম্পর্কিত সাহিত্যালোচনায় সর্বাধিক কার্যকরী।

যদিও 'পুরাণ' অপেক্ষা 'মিথে'র ধারণা প্রাচীনতর, আবার ইতিহাসের সাথে পুরাণের যে সংযোগ, তা মিথে নেই বলে 'মিথ' ও 'পুরাণ' শব্দ দু'টি সমার্থক নয়, তবু আমাদের আলোচনায় 'মিথ', 'পুরাণ', 'ঐতিহ্য' শব্দগুলো পরস্পর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হবে। কারণ, বুদ্ধদেব বসু মিথের তুলনায় পুরাণের বিশালত্ব ও বৈচিত্র্য উপলব্ধি সত্ত্বেও শব্দদু'টিকে প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছেন।[১০]

মিথের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নিত্যতার ধর্ম, স্থান কালাতিক্রান্ত আবেদন। রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সংগ্রথিত করে নতুন উপলব্ধি ও দর্শনকে লক্ষীভূত করে। এই ক্রমাগত পুনর্ভব প্রক্রিয়া লক্ষ করেই বুদ্ধদেব বসু বলেন – 'পুরাণ কথার ধর্মই এই যে তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।'[১১] আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Dhaka University Institutional Repository

(১৯০১-১৯৬০) মিথ বা ঐতিহ্যের এই বিকাশকে ব্যাখ্যা করেন – ' ঐতিহ্য ব্যতিরেকে - ট্রাডিশন্ ব্যতীত - শিল্পসৃষ্টি যদিও অসম্ভব, তবু তার অনুবৃত্তি প্রাণহীন নয়, সংকল্পের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তার অনুকরণের উদ্দেশ্য উদ্‌ভাবন। ... ফলত কোনও একটা নির্দিষ্ট কাব্যধারা নদীর সঙ্গে তুলনীয় নয়, তাকে একখানা অসমাপ্ত অট্টালিকার মতো লাগে; এবং এই অট্টালিকার সূত্রপাত মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধির খাতিরে এর বৃদ্ধি মানুষের মর্জিতে, এর ধ্বংসও মানুষের অযত্নে। শুধু তাই নয়, এই অট্টালিকার ভবিষ্যত বিস্তার ভিত্তিস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই অংশত নির্ধারিত, আবার প্রত্যেক যোগ-বিয়োগে তার অসঙ্গতি বদলায়, এবং তার মৌল প্রকৃতি যেমন সংযোগমাত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি সংযোগ মাত্রেই তাতে পরিবর্তন আনে।'[১২] সুধীন্দ্রনাথের ক্লাসিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঐতিহ্য নির্মাণের ব্যাখ্যায়। আবার মিথতাত্ত্বিক রিচার্ড চেজ মিথকে তুলনা করেন প্রবহমান নদীর সাথে – 'মিথ হলো এমন একটি নদী, যা অনন্তকাল ধরে প্রবহমান, কখনো স্বচ্ছ ও গভীর, আবার কখনো প্রশস্ত সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত অগভীর ও কর্দমাক্ত।'[১৩] স্থানকাল ভেদে রবীন্দ্রভাবনায়ও মিথ নদী-প্রতীম – 'এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়। তাহাকে আমি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর সঙ্গে তুলনা করি। প্রথমে পর্বতের নানা আপন গুহা হইতে নানা ঝর্ণা একটি জায়গায় আসিয়া নদী করিয়া তোলে। তারপরে সে যখন আপনার পথে চলিতে থাকে তখন নানা দেশ হতে নানা উপনদী ইহার সঙ্গে মিলিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।'[১৪] এ সমস্ত ব্যাখ্যার একটিই বক্তব্য, তা হলো পুরাণের অব্যাহত সৃষ্টি প্রক্রিয়া *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ইলিয়াড*, *অডেসি* পৃথিবীর একেকটি মৃত্যুহীন স্রোতাস্বিনী, যা থেকে কালে কালে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য নতুন প্রবাহ। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর প্রথম মিথ-স্রষ্টা (*myth maker*) হোমার প্রাচীন মিথগুলোকে বিন্যস্ত করে রচনা করেন *অডেসি*। বিংশ শতাব্দীতে সেই *অডেসি* নতুন মাত্রা পায় জেমস জয়েসের (১৮৮২-১৯৪১) *ইউলিসিসে* (১৮৪২) নতুন 'মিথিক্যাল আঙ্গিকে' (*mythical way*), আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু জীবনানুষঙ্গে। *অডেসির* অবয়বেই উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয় টলস্টয়ের *War and Peace*, বিংশ শতাব্দীতে সেই প্রবর্তনা থেকেই জন্ম নেয় বিখ্যাত চিত্রকর্ম *গোয়ের্নিকা*। *David Adams Leeming* দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে মিথ সৃজনের এই প্রক্রিয়ার কথাই উল্লেখ করেন – 'The modern artist is a direct descendent of the ancient myth maker. The true artist explores the inner myth of life in the context of a particular local experience. If the story of *Odysseus* is humanity's story of loss and rebirth leading to transformation, so is *War and Peace* in a nineteenth century Russian context and so, perhaps, is Picasso's *Guernica* in tweentieth century European one'.[১৫]

এইভাবে রিচ্যুয়ালকে কেন্দ্র করে অথবা ভাবানুষঙ্গকে গ্রহণ করে প্রাচীন পুরাণের প্রচ্ছায়ায় জন্ম নেয় নতুন সাহিত্যকর্ম। নতুন যুগে নতুনতর চেতনার সান্নিধ্যে জন্ম হয় নব্য শিল্পের। আদিকাল থেকে প্রবহমান যৌথ-চেতনার সাথে যুক্ত হয় আধুনিক চেতনা – চলে ভাঙাগড়া–গ্রহণ-বর্জন-আত্তীকরণ। এই সব সৃজনের পাশ্চাতে অন্তঃশীল থাকে সমকালের যন্ত্রণা, সংক্ষোভ, আধুনিক মানুষের প্রত্যাশা পূরণের দায়বদ্ধতা এবং আরো থাকে নতুন শৈল্পিক প্রতিশ্রুতি। তাই আড়াই হাজার বছর পূর্বের সফোক্লিসের *রাজা ইডিপাস* নাটকের মিথিক রূপান্তর ঘটে আধুনিক ইতালীয় কবি পাওলো পাসোলনীর *Oedipus Rex* চলচ্চিত্রে, আধুনিক সভ্যতার বিচ্ছিন্নতা ও যৌনতার ভাবানুষঙ্গে। ভারতীয় পুরাণের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া চলমান। *রামায়ণ-মহাভারত* থেকেও সময়ের প্রয়োজনে, চেতনার নবজন্মে সৃষ্টি হয় অনেক নতুন শিল্প। তাই, *মহাভারত* আর শাশ্বত কোনো গ্রন্থ থাকে না, তা থেকে জন্ম নেয় 'নতুন মহাভারত'। জীবনানন্দ দাশের উপলব্ধিতে – 'মহাভারতের পর কয়েক হাজার বছর কেটে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় যে কোনো কালে যে কোনো মর্মগ্রাহী মানুষ নিজের যুগে নতুন মহাভারতের স্বাদ পেয়েছে ; - হয়তো মহাভারত পড়া ছিল বলে নিজের কালের চারদিককার আনুপূর্বিকতাকে পরম উত্তম একটা বিধানের ভিতর গ্রথিত করে উপলব্ধি করে নিতে হয়েছে নিজের সময়কে। সেই মহাভারতই তার নিজের মহাভারত; হয়তো মহাভারত নয় আর,

Dhaka University Institutional Repository

নানারকম তারতম্য এসেছে, মূল ভিত্তিও নড়ে গেছে, তারপর উৎসাদিত হয়েছে, দেবতায় বিশ্বাস নেই আর, অলৌকিক কৃষ্ণ নিরঞ্জনের উপর বরাত নেই, মহাশূন্যকে ব্রহ্ম মনে করে সকল বিপদ ও অন্ধকারের খণ্ডন নেই সে অলীক আলোর ভিতর।'[১৬] আধুনিক কালে মহাভারতের গুরুত্ব তাই শাশ্বত ধর্মে বা আচারে নয়, বরং নতুন চেতনায়, নব্যাঙ্গিকে নবায়ন ধর্মে; পুরাকালের পুনরাবৃত্তি তার উদ্দেশ্য নয়। তার সার্থকতা – 'অগ্নিসংস্কারের মতো আধুনিকতাকে নিজের সত্তায় ও সম্ভাবনায় বিশুদ্ধ করে নেবার জন্যে – মহাভারতীয় কাল বা সেই দেশ কালের শুদ্ধ উপলব্ধিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নয়।'[১৭] মিথ নতুন সৃষ্টির এরূপ নিরন্তর এক প্রক্রিয়া।

মিথ নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্তঃশীল থাকে সমকালীন জীবনের সংকট। আর এই দেশ-কালের সংকটে আধুনিক মানুষ একধরনের নস্টালজিয়া চেতনা থেকে পুরাণের সন্নিকট হয়, মিথ-নির্ভর সাহিত্য নির্মাণে উৎসুক হয়। মূলত, অতীত বর্তমান, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়া সম্পর্কের মধ্যেও সক্রিয় থাকে এক ধরনের আধুনিক নস্টালজিয়ার সংবেদনা *Modern Nostalgia*, যা থেকে মানুষ ফিরে তাকায় তার পেছনে, শরণ নেয় মিথ কিংবা পুরাকাহিনীর। রোমন্থন-আক্রান্ত এই আধুনিক মানুষের ফিরে দেখার বিষয়টা অনেকটা বিছানায় শ্বাসরুদ্ধ ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর ভালোবাসা ও সন্তাপের মতো, যে নিজেই তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সুন্দর সম্পদকে বিনষ্ট করে ভ্রান্ত সন্দেহের বশে। যান্ত্রিক বিশ্বে মৃতস্বপ্ন নগরীতে আধুনিক জটিল জীবনযাপনের ফলে বর্তমানের প্রতি মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় ঘৃণা এবং তারই শুশ্রূষার জন্য অতীতের প্রতি তৈরি হওয়া নস্টালজিয়া মূলত একই মুদ্রার দু'টি ভিন্ন পিঠ।[১৮] জেমস জয়েস বিংশ শতাব্দীর প্রাণহীন বিশৃঙ্খল জীবনযাপন, ব্যক্তির সংকট ও একঘেয়ে পরিত্রাণহীন জীবন থেকে নস্টালজিক হয়েছেন প্রাচীন হোমারীয় যুগের প্রতি, যেখানে অন্তত ব্যক্তির সংকট ও সংগ্রামের সার্থকতা ছিল। এলিয়ট(১৮৮৮-১৯৬৫) বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় পোড়োজমি, বন্ধ্যাত্ব আর অন্তঃসারশূন্যতা থেকে বৃষ্টি, উর্বরতা ও ফসল-সম্ভাবনায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মিথাবলম্বী হন তাঁর *The waste land* (১৯২২) কাব্যে। মূলত মিথের জগৎ এইসব আধুনিক মানুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত, কারণ তারা শরণহীন। তাদের সামনে কোনো অলৌকিক শক্তি নেই, যার সাধনায় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। বর্তমানে যখন তাদের সমস্ত প্রার্থনা, সকল সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শস্য দেবতার উপাসনা করলে শস্য পাওয়া যায় না, অজস্র প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করেও অভীষ্ট মেলে না। এজন্যই একালের আধুনিক শিল্পীর নিকট মিথ এক পরমাশ্রয় – সমস্ত দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ও অপ্রাপ্তি, প্রতিস্থাপনের যথার্থ আধার। এলিয়ট বলেন –'By losing tradition, we lose our hold on the present।'[১৯] তাই বর্তমানকে বিপন্নতা থেকে রক্ষায় প্রয়োজন মিথের আশ্রয়। কারণ, ঐতিহ্য ছাড়া বর্তমানও ভঙ্গুর। সভ্যতার এই উর্ধ্বগতি ও ভঙ্গুর বাস্তবতা থেকে মুক্তি পেতে আধুনিক শিল্পী শরণাপন্ন হন মিথের। কারণ-'মিথের সাথে সম্পৃক্ত থাকে অনিবার্য ধর্মভাবনা তথা 'হোলিনেস' ও অলৌকিকতার আবরণ, যা আবার প্রকৃত বিজ্ঞানবোধের বিরোধী- আধুনিক মন তাই মিথের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে বিপ্রতীপ-অনুপাতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে সমাজ একটু একটু করে যতটা উন্নত হয়ে ওঠে ঠিক তারই বিষমানুপাতে মিথের বহির্জীবনে কমে যায়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সমস্ত মানুষের অবচেতন স্তরে মিথের একটা অলক্ষ্য অভিঘাত থেকেই যায়, যা কখনোই নির্মঞ্জিত হয় না। এর কারণ ঐতিহ্য উত্তরাধিকারের সঙ্গে মানসলোকে সংযুক্ত থাকতে পারলে তবেই আধুনিক বিজ্ঞানবহুল যুগে যেখানে যৌথ জীবন ও সমাজ ভেঙে পড়ছে সেখানে বিচ্ছিন্নতা বা *অ্যালিয়েনেশ্যনকে* এড়ানো যাবে। এটিই *মিথোম্যানিয়া*। সেই ঐতিহ্যের বাস্তবমূর্তি – আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে যা হল ইতিহাস - এবং তার অন্তর্মুখী মানসপ্রতীতি মিলেই গড়ে তোলে ঐ *মিথোম্যানিয়াকে*।'[২০]

সাধারণত রিচ্যুয়াল অক্ষুণ্ণ রেখে মিথ-কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয় নতুন শিল্প, যার ভেতর অন্তঃশীল থাকে লেখক বা কবির অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের সারাৎসার। লেখকের দর্শন বা তাঁর প্রতীতি সাধারণ মিথকে দেয় অভিনবত্ব, Leslie Fiedler যাকে বলেন *Signature of writer* বা শিল্পীর নিজস্বতা (*his signature,*

Dhaka University Institutional Repository

Uniqueness of the artist, the Persona of the artist)।[২১] *Archetype* এর উপর শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা ও চিন্ময় চৈতন্য আরোপিত হয়ে তৈরি হয় মিথ, অন্যথায় তা *arehetype* মাত্র। ফলে শিল্পী-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কারণেই অভিন্ন আর্কেটাইপ থেকে জন্ম নেয়া দু'টি শিল্প লাভ করে পৃথক মাত্রা, এমনকি পৃথক যোগ্যতাও। যেমন, Baldur এর গল্প *The Beautiful* এবং Shakespear এর *The Tempest* একই বিষয়বস্তু দ্বারা প্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও *The Tempest* ভাষা, ছন্দ ও কল্পনাশক্তিতে *The heard voice of Shakespear,* কিন্তু উৎকৃষ্ট *signature* এর অভাবে Baldur এর ছোটগল্প *arcehetype* মাত্রে পর্যবসিত।[২২] ফলে, মিথের অনুসরণে শিল্পী বা সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য আধুনিক শিল্পকে দেয় বহুমাত্রিকতা।

ঐতিহ্যকে আত্তীকৃত করে সাহিত্যে তার সার্থক রূপায়ণ ঘটানো সহজ নয়; বরং শ্রমসাধ্য কাজ। এলিয়ট বলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে ঐতিহ্যকে অর্জন করা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন গভীর অধ্যাবসায় এবং ইতিহাস-সচেতনতা। সে ইতিহাস একটি অনুভূতিময় প্রত্যক্ষ ধারণা, যার মধ্যে অতীতের অতীতধর্মিতা শুধু নয়, বিদ্যমান থাকে বর্তমানও। হোমার থেকে সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্য আত্মস্থ করে নিজ দেশ-কালের সঙ্গে সেই ইতিহাসবোধকে যুক্ত করে যুগপৎ শৃঙ্খলায় নির্মাণ করতে হয় এ শিল্প। এলিয়ট মনে করেন চিরন্তনের সাথে বর্তমানের সম্মিলনেই সৃষ্টি হয় প্রকৃত ঐতিহ্যবোধ এবং সে ক্ষেত্রে কোনো কবি বা শিল্পী এককভাবে তা অর্জন করতে পারে না। তার আস্বাদন ও উপলব্ধির জন্য নতুন স্রষ্টাকে নির্ভর করতে হয় মৃত কবি ও শিল্পীদের রচনার উপর।[২৩] এলিয়ট মিথ-পরিকাঠামোয় শিল্প নির্মাণের এই প্রক্রিয়াকে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করেন – যেখানে কবিকে নিরপেক্ষ থেকে নৈর্ব্যক্তিকতা সৃষ্টি করতে হয় তাঁর শিল্পে। এলিয়টের ভাষায় – 'The analogy was that of the catalyst. When the two gases previously mantioned are mixed in the presence of a filament of platinum, They form sulphurous acid. this combination takes palce only if the platinum is present; nevertheless the newly formed acid contains no trace of platinum, and platinum ifself apparently unaffected; has remained inert, neutral, and uncharged the mind of the poet is the shred of platinum. If may partly or exclucsively operate upon the experience of the man himself; but the more perect the artist, the more completly seperate in him will be the man who suffers and the mind which, creates; the more perfeetly will the mind digest and transmute the passions which are its material'.[২৪] অর্থাৎ কার্বন ও সালফার-ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়ায় কখনোই সালফিউরাস এসিড হত না, যদি অনুঘটক প্লাটিনামের উপস্থিতি না থাকতো। কিন্তু, বিক্রিয়ান্তে প্লাটিনামটি থাকে অক্ষত, অপরিবর্তিত ও নিরপেক্ষ। এলিয়টের বক্তব্যে, কবির মন এ প্লাটিনামের টুকরো। অনুঘটকের মতই একজন যথার্থ শিল্পী তাঁর আবেগ অনুভূতিকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রেখে শিল্প নির্মাণ করেন। এলিয়ট মিথের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পীর নিরাসক্তির উপর অধিক গুরুত্বারোপ এবং সমধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তাঁর স্বতোৎসারিত আবেগ ও অনুভবের উপর। রোম্যান্টিক ধর্মের বৈপরীত্যে নির্মিত এ আধুনিক শৈলীতে এলিয়ট একটু রূঢ়ই বটে। আমাদের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) কবির অনুভবের এই রুদ্ধতায় আস্থাবান নন। তাঁর মতে, এলিয়ট 'বুদ্ধির দরজায় খিল লাগালে'ও কবির অনুভব বা আবেগ সহজাত – সহজতাই তাঁর উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে তা সকলের মাঝে সঞ্চারিত হতেও বাধ্য। এলিয়টকে দার্শনিকতার উৎকর্ষে বিশেষভাবে বিত্তবান বলে মনে করলেও 'ঐতিহ্যের সঙ্গে অবচৈতন্যের সমীকরণে'র অনাস্থায় তাঁর কাব্যাদর্শ ছিদ্রযুক্ত বলে মনে করেন সুধীন্দ্রনাথ। মিথের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতা, শ্রেয়োবোধ, সংযম সমস্তকিছুকে অপরিহার্য মেনেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শিল্পীর আবেগ ও অনুভবের বিমুক্তিতে বিশ্বাসী – 'ফলত কবির পক্ষে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রসাদ-বিতরণ যথেষ্ট নয়, অনেক সময়ে তিনি কাল্পনিক অভিজ্ঞতার উদ্‌ভাবনেও বাধ্য, যাতে পাঠকের দৃকশক্তি বাড়ে, সে জীবনের আর্যসত্যগুলোকে স্পষ্টতর ক'রে চেনে। অর্থাৎ উপর্যুক্ত মূল্যজ্ঞানের প্ররোচনায় কবি মাঝে মাঝে অভিনয়ে মাতেন; এবং তখন তিনি যে-ভূমিকায় নামেন, তার সঙ্গে তাঁর বা দর্শকের চাক্ষুষ পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

থাকে না। কিন্তু মহানুভবতা ও নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যের জোরে, বিশ্ববীক্ষা ও অন্তর্দর্শনের গুণে, এই অঘটন-সংঘটনেও তিনি সম্ভাব্যতার সীমা ভোলেন না, কল্পনা বিলাসের মধ্যেও সত্যবত্তা বজায় রাখেন।'[২৫]

অর্থাৎ মিথ-কাহিনীর শিল্পরূপদানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আবেগ ও অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও নিরাসক্তির গভীরতর ভারসাম্যে বিশ্বাসী। মূলত এ ধরনের সাহিত্য নির্মাণে শিল্পীর মাত্রাবোধ সর্বত্র সমান নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পী আদি উৎসকে অবিকৃত রেখে চিরাগত মিথিক-উপাখ্যানকে দান করেন নতুনমাত্রা, যার সঙ্গে বিজড়িত থাকে আদিমানবের চিন্তাজগতের ধারাবাহিকতার ইতিহাস ও মানব সভ্যতার অগ্রগতিরই আনুপূর্বিক নির্দেশনা এবং একই সাথে তাতে অন্তঃশীল থাকে শিল্পীর অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির সারাৎসার। কখনো তিনি মূল মিথকে ভেঙে দিয়ে গড়ে তোলেন নতুন মিথিক বিন্যাস – তাতে অনুরণিত করেন সর্বকালীন আবেদন। মিথ সংশ্লেষণের কারণে পাঠক মন আনুপূর্বিক কল্পনা-জগতের মাধ্যমে উন্মোচিত ও গ্রহণোন্মুখ অবস্থায় থাকে, তাকে সঞ্চারক মাধ্যম হিসেবে (*Mode of expression*) সক্রিয় করে শিল্পী তাঁর উদ্দিষ্টকে সহজেই পাঠকের বোধ ও বোধির সামীপ্য প্রদান করতে পারেন।

মিথ কাঠামো (*Structure of myth*) একটি চিরন্তন সাহিত্য-উপকরণ; তাকে কবি সাঙ্গীকরণ করে স্বকীয় কাব্যভাবনার উপযোগী করে তুলতে পারেন অর্থাৎ মিথের কাঠামোকে অনুসরণ করে তাঁর অন্তর্লোকিকে তিনি পরিপূর্ণ করতে পারেন নিজস্ব অনুভবের সাহায্যে। তবে, এ পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'রিচ্যুয়াল' এর (*ritual*) বৈশিষ্ট্যটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে শিল্পীর। *Ritual* হলো একটি জাতি বা গোষ্ঠীর বিশেষ উৎসবকৃত্য, যেখানে জীবন-মৃত্যু-পুনর্জন্ম কিংবা উর্বরতা সংক্রান্ত বিষয় প্রতিফলিত হয়।[২৬] পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন আচার বা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত বা চর্চিত হলেও সেগুলোর মৌল তাৎপর্য অভিন্ন। রিচ্যুয়ালকে অপরিবর্তিত রেখে নির্মিত নতুন সাহিত্যে মিথের ভাবানুষঙ্গ অথবা মিথ-কাহিনীর ভগ্নাংশ রূপান্বিত হতে পারে। এছাড়া চিত্র, চরিত্র, সংকেত, প্রতীকরূপে অনুমিথও (*Micro myth*) ব্যবহৃত হয় সাহিত্যে। কখনো মিথের ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্মিত হয় মিথিক ভাষা-পরিকল্পনা (*mythic diction*)। আধুনিক শিল্পী এমনকি অনুসরণ করেন মিথিক্যাল পদ্ধতিও (*mythical way*)। আধুনিকালে প্রকরণ-অভিনবত্ব মিথিক রূপান্তরকে করেছে আরো আকর্ষণীয়। জৈবিক ও পরিবর্তনশীল মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও প্রয়োজন থেকেই মিথের জন্ম ও বিবর্তন, আবার দ্রুতগতি সভ্যতার সংকটই মিথ-বিশ্লিষ্টতার মূল কারণ কিংবা বলা যায় মিথ-বিশ্লিষ্টতাই সভ্যতার বিবিধ বিপন্নতার কারণ। এই বখে যাওয়া সভ্যতার শুশ্রূষার প্রয়োজনেই আধুনিক মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে মিথের শাসন – শুধু আধুনিক চেতনা চরিতার্থের জন্য নয়, বরং সংকট উত্তরণের সময়োচিত নির্দেশনার লক্ষ্যে। সভ্যতা ও মিথের অগ্রযাত্রা সমান্তরাল পথে বলেই মানবজীবন ও মিথ চিরন্তন সম্পর্কধৃত, পরিপূরক সত্তা। আর শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক যেহেতু অচ্ছেদ্য, তাই শিল্প-সাহিত্যে মিথের আবেদনও অনিঃশেষ।

বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরেজি সাহিত্যে মিথ প্রায় মৃত বলে ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যে মিথের সেই মৃতকল্প অস্তিত্বকে পুনর্জীবিত করতে উদ্যোগী হন কয়েকজন শিল্পী। এলিয়ট তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বিংশ শতাব্দীতে এলিয়েটের প্রচেষ্টায় মিথ ও সাহিত্যের মধ্যে নিবিড় সংযোগ সাধিত হয়। *Ulysses, Order and Myth* (১৯৭৫) প্রবন্ধে জেমস জয়েস এর *ইউলিসিস* উপন্যাসটির সমালোচনা করতে গিয়ে, মিথের আস্বাদনের সূত্রটিকে তিনি সংক্রামিত করে দেন সবার মাঝে। এই আলোচনায় তিনি 'মিথিক্যাল মেথড' (*the mythcial method*) এর দিকে সবার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেন এবং আধুনিক সাহিত্যের উৎকর্ষে এর সম্ভাবনা নির্দেশ করে সেই পথে আহ্বান জানান।[২৭] এলিয়ট কেবল সাহিত্যে মিথের দার্শনিক ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন না, সেই সঙ্গে তার প্রয়োগ সাফল্যেও বিশ্বনন্দিত হন। তাঁর *The West Land* কাব্য ভারতবর্ষের রোমান্টিক সাহিত্য জগতেও অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস এমন এক

Dhaka University Institutional Repository

উৎকেন্দ্রিক সীমায় এসে পৌঁছেছিল, যাতে আমরা নিজের দেশের জাতি ধর্ম ঐতিহ্য ভুলতে বসেছিলুম এবং বিশ্ব সম্বন্ধে অচেতন হয়ে পড়েছিলুম, ব্যক্তিহৃদয়ে যতক্ষণ না বস্তুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারছে, ততক্ষণ পাঠকের মনেও যে হৃদয়কে সঞ্চারিত করতে পারা যাচ্ছে না, একথাটা ভুলতে বসেছিলুম, ভুলতে বসেছিলুম কবিতায় শব্দই হচ্ছে মাধ্যম, এই মাধ্যমের সাহায্যেই ইম্‌প্রেশন ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয় এবং সৃষ্টি হয়, মাধ্যমকে বাদ দিয়ে অনুভূতি প্রকাশের কোনো মানে হয় না।[২৮] এলিয়টের কাব্যের প্রভাব এবং আমাদের মননশীল আধুনিক কবিদের সৃষ্টিশীলতার সংযোগে বাংলা সাহিত্যেও মিথের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রটি বিস্তারিত হয়। শুধু, এলিয়টই নন, আইরিশ কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েটস্‌, রাইনের মারিয়া রিল্‌কের মিথ-আশ্রয়ী শিল্প ছিল ত্রিশোত্তর কবিদের উৎসুক চেতনার প্রেরণাস্থল। বিশেষ করে Yeats এর *The Tower, Leda and the Swan, Two Songs from a Play* প্রভৃতি মিথ-অনুষঙ্গী কবিতা এবং রিল্‌কের *Sonnets to Orpheuse* বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিদের প্রত্যয় ও প্রীতি দুইই অর্জন করেছিল। এছাড়া সমকালীন ফরাসী নাট্যকারগণ- জাঁ ককতো (১৮৮৯-১৯৬৩), জাঁ জিরোদু (১৯৩০-২০০৪), জাঁ পল সার্ত্রের (১৯০৫-১৯৮০) নাটকে গ্রিক মিথের প্রচ্ছদে আধুনিক জীবন ও তার জটিল অন্তর্বাস্তবতার সাংকেতিক প্রকাশের দৃষ্টান্তও প্রাণিত করে তাঁদের। সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জেমস জয়েস ব্যতীত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মানের (১৮৭৫-১৯৫৫) মিথ-অবলম্বী আধুনিক উপন্যাসও যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে আদৃত হয় ত্রিশোত্তর আধুনিক, চিন্তাশীল কবিদের নিকট। শুধু মিথ নয়, টমাস মানের উপন্যাসের ইতিহাসবোধও আকৃষ্ট করে কোনো কোনো কবিকে।[২৯] তবে মিথ-নির্ভর পাশ্চাত্য এইসব সাহিত্যের প্রভাব ছাড়াও বাঙালি কবিদের ছিল প্রাচ্য উত্তরাধিকার – মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মিথের নানামাত্রিক প্রয়োগে মিথ-শিল্পের ভিত্তিভূমি। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের মিথকে নতুন তাৎপর্যে, ব্যঞ্জনায় এবং যথার্থতায় প্রথম ব্যবহার করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। হোমার, ভার্জিল, মিল্টন, দান্তে প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিদের প্রেরণায় তিনি ভারতীয় পুরাণের আশ্রয়ে রচনা করেন *তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য* (১৮৬৯), মহাকাব্য *মেঘনাদবধকাব্য* (১৮৬১), পত্রকাব্য *বীরাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬২)। মধুসূদন ভিন্ন ভিন্ন 'ফর্মে' মিথের বিচিত্র প্রকাশ ঘটান সাহিত্যে। কিন্তু, পুরাণকে আত্মস্থ করে শিল্পীর নিজত্বকে তার মধ্যে সংক্রামিত করে সর্বজনীন একটি বোধে উন্নীত হতে পারেননি মধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে সেই অপূর্ণতার অবসান ঘটিয়ে মিথকে নতুন তাৎপর্যে মর্মগ্রাহী করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত করে নিজস্ব দর্শন ও নন্দন-ভাবনায় তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বুদ্ধদেব বসু তো মনে করেন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই মিথের পুনর্জন্মের প্রথম পথিকৃৎ যেহেতু, মাইকেলের সৃষ্টি-প্রতিভায় তিনি প্রীত নন মোটেই। তাঁর ভাষায় – 'আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম মাইকেল ঘটাননি, ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পুরাণ বা ইতিহাসের কাহিনীকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে তবেই তা নিয়ে কাব্য রচনা সার্থক হয়, এবং এ-কাজ প্রাক্‌-রবীন্দ্র বাঙালি কবিদের মধ্যে কেউ পারেননি, কোনো-একজন – কোনো-একটি রচনাতেও না।[৩০] রবীন্দ্রনাথ তাঁর *কর্ণকুন্তী সংবাদ* (১৯০০) *গান্ধারীর আবেদন* (১৮৯৭) *বিদায় অভিশাপ* (১৮৯৪) প্রভৃতি নাট্য-কবিতা, *পতিতা*, অহল্যার প্রতি ইত্যাদি অসংখ্য কবিতা, নৃত্যনাট্য *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২) এবং সাংকেতিক নাটক *রাজা* (১৯১০), *ফাল্গুনী* (১৯১৬), *রক্তকরবী* (১৯২৬) প্রভৃতি রচনার মধ্যে দিয়ে ভিন্ন মাধ্যমে পুরাণের বিচিত্র প্রয়োগ ঘটান। মিথের নবনির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, তা পাশ্চাত্য রচনা ও কাঠামোকে অনুসরণ করে না, ভারতীয় পুরাণকে আশ্রয় করে প্রতীক-সংকেতের ব্যঞ্জনায় সমকালীন জীবনকে রূপায়ণ করে এবং শেষ পর্যন্ত একটি শাশ্বত দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেন। সুধীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেন রবীন্দ্রনাথের 'ঐতিহ্যবোধের মূল মন্ত্র ছিল উত্তরাধিকারের সাদর অঙ্গীকারে পুরুষকারের নিরন্তর চক্রবৃদ্ধি।'[৩১] প্রকৃতপক্ষেই, রবীন্দ্রনাথ পুরাণের 'বস্তু অংশকে অতিক্রম করে পুরাণে প্রবাহিত চিরকালীন সেই জীবনরসকে আধুনিক জীবন-চেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যথার্থতাবেই পুরাণের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে নূতন কালের বর্ণে প্রকাশ করে ঘটিয়েছিলেন 'পুরাণের নবজন্ম'।'[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

এইসব উত্তরাধিকারের ভিত্তিভূমিতে অবস্থান করে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিরা পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারা প্রাণিত হয়ে অথচ স্বতন্ত্র চেতনা ও শিল্পের প্রতিশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে আবারও সক্রিয় করে তোলেন *Mytho poeia* বা মিথের সৃষ্টিশীলতা।[৩৩] পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ থেকে বুদ্ধদেব বসু প্রত্যেকের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনন ও ব্যঞ্জনা আরোপের অনন্যতা। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ মিথকে তাঁর চেতনায় সংযুক্ত করেন বৃহত্তর ইতিহাসবোধের সাথে অন্তর্লীন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ও নষ্ট সভ্যতার শুশ্রূষার জন্য তিনি গভীর বিশ্বাসে বারবার ইতিহাস ও পুরাণের শরণাপন্ন হন। কারণ তিনি জানেন এই পথেই বিপন্ন সভ্যতার পুনরুদ্ধার সম্ভব। কখনো শ্যামলী, সবিতা, সুচেতনা প্রভৃতি নারীর প্রতিমায়, কখনো পৃথিবীর প্রাচীনতর মনীষী ও তাঁদের প্রদর্শিত পথের উল্লেখে জীবনানন্দ দাশ উত্তরণের এক গূঢ় ইঙ্গিত ব্যক্ত করেন তাঁর কবিতায়। জীবনানন্দ দাশ বিশেষভাবে রূপকথা, লোকপুরাণ ও বৌদ্ধ পুরাণের প্রয়োগ ঘটান তাঁর কবিতায়। মূলত, বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ 'পুরাণ প্রয়োগের ত্রিকালজ্ঞ জাতিস্মর। তাঁর সেমেটিক ও ইয়েটসীয় বিশ্বভৌম সংস্কার (*anima mundi*) থেকে আরম্ভ করে আত্মজীবনী-পুরাণের মানবী নায়িকাদের (বনলতা-সুরঞ্জনা-সুচেতনা-সুদর্শনা-শঙ্খমালা) প্রাক্‌রূপিণী প্রতিমাবৃত্তের দেবায়নের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত কঠোপনিষৎ সমীক্ষণে এসে পৌঁছানো একটি বিশ্বপুরাণ পরিক্রমার সংরক্ত দৃষ্টান্ত।[৩৪]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মিথকে ব্যবহার করেন প্রাকরণিক বিশুদ্ধতার বৈশিষ্ট্যে। তাঁর কাব্যে লক্ষ করা যায় পৌরাণিক শব্দ ও পুরাণকল্পের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য। ভারতীয় ও গ্রিক মিথের শব্দ, রূপক বা প্রতীকে তিনি ব্যক্ত করেন ত্রিশঙ্কু সমকাল ও তার জটিল চরিত্রমানস এবং প্রেম সম্পর্কিত নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি। তবে, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে মিথ প্রয়োগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রকরণ-ঋদ্ধিতে বিষ্ণু দে-র (১৯০৯-১৯৮২) কাব্যে ভারতীয় পুরাণ ও গ্রিক মিথের সহাবস্থান সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের চেয়েও প্রকট। তাঁর কাব্যে একদিকে 'উর্বশী'-'অর্জুন'-'সুভদ্রা', অপরদিকে 'আর্টেমিস'- 'ট্রয়লাস', 'ক্রেসিডা' – অনায়াসে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মিথ একাত্ম। মিথের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেন ক্ষয়িষ্ণু বর্তমানের রূপ এবং মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্বের বৈপ্লবিক আদর্শ। এভাবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণের প্রাচুর্য ও প্রকৌশল দুইই বিষ্ণু দে-র কাব্যের বিস্ময়।

বাংলা সাহিত্যে ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে যিনি পুরাণের শ্রেষ্ঠ রূপকার বলে স্বীকৃত, তিনি বুদ্ধদেব বসু। শুধু সমকালের বহিরাশ্রয় রূপে নয়, পুরাণকে তিনি চিরকালীনতায় উত্তীর্ণ করেন তাঁর সৃষ্টিতে। শুধু কবিতা নয় কাব্য নাটক, পূর্ণাঙ্গ নাটক, অনুবাদ, সমস্ত মাধ্যমেই মিথের স্বচ্ছন্দ, শৈল্পিক ও আধুনিক প্রকাশে তিনি ঋদ্ধ এবং শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বলা যায় সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে তিনি প্রতিস্পর্ধী এক পুরাণ- রূপকার।

কাব্যনাটক ও কাব্যনাটকে মিথ-ব্যবহারের রূপরেখা

কবিতা ও নাটকের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কে কাব্যনাটক একটি সমবায়ী শিল্প (*Mixed Art*)। বহির্বাস্তবতা ও অন্তরাশ্রয়িতার সমন্বয়ে এর চরিত্রধর্ম আধুনিক শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম থেকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। কাব্যনাটক বৈরী সময়ের শিল্প। আধুনিক যুগে শিল্পোন্নত, ধর্মতান্ত্রিক সমাজে যখন আণবিক শক্তি মানুষের মুঠোবদ্ধ, জীবন নতুন নতুন রূপান্তরের মুখোমুখি, প্রতিমুহূর্তে মানুষের জীবন, ভাবনা ও মূল্যবোধ পরিবর্তশীল, যান্ত্রিকতার অভিঘাতে যখন ক্রমসংকুচিত মানবসত্তা ও চৈতন্য, তখন আধুনিক মানুষের সত্তা-সন্ধান, আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসা রূপায়ণের অপরিহার্য মাধ্যমরূপে জন্ম নেয় কাব্যনাটক। কারণ, সেখানে কবিতার মাধ্যমে শব্দাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা প্রকাশের সুযোগ থাকে, যা দ্বারা আধুনিক মানুষ অনুভব করতে পারে যে, 'সে তার অনন্ত বিসরিত সত্তা থেকে, তার স্বভাব থেকে কতদূর নির্বাসিত'। কাব্যনাটক তাই যথার্থ অর্থেই 'আণবিক যুগের শিল্প'।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যাশ্রয়ী নাটকের ইতিহাস প্রাচীন। পৃথিবীর সব দেশে প্রারম্ভিক যুগে কাব্যই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে থাকে। নাটকের ক্ষেত্রেও তাই। প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার ইস্কিলাস, সফোক্লেস, ইউরিপিদিস কিংবা ভারতীয় নাট্যকার কালিদাস – এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নাটকের মাধ্যমরূপে কাব্যকে ব্যবহার করেন। সাহিত্যের এই প্রাথমিক পর্যায়ে কাব্যের সাথে নাটকের সম্পর্ক ছিলো স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু, এ সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক হয়ে ওঠে, যখন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের যুক্তিপন্থী নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকের ভাষা হিসেবে কাব্যকে অযোগ্য বলে মনে করেন এবং গদ্যকে সমাদর করেন তার ব্যবহারিক গুরুত্বের কারণে। চার্লস ল্যাম্ব (*Charles Lamb*) প্রথম নাটক থেকে কবিতাকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং শেক্সপিয়ারের কাব্যিক নাটক মঞ্চায়নের অযোগ্য বলে মন্তব্য করেন। নাটক ও কাব্যের এই বিভেদীকরণের ধারায় আরও নাটক রচনা করেন বার্নার্ড শ' চেখভ প্রমুখ নাট্যকার। তবু ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, সুইনবার্ন, শেক্সপিয়ারের ধারবাহিকতায় কাব্যিক নাটক রচনার প্রয়াস অব্যাহত থাকে। কিন্তু মঞ্চের সাথে যোগ না থাকায় ঐসব নাটক ছিলো অতিমাত্রায় কাল্পনিক এবং বস্তুজগত-বিচ্ছিন্ন। এলিজাবেথীয় যুগের নাটক চরিত্রধর্মে ছিল অব্যবস্থিতচিত্ত; শিল্পের মাত্রাবোধ ও ভারসাম্যহীনতায় বিভ্রান্ত। এ সময়ের নাটক সম্পর্কে এলিয়টের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে এলিজাবেথীয় নাটকের সমস্যা হলো তা কখনো অতিমাত্রায় আধুনিক, কখনো কৃত্রিমভাবে প্রাচীন। এ নাটকের একজন অভিনেতা হয় অতিমাত্রায় বাস্তবসম্মত, নয় অতিমাত্রায় বিমূর্ত।[৩৬] এলিয়টের মূল্যায়নে – 'The weakness or the Elizabethans drama is not it's defect of realism, but its attempt at realism; not its conventions, but its lack of conventions'.[৩৭]

বিংশ শতাব্দীতে টি.এস. এলিয়টের সূত্রে আধুনিক কাব্যনাটকের উদ্ভব ও পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়। এলিয়ট তাঁর সমকালীন নাটক সম্পর্কে প্রশ্ন-সন্ধানী হন যে, কেন এতো কাব্যিক নাটক রচিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো 'আর্টহীন, আনন্দহীন, নীরস পাঠ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে ? কেন মঞ্চের সাথে সেগুলোর সংযোগ রক্ষিত হচ্ছে না? তবে কি আমরা অন্যধরনের শিল্পমাধ্যমে আগ্রহী, নাকি আমরা সাধারণভাবেই নিরুৎসাহিত।[৩৮]এলিয়ট গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অ্যারিস্টটল কথিত *Imitation of life* কে ভাষা দিয়ে সুসমন্বিতরূপে মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে শিল্পের সেই মান ও লক্ষ্য প্রত্যাশিত বা অনুসরণীয়, যা কবিতা ও শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়।[৩৯] এই সব জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তিনি কাব্যনাটক সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হন এবং কাব্যনাটকের প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপন করেন তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। কাব্য ও নাটকের সম্বন্ধ যে অকৃত্রিম এবং অঙ্গাঙ্গী, কাব্য যে অনায়াসে ধারণ করতে পারে একই সাথে বস্তুজগৎ ও অন্তর্জগতকে, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি রচনা করেন –*Murder in the cathedral* (১৯৩৫) *The Family reunion* (১৯৩৯), *The Cocktail Party* (১৯৪৯) প্রভৃতি কাব্যনাটকে।

এলিয়টের সমকালেই আইরিশ কবি ও নাট্যকার *W.B.Yeats* একইভাবে গদ্যনাটকের পরিবর্তে কাব্যনাটকের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। আয়ারল্যান্ডের মঞ্চে যখন গদ্যনাটকের একচ্ছত্র অধিষ্ঠান, তখন ইয়েটস ডাবলিনে তাঁর *অ্যাবি থিয়েটারকে* কেন্দ্র করে কাব্যনাটকের চর্চা শুরু করেন। ইয়েটস মনে করতেন গদ্য নয়, পদ্যই নাটকের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। কারণ, গদ্য নাটকে যেখানে পাওয়া যায় *The image the common mundane existence* সেখানে কাব্যনাটক ধারণ করে *The larger life of poetry*।[৪০] তাঁর চিন্তার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে *The Countess Cathlein* (১৮৯২), *The Land of Heart's Desire* (১৮৯১), *The Shadowy Water* (১৯০০), জাপানী নো-নাটকের অনুসরণে লিখিত *Purgatory* (১৯৩৮) প্রভৃতি কাব্যনাটকে। তারপর সিঙ, সিন, কেসি, ফিলিপস, ফ্লেকার প্রমুখ নাট্যকারগণ এই ধারায় নাটক রচনা করেন। কিন্তু কাব্যনাটকের স্বরূপ, তার চরিত্র নির্ণয় ও সম্ভাবনা সম্পর্কে টি.এস এলিয়টই সর্বাধিক অনুসন্ধানী। এলিয়ট মনে করেন, কাব্যই হল নাটকের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ প্রকাশ-মাধ্যম – গদ্য-নাটকের তুলনায় কাব্যনাটকই জীবনের অত্যন্ত তীব্র ও উত্তেজক রূপটিকে অনেক বেশি

Dhaka University Institutional Repository

সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারে।[৪১] তিনি উপলব্ধি করেন, আধুনিক মানুষের চেতনার কিংবা তার সংকটের শীর্ষবিন্দুকে (*Climex*) ধারণ করতে পারে একমাত্র কাব্য (*Poetry*)। কারণ, কবিতার তুঙ্গ মুহূর্তে নাটকীয়তা যেমন স্বতোৎসারিত, তেমনি নাটকের আততি বা *tension* এর মুহূর্তটিও কবিতাপ্রবণ হতে বাধ্য। এলিয়টের নিকট কাব্য ও নাটকের সম্বন্ধ তাই অবিচ্ছেদ্য। তিনি মনে করতেন কাব্য ও নাটকের সম্পর্ক যতটা স্বাভাবিক, গদ্য ও নাটকের সম্পর্ক ততটাই কৃত্রিম। কিন্তু কাব্যনাটকে কবিতা এবং নাটক এ দু'য়ের ভারসাম্য অপরিহার্য। এ দু'য়ের মাত্রাগত তারতম্যে কাব্যনাটক হয়ে উঠতে পারে লিরিক-আক্রান্ত, অথবা বিশুদ্ধ নাটক মাত্র। তাতে কাব্যনাটকে ব্যহত হয় এলিয়ট কথিত 'আবেগের ঐক্য' (*Emotinal unity*)।[৪২] সুতরাং কাব্যনাটকে নির্দিষ্ট কয়েকটি চরণ কাব্যিক কিংবা কোনো একটি অংশ নাট্যলক্ষণাক্রান্ত হলে চলে না – কাব্যের মধ্যে নাটকীয়তা ও নাটকীয়তার মধ্যে কবিত্ব অন্তর্প্রবিষ্ট হতে হয়। 'এই জৈব ব্যাপার থেকে কাব্যত্ব ও নাটকীয়তাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করার অর্থ, শব ব্যবচ্ছেদ করা অথচ তাতে প্রাণের রহস্য অজানা থেকে যায়। কাব্যনাটককে নাটক হওয়ার পরও কাব্য হতে হবে। ঘটনা গতি উৎকণ্ঠা বিস্ময় এইসব নাটকীয় গুণ যেমন থাকবে, তেমনি ঘটনা চরিত্র ভাষাকে কেন্দ্র করে তারই মধ্য দিয়ে একটি কেন্দ্রিয় তাৎপর্যও পুষ্পিত হবে কাব্যের মতো। কাব্যনাট্যে বস্তুমরীচিকার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে কবির দিব্যদৃষ্টি, কবির ধ্যান। কাব্যনাটককে দুই হিসেবে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হয় – একদিকে জীবনের নাটকীয় সংঘাতের চিত্র হিসেবে, অন্যদিকে কবির দিব্যকল্পনার প্রতীক হিসেবে। দুই স্তরে একই সঙ্গে কাব্যনাট্যকে সফল হতে হবে – বাস্তবতা ও প্রতীকের স্তরে।'[৪৩] অর্থাৎ, দ্বিস্তরী ক্রিয়ার (*Doubleness in action*) কাব্যনাটক একদিকে বস্তুজগৎস্পর্শী, অপরদিকে, তাতে থাকে কাব্যিক চেতনার উদ্ভাসন। তবে রূপক বা প্রতীকী নাটকের মতো এর দু'টি স্তর পৃথক নয়, বরং কাব্যনাটকের দুটি স্তর নিবিড়ভাবে একাত্ম, স্বতঃস্ফূর্ত, যার ফলে এতে তৈরি হয় একটি অন্তর্লীন সাংগীতিক প্যাটার্ন (*musical pattern*) যা কাব্যনাটককে অন্যান্য মাধ্যম থেকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করে।[৪৪]

কাব্যনাটকের আবেদন নিহিত থাকে তার শাশ্বত্বে বা সর্বকালীনতায়। এলিয়ট সেই রচনাকেই 'শাশ্বত' বলে চিহ্নিত করেন, যেখানে বহির্বিশ্বের কোনো ঘটনা, বিষয় অথবা মানবিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ চিন্তন বা অনুভূতির উপস্থাপন ঘটে।[৪৫] একজন কাব্যনাট্যকারের উদ্দেশ্যে থাকে তাঁর ভাবাদর্শের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শিল্পে সেই চিরকালীনবোধকে জাগ্রত করে তোলা। কারণ 'আত্মচেতনাময় মানবসত্তা অন্যের মনোচৈতন্যে নিজের জীবন প্রত্যয় সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যেই কাব্যনাটকের সৃষ্টি।[৪৬] কিন্তু সে দর্শনটি শুষ্ক হলে চলে না, তাতে থাকবে অনুভূতিময় একটি উদ্দীপনা বা শিল্পিত সংবেদনা (*Emotional stimulus*), যে সংবেদনকে বাহন করে নাট্যকার একটি ভাবকে (*Idea*) তাঁর ভাবাদর্শে (*Ideology*) তে রূপান্তরিত করেন। এলিয়ট কাব্যনাটকে নাট্যকারের এই জীবনদর্শনকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন – 'The essential is to get upon the stage this Preciese statement of life which is at the same time a point of view, a world – a world, which the author's mind has subjected to a complete Process of simplification'.[৪৭] মূলত কাব্য ও নাটকের নিবিড় সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্বজনীন ও চিরকালীন ভাবকে যেভাবে প্রকাশ করা যায়, গদ্যে তেমনটি সম্ভব নয়। সাধারণ নাটকে কাব্যনাটকের পার্থক্য এখানে, যে কাব্যনাটকে নাট্যকার ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ – সবকিছুতে নেপথ্যে থেকেও তার সর্বময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনুভব করা যায় নাটকের সর্বত্র। এলিয়টের ভাষায় – 'The world of a great poetic dramatist is a world in which the creator is everywhere present and every where haidden'.[৪৮]

এলিয়ট কবিতার ক্ষেত্রে তিন ধরনের *voice* বা স্বর নির্ধারণ করেন – যার প্রথম *voice* এর অর্থ কবির স্বগতোক্তি, দ্বিতীয় *voice* হলো দর্শক বা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কবির উক্তি এবং তৃতীয় স্বর বা *Third voice* হলো কবি নিজেই যখন তাঁর সৃষ্ট কোনো নাটকীয় চরিত্রের কাব্যিক সংলাপে অন্তর্প্রবিষ্ট হন এবং একটি কল্পিত চরিত্রের সাথে অপর কল্পিত চরিত্রের কথোপকথনেও ব্যক্ত হয় তাঁর বাণী। এলিয়ট চিহ্নিত করেন যে – কবির এই প্রথম স্বর

Non dramatic অর্থাৎ কবিতা, দ্বিতীয় স্বর *quasi-dramatic* অর্থাৎ কিছু মাত্রায় নাটকীয় এবং তৃতীয় স্বর *dramatic* অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে নাটকীয়।[৪৯] এলিয়ট কথিত এই তৃতীয় স্বরই ধ্বনিত হয় কাব্যনাটকে, যেখানে চরিত্র ও তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নিজের উপলব্ধিকে উপস্থাপন করেন নাট্যকার।

নাটকীয় ঐক্য ও কবিতার সংহতি যুগপৎ কাব্যনাটককে পৌঁছে দেয় একটি চূড়ান্ত সঙ্গতিতে। এই দুই ধারার সমন্বয়ে কাব্যনাটক হয়ে ওঠে সংবেদনময় ঘনবদ্ধ শিল্প। একটিমাত্র ভাবের সঙ্গতি কাব্যনাটকের লক্ষ্য হওয়ায় এটি গীতিকবিতার মতো প্রসর্পিত নয়, কিংবা পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো বিস্তারিত নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাঙ্ক নাটকের মতো ঘনপিনদ্ধ, স্বল্পকায়। একটিমাত্র দ্বন্দ্ব বা সংঘটনের সাপেক্ষে নাটকে সচল হয়, একটি অনুভূতিময় চিন্তনক্রিয়া, যে আত্মিক, শৈল্পিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকার তার উপলব্ধিকে প্রতিষ্ঠা করেন পাঠক-দর্শক ও রসবেত্তাদের নিকট, 'সে অ্যাকশন শুধু ঘটনার নয়; কবিতার, চিত্রকল্পের, শব্দের, সংকটের, গতিময়তার'।[৫০] এইভাবেই ঘটনা, প্রতিরূপক, নাট্যকারের জীবনদর্শন – সবকিছু মিলে কাব্যনাটক হয়ে ওঠে বহুস্তরিক। কাব্যনাটকের প্লট নির্মিত হতে পারে কোনো গল্প বা বিশেষ ভাবকে (মুড) কেন্দ্র করে; মিথ অথবা ইতিহাসকে অবলম্বন করে। তবে কাব্যনাটককে ঘটনাগত বা ভাবগত বা আবেগগত পরম্পার ভেতর দিয়ে সংঘাতের পর সংঘাত তুলে সঙ্কটের সূচিবিন্দুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়।[৫১] একটি সাধারণ মানবীয় বিষয়কে নাট্যকার কাব্যনাটকে প্রতিষ্ঠা দেন এক অভিনব আঙ্গিকে। তবে, এই কার্যকরণ এবং অনুভববেদ্যতা – এই দু'য়ের সামঞ্জস্য কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যাহত হলে নাট্যকার পাঠক বা দর্শকের প্রতীতি অর্জনে ব্যর্থ হন। কাব্যনাটকে নাট্যকারের এই চিন্তন ও অনুভূতির অন্তর্ময় সংশ্লেষণ অপরিহার্য; অন্যথায় তা শুষ্ক দর্শনে পর্যবসিত হয় অথবা ভাবালুতায় উদ্বায়ী হয়।

ফলে, কাব্যনাটকের চরিত্রগুলো, বিশেষত প্রধান চরিত্র নাট্যকারের এই *Idea* কে ধারণ করে বিবর্তিত হয়। প্রথমে একটি অপ্রকাশ্য বা অনির্ণেয় তাড়নায় পীড়িত হয়। অনুভূতির এ দায়বদ্ধতা এমন, যে তারা সেটিকে চিহ্নিত ও করতে পারে না আবার তা থেকে মুক্তও হতে পারে না। কেবল যন্ত্রণাময় চংক্রমণ চলে নিজের মধ্যে, ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না কোনো আত্মসিদ্ধান্তে বা একটি ভিন্নতর সত্যে উপনীত হতে পারে। সে সত্য হতে পারে আত্মক্ষয়ী, হতে পারে সমাজ প্রচলিত প্রথার উর্ধ্বে এক নতুন সত্য কিংবা বিশ্ব ও সমাজের কল্যাণকামী কোনো উপলব্ধি। চরিত্রটির রূপান্তর ও তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পীর কোনো অনির্বচনীয় দর্শন।

চরিত্রের ট্র্যাজিক পতন কিংবা নাটকীয় পরিণতি দেখানোই কাব্যনাট্যকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কোনো সংকট বা সংবেদনাকে চেতনায় বহন করে একটি যন্ত্রণাময় পথে সে পরিচালিত হয় একটি সত্যের লক্ষ্যে। রামবসুর ভাষায় 'কাব্যনাটকে যে দর্শন ও তত্ত্ব নিহিত থাকে – 'সেই তত্ত্ব ও তর্ক মানব চরিত্রের মৌল সমস্যা ও আবেগ থেকে উৎসারিত হয়ে পাত্রপাত্রীকে উন্মোচিত করতে করতে পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে' এবং 'সার্থক' কাব্যনাটকের অম্বিষ্ট হলো 'এনিমেটেড সেল্‌ফ রিয়ালাইজেশন' অর্থাৎ আত্ম-উপলব্ধির রূপায়ণ।[৫২] কাব্যনাটক ব্যতীত অন্যান্য নাটকের চরিত্রে এই দার্শনিকের উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় না। শেক্‌সপিয়ারের হ্যামলেট চরিত্রেও লক্ষ করা যায় তীব্র আত্মিক দ্বন্দ্ব, মানসিক টানাপোড়েন, কিন্তু তার পরিণাম আত্মক্ষয় – কোনো উত্তরণ নেই চরিত্রটিতে। সমস্ত নাটক জুড়ে যে রক্তক্ষয়ী আত্মদ্বন্দ্ব ঘটে তার সংশ্লেষণ পাওয়া যায় না। হ্যামলেট তার যন্ত্রণাকে কোনো নতুন ভাবনা বা দর্শনে প্রতিস্থাপন করতে পারেনা বলেই এলিয়ট তাঁর চরিত্রে *Objective co-relative* এর অভাব দেখতে পান।[৫৩] আর এ জন্যই শিল্পের ক্ষেত্রে 'মোনালিসা'র সমতুল্য 'আর্ট' হয়েও এলিয়টের বিচারে *হ্যামলেট* শেসক্‌পীয়ারের এক শৈল্পিক ভ্রান্তি *an artistic failure*।[৫৪] কিন্তু, কাব্যনাটকের চরিত্রকে অবশ্যই একটি দর্শন বা উপলব্ধিতে উন্নীত হতে হয়। আর সেই রূপান্তরের মুহূর্তটিতে, যখন নাটকের তুঙ্গ অবস্থানে কবিতাও স্বতোৎসারিত, তখন সেই বিশেষ চরিত্রটি হয়ে উঠতে পারে সুনিয়ন্ত্রিত। যদিও নাটকের সমস্ত চরিত্রকে পরোক্ষভাবে নাট্যকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়,

Dhaka University Institutional Repository

তবু ঐ বিশেষ মুহূর্তটিতে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। কবিত্ব ও নাটকীয়তা দ্বারা টলায়মান হতে পারে তার সর্বজ্ঞ অবস্থান আর তখন চরিত্রগুলো হয়ে উঠতে পারে স্বাধীন। কাব্যনাটকে আবেগের ঘনত্ব (*emotional intencity*) এবং নাটকীয়তা রক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এলিয়ট –

> When the poetry comes, the parsonage an the stage must not give the impression of being merely a mouthpiece for the author. Hence the author is limited by the kind of poetry, and the degree of intensity in its kind, which can be plausibly attributed to each character in his play. And these lines of poetry must also justify themselves by their development of the situation in which they are spoken. Even if a burst of magnificent poetry is suitable enough for the character to which it is assigned, it must also convince us that it is necessary to the action; that is helping to extract the utmost emotional intensity out of the situation।[৫৫]

সুতরাং কাব্যনাটকের চরিত্র নিয়তির হাতে বন্দী নয়, বা কোনো লক্ষ্যহীনতায় আবর্তিত নয়, বরং রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সে একটি দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে। কাব্যনাটকে চরিত্রগুলো বস্তুজগতের বাসিন্দা। কারণ, এখানে নাট্যকার দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চারপাশের পরিচিত মানুষের আবেগ অনুভূতিকেই শিল্পিতা দান করেন। তবে, যেহেতু বর্হিবাস্তবতা অপেক্ষা অন্তর্বাস্তবতাই এখানে মুখ্য, সেহেতু চরিত্রের মনোজাগতিক দ্বন্দ্বই সাধারণত কাব্যনাটকের উপজীব্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটতে পারে কাব্যনাটকে, যারা মর্যাদা, জ্ঞান, শিক্ষা ও মানসিকতায় ভিন্ন ভিন্ন। চরিত্রগুলোর প্রতিবেশ ও মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী নাট্যকার তাদের মুখে ভাষা যোগান।[৫৬] একারণেই কাব্যনাটকের ভাষা যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনি বাস্তবসম্মত হওয়া বাঞ্ছণীয়। বিশেষত, এখানে কবিত্ব যেহেতু নাটকীয়তার অনুবর্তী, সেহেতু সংলাপে আবেগ অপেক্ষা নাটকীয়তার গুরুত্ব অধিক – যেন কখনোই মনে হয় না, এখানে কবিত্বই সব। অর্থাৎ, এলিয়ট বলতে চান, বক্তব্যের প্রয়োজনেই কবিত্ব, ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে নয়। কবিত্বের সূক্ষ্মতা এবং নাটকীয় পর্যবেক্ষণ দুই-ই থাকা প্রয়োজন কাব্যনাটকে। কারণ, 'কাব্যনাটকের ভাষা 'হীনস্বপ্ন' ও 'সমুন্নত স্বপ্নের' আপাত দ্বিধাবিভক্তি নিয়ে জগতের মধ্যে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করবে। বস্তুসত্য ও তদতিরিক্ত সত্যকে এই ভাষা একই সঙ্গে স্পর্শ করে নাটকীয়তা ও কাব্যত্বের যুগ্ম সার্থকতায়।[৫৭]

এলিয়ট কাব্যনাটকের ভাষাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন – গদ্যভাষা (*prose*), কাব্যভাষা (*verse*) এবং দৈনন্দিন ভাষা (*ordinary speech*)। তিনি মনে করেন, নাটকের ক্ষেত্রে গদ্য-ভাষার ব্যবহারও কৃত্রিম মনে হতে পারে, কারণ নাটকে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তা হুবহু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথ্যভাষার মতোও নয়। ফলে, গদ্যভাষায় নাটক মঞ্চস্থ হলেই যে সাধারণ দর্শকের আস্থা অর্জন করা যাবে তা বলা যায় না। আবার, কাব্যভাষার ব্যবহার নাটকে হয়ে উঠতে পারে গদ্যের মতোই স্বাভাবিক। উপরন্তু, তার কাব্যিক আবেদন পাঠক-দর্শককে আনন্দ দান করতেও সক্ষম। এলিয়টের ভাষায় 'Dramatic prose is as artificial as verse, and conversely, verse can be as natural as prose।'[৫৮] মূলত-কাব্য-ভাষার শক্তি ও সম্পন্নতায় বিশ্বাসী এলিয়ট মনে করতেন এই ভাষায় যে কোনো বক্তব্যকেই প্রকাশ করা সম্ভব। যদি এমন হয় যে কোনো দৃশ্য অনমনীয় (*unelastic*) কাব্য-ভাষার বশবর্তী নয়, অর্থাৎ কাব্য-ভাষায় তা চিত্রিত করে তুলতে দুঃসাধ্য হবে, তবে ঐ বিশেষ দৃশ্যটি প্রয়োজনে পরিহার করতে হবে। তবে, কাব্যনাটকে গদ্যপদ্যের মিশ্রণ সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, যেমনটি লক্ষ করা যেতো এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যে। এলিয়টের ভাষায় 'It is for the reason that the mixture of prose and verse in the same play must be avoided।'[৫৯] কারণ, দর্শক ভাষার এ মিশ্রণে সতর্ক হয়ে উঠতে পারে। পাঠক বা দর্শককে সচকিত না করে, তাদের মধ্যে ভাষার কবিত্বকে সঞ্চারিত করে দিতে হয় – তাদের উৎসুক করে

Dhaka University Institutional Repository

তুলতে হয় কবিতার প্রতি নয়, কবিতার বক্তব্যের প্রতি 'not to the poetry, but to the meaning of poetry।'[৬০] কাব্যভাষায় তাদের অভ্যস্ত করে তোলা কাব্যনাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য। কাব্যনাটকের ভাষা কাব্যিক হয়, কিন্তু তা সর্বদাই নয়। যখন একটি সংবেদনঘন নাট্যমুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখনই তা আগোত্মক হয়ে ওঠে, অন্যথায় তা স্বাভাবিক, সমস্ত ধরনের ভাব প্রকাশে সক্ষম।[৬১] ফলে, কাব্যনাটকের ভাষা একই সাথে কবিত্বপ্রবণ, নাটকীয়তাপূর্ণ এবং অন্তর্লীনভাবে সাংগীতিকও (*musical design*) বটে। কারণ, 'সংগীতের মাত্রা যুক্ত হলে তবেই ভাষা উঠতে পারে মহত্তর স্তরে, প্রবেশ করতে পারে গভীরে। কাব্যনাট্যের ছন্দোবদ্ধ ভাষার মধ্যেই আছে সংগীতের সেই অতিরিক্ত মাত্রা – তাই কাব্যনাট্য যদি ধরতে চায় অন্তর্গূঢ় সত্যকে, বস্তুর নিহিত সত্তাকে, যদি আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে যেতে চায় সত্যোপলব্ধির মহত্তর স্তরে, তবে কাব্যনাট্যের ভাষা সংগীতময় তথা ছন্দময় হতে বাধ্য। শব্দের অর্থ ও ধ্বনির যৌথ ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে যে কাব্যসংগীত জন্ম নেয়, সেই সংগীতই নিয়ে যেতে পারে আমাদের বাস্তব বৃত্তের বাইরে, সত্যের কাছাকাছি। বস্তুর জগৎ আর নিহিত সত্যের পৃথিবী – এই দুই আপাতপৃথক জগতের মধ্যে টংকৃত ছন্দোময় ভাষা সার্কাসের টান-টান তারের মতো সংযোগ রচনা করে।'[৬২] ১৯৫০ সালে 'হার্বার্ট য়্যুনিভার্সিটি'তে *Poetry and Drama* শীর্ষক ভাষণের দ্বিতীয় অংশে এলিয়ট কাব্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও জানান। কাব্যনাটকের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তাঁর সেই অভিজ্ঞতাটিও গুরুত্বপূর্ণ। এলিয়ট যখন কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হন তখন উপলব্ধি করেন যে, কাব্যনাটকের প্রধান সমস্যা হলো সংযোগ সাধনের (*communication*) বিষয়টি। অর্থাৎ, যা তিনি লেখেন, তার দর্শক নতুন, অভিনেতা ও পরিচালকও অনভিজ্ঞ। এলিয়ট বলেন এ সমস্যার সমাধানকল্পে কাব্যনাটকের অভিনেতাকে পারদর্শী ও আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম হওয়া প্রয়োজন এবং সবসময় নাটকীয় কার্যকারণ সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতে হবে।'[৬৩] এলিয়ট তাঁর কাব্যনাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাটকীয়তার বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সচেতনভাবে তিনি তাঁর কবিসত্তাকে অবদমিত রেখে কবিত্ব ও নাটকীয়তার ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়াসী ছিলেন।[৬৪] সর্বোপরি, এলিয়টের লক্ষ্য ছিলো কাব্যনাটকের মঞ্চ-সফলতা ও দর্শক-প্রিয়তা। এই দু'টি বিষয়ে ব্যর্থ হলে কাব্যনাটক সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জনে সক্ষম হবে না কখনোই।

সাহিত্যে মিথের সাথে কাব্যনাটকের সৌহার্দ্যও এলিয়টের সূত্রেই। তিনি 'ঐতিহ্য' ও 'কাব্যনাটক' – দু'টি বিষয় নিয়েই গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন এবং দু'য়ের সংযোগে আধুনিককালে শিল্পের নতুন মাত্রা ও সম্ভাবনা সূচিত করেন। তাঁর *The Family Reunion* (১৯৩৯), *The Cocktail Party* (১৯৪৯), *The Confidential Clerk* (১৯৫৩), *The Elder Statesman* (১৯৫৮) প্রভৃতি নাটকে গ্রিক পুরাণের প্রচ্ছদে আধুনিক জীবনকে রূপান্তিত করেন এলিয়ট। তাঁর *The Family Reunion* নাটকের *অরেস্তেসের* কাহিনী, *The Cocktail Party* -তে *অ্যালমেসতিসের* কাহিনী, *The Elder Statesman* -এ *ঈডিপাস অ্যাট কলোনাসের* কাহিনী আধুনিক জীবনানুষঙ্গে চিত্রিত।

আইরিশ কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েটসও আয়ারল্যান্ডের পৌরাণিক আখ্যান ও রূপকথা অবলম্বনে কয়েকটি কাব্যনাটক রচনা করেন। তিনি আইরিশ পুরাণ কাহিনীতে নিজের জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চারিত করে রচনা করে তাঁর প্রথম কাব্যনাটক *The Countess Chathleen* (১৯৯২)। এ ছাড়া *The Land of Hart's Desire* (১৮৯১) এ রূপকথার আশ্রয়ে এক তরুণী বধূর মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে জাগ্রত করেন। তবে ইয়েটস তাঁর কাব্যনাটকে মিথ–ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মূলত আইরিশ জনগণের জাতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান 'Ireland in our day has discovered the old heroic literature of Ireland, and she has rediscovered the imagination of the folk. My own preoccupation is more with the heroic legend than with the folk.'[৬৫]

বাংলা সাহিত্যে মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটকের ধারাটি নির্মিত হয় ক্রমান্বয়ে – মিথকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতা, আখ্যান-কবিতা, নাট্যকাব্যের ধারাবাহিকতায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনায় মিথ, কাব্য ও

Dhaka University Institutional Repository

নাটক এই তিনটি বিষয় একাত্ম হয়। তবে, গঠনগত দিক থেকে তার কোনোটি কাব্যনাটক নয়। মধুসূদন তাঁর *বীরাঙ্গনা* কাব্যে (১৮৬২) পৌরাণিক নারীদের আধুনিক জীবনোপলব্ধির প্রকাশ ঘটান পত্রকাব্যের আঙ্গিকে তাদের নাটকীয় আত্মভাষণগুলো (*Dramatic monologue*) কবিত্বপূর্ণ এবং জীবনধর্মী। যদিও রোমক কবি ওভিদের অনুসরণে সচেতনভাবে মধুসূদন এই পত্রকাব্য রচনা করেন, তবুও কাব্যনাটকের অন্তর্সত্তাটি ক্ষীণভাবে এখানে উপলব্ধি করা যায় – যা তাঁর অন্য কোন রচনায়ও লক্ষীভূত হয় না। মধুসূদনের কাব্যের এ বৈশিষ্টের কারণেই ড. কণিকা সাহা বাংলা কাব্যনাটকের উৎস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'পথিকৃৎ' বলে স্বীকৃতি দেন তাঁকে – 'প্রকৃতপক্ষে কবিতার নাট্যসম্ভাবনার দিকটিকে সংহত সাবলীলতায় নিশ্চিত সার্থকতায় কিন্তু আত্ম-অসচেতনায় প্রথম যিনি শিল্পিত করেছেন, তিনি কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)।'[৬৬]

মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথ মিথ, কবিতা ও নাটকের এই সম্পর্ককে আরো বেশি আত্মিক করে তোলেন। তিনি প্রথম এই মিথস্ক্রিয়া ঘটান নাট্যকাব্য *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২) ও *বিদায় অভিশাপে* (১৮৯৪)। *চিত্রাঙ্গদায়* অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার আসক্তি ও পরিণয়ের মধ্য দিয়ে *মহাভারতের* আখ্যান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রূপ-অরূপের' দর্শনকে শিল্পিত করেন। *বিদায় অভিশাপেও* তিনি *মহাভারতের* 'দেবযানী ও কচ' এর কাহিনীর পুনর্নির্মাণ ঘটান। তারপর আবার *মহাভারতের* কাহিনী অবলম্বনে তিনি রচনা করেন নাট্যকাব্য *গান্ধারীর আবেদন* (১৮৯৭), *কুর্ণকুন্তীসংবাদ* (১৯০০) ও *নরকবাস* (১৮৯৭)। তিনটি নাটকেই মিথের চরিত্র, ঘটনা ও আবেদনকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরুজ্জীবিত করেন তিনি। এভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কবিতা ও নাটকের ব্যবধানকে ক্রমশ হ্রস্ব করে কাব্যনাটকের স্বভাবধর্মকে পরিস্ফুট করে তোলেন। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীতে এলিয়ট এবং ইয়েটসের কাব্যনাটকের আদলে কিছু মিথ-নির্ভর কাব্যনাটক রচিত হয়। যেমন- অজিত দত্তের *যুধিষ্ঠির* (১৯৪৬), রাম বসুর *পার্থ ফিরে এলো* (১৯৭৪) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের *একলব্য* (১৯৫৯) প্রভৃতি। কিন্তু, এগুলো বিচ্ছন্ন প্রয়াসমাত্র। বিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্যে মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটককে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেন *ঐশ্বর্য* ও উৎকর্ষের নানামাত্রিকতায়, তিনি - বুদ্ধদেব বসু, মনন, অধ্যায়ন ও শিল্প-ভাবনায় তিনি পুরাণের বিনির্মাণ ঘটান তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০) *প্রথম পার্থ* (১৯৭০), *সংক্রান্তি* (১৯৭৩) কাব্যনাটকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পভাবনাকে আত্তীকরণ করে নিজস্ব জীবন-চেতনা ও নন্দন-নিরীক্ষায় তাঁর মৌলিক কাব্যনাটকগুলো বাংলা সাহিত্যে অনন্য দৃষ্টান্ত। এছাড়া অনুবাদ বা 'অনুলিখন' করেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর *পার্গেটরি* (১৯৩৯) অবলম্বনে কাব্যনাটক *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯৭০) এবং জাপানী কবি কোম্পারু মোতায়াসুর (১৪৫৩-১৫৩২) 'নো' নাটক অবলম্বনে *ইক্কাকুসেন্নিস* (১৯৭১)। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব-অনুসৃত পথে মিথের প্রচ্ছায়ায় আধুনিক জীবনানুষঙ্গে কাব্যনাটক রচনা করেন মণীন্দ্র রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

মূলত আধুনিক সাহিত্যে কাব্যনাটকের সাথে মিথের এই সখ্যের বস্তুগত কারণ বিদ্যমান। কাব্যনাটকের মতো একটি সময়োচিত মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিল্পী যখন তাঁর জীবন-চেতনা প্রকাশের যথার্থ 'আধেয়' অন্বেষণে ব্যর্থ হন, তখনই সেই নিরবলম্ব শিল্পী বিকল্প-সন্ধানী হন। মিথের ভেতর যখন তিনি তাঁর জীবনোপলব্ধির যোগ্য 'আর্কিটাইপে'র সন্ধান পান, তখনি কাব্যনাটক ও মিথ শৈল্পিক হৃদ্যতায় অভিন্ন হয়। পুরাণের কোনো নির্দিষ্ট আখ্যানে শিল্পী যখন তাঁর আধুনিক চেতনাকে অনুপ্রবিষ্ট করেন, তখন তা অর্জন করে বহুমাত্রিকতা – একদিকে বহুশ্রুত, পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা ও প্রতিবেশ আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত (*Stimulate*) করে, সাধারণ পাঠকের প্রত্যয় জন্মায়, অপরদিকে আধুনিক মানুষিকতা সঞ্চারের ফলে চরিত্রগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমকালীন জীবন -অভিঘাতকে প্রত্যক্ষ করে তারা এবং এ দু'য়ের সমন্বয়ে নাট্যকার তাঁর দর্শনকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন সহজেই। দর্শক বা পাঠকও একটি চিরন্তনবোধে জীবনের প্রতি আস্থা অর্জন করে। বস্তুত, ক্রমাগ্রাসর যান্ত্রিকতায় আধুনিক মানুষের চেতনার শাসন ও শুশ্রূষায় মিথ যেমন এক আশ্চর্য বিশল্যকরণী, তেমনি কাব্যনাটকও আধুনিক শিল্পের বিচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসার অনন্য সমন্বয়ক এক মাধ্যম – যেখানে বস্তু জগৎ ও চেতনা জগৎ, আবেগ-অনুভূতি ও দ্বন্দ্ব-সংকট, দৃশ্যলোক ও শ্রুতিলোক পরস্পরের ঘনিষ্টতর পরিপূরক। মিথের সঙ্গে যখন এই আধুনিক মাধ্যমটির সংযোগ ঘটে, তখন চিরাগত ও বর্তমানের যৌগিকতায় নির্মিত হয় যুগোত্তীর্ণ শিল্প। বাণিজ্য পুঁজির এই রমরমা সময়ে সাহিত্য যখন পণ্যে পরিণত এবং, সব শিল্প-মাধ্যমই ক্ষণস্থায়ী, তখন মিথ-নির্ভর কাব্যনাটকগুলো চেতনার চিরন্তন আবেদনে স্থায়িতর। মিথ ও কাব্যনাটকের মিথস্ক্রিয়া তাই আধুনিক শিল্পীদের নিকট ক্রমশ আদ্রিয়মান।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১ Leslie Fiedler, 'Archetype and Signature' (The Relationship of poet and poem), 'Myths and Motifs in Literature', D.J. Burrows & others, 1973, The Shing Co. Inc. New York, Page. 28

২ ডক্টর কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা*', আগস্ট ১৯৮০, 'মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৭৩, পৃ. ১৮

৩ Maria Leach, ('Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legand, Vol, ii, 1949, P. 778), উদ্ধৃত, 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, এপ্রিল, ২০০১, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কালকাতা ৭০০০০৯

৪ 'Primordial image, an orginal pattern of model from which other of the same kind are derived', 'Myths and Motifs in Literature', D.J. Burrows & others,1973, The Shing Co. Inc. New York, Page. 450

৫ David Adams Leeming, 'The World of Myth', 1990, Oxford University Prees, New York, Page. 3

৬ 'Ms. Bodkin suggest, instead, that possibly the archetypal patterns are culturally acquired, that is the patterns are taught to and learned by successive generations. This suggestion is useful, as it seems to account for the cultural modifications, that archetypes in their various manifestations from culture to culture.' - David J. Burrows 'Myths and Motifs in Literatare David J Burrows and others, 197; 'The Free Prees, A Division of Macmillan Publishing co.; The New york, Page. 1

৭ In the Last analysis, they (myths) are our basic physiological tools for working together. A hammer is a carpenter's tool; a wrench is a mechanic's tool for welding the sense of interrelationship by which the carpenter and the mechanic, through differently occupied, can work together for common social ends. In this sense a myth that works well is as real as food, tools and shelter are. - W.Herbert Simons and Trevor Melia (eds) 'The Legacy of Kenneth Burke,' Laurence Coupe 'Myth', 1997, by Roltdedge, London & New Yorks. Page. 69

৮ C. Kerenyi essays on the myth of the divine Child and the mysteries of elusis' এর ভূমিকা নিবন্ধ, C.G. Jung and C. Kereny', "Science of mythology', রূপান্তর: বজলুল করিম বাহার, 'মিথ-চেতনার আদিবিশ্ব', 'নৃ,' সাহিত্য ও শিল্প সংকলন মিথ সংখ্যা, মে ১৯৯২, অনুশীলন ১৭/১ আজিজ মার্কেট শাহবাগ, ঢাকা, পৃ. ১৬৫

৯ বুদ্ধদেব বসু, 'গোত্রবিচার', 'মহাভারতের কথা', পৌষ ১৩৯৭, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি. ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২২-৩৩

১০ 'সেইসব অনিঃশেষ-রহস্যপূর্ণ চিত্রকল্প,যাকে ইউরোপীয় ভাষার 'মিথ' বলা হয় – আর হিন্দুরা আরো দৃষ্টিবানভাবে যার নাম দিয়েছিলেন পুরাণ – একাধারে আদিম ও চিরন্তন, চিরপুরাতন ও চিরনূতন সেই সামগ্রী' বুদ্ধদেব বসু, 'গোত্র

Dhaka University Institutional Repository

বিচার', 'মহাভারতের কথা' পৌষ ১৩৯৭ এম.সি. সরকার সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি. ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৯

১১ বুদ্ধদেব বসু, 'গোত্র বিচার', 'মহাভারতের কথা' পৌষ ১৩৯৭ এম.সি. সরকার সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি. ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩২

১২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঐতিহ্য ও টি.এস.এলিয়ট', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ', জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০৭৩, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, পৃ. ১৪০

১৩ রিচার্ড চেজ, 'মিথচর্চার প্রসঙ্গকথা', অনুবাদ - নুজহাত আমিন মান্নান, উদ্ধৃত, 'নৃ' সাহিত্য ও শিল্প সংকলন, মিথ সংখ্যা, মে ১৯৯২, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, পৃ. ২০

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যসৃষ্টি, 'সাহিত্য' 'বিচিত্রা', রবীন্দ্র জন্মশত বর্ষপূর্তি সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ১৫৫

১৫ David Adams leeming, 'The world of myth', 1990, Oxford University Press, New York, Page. 8

১৬ জীবনানন্দ দাশ, 'কি হিসেবে শাশ্বত', 'কবিতার কথা', 'জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসংগ্রহ', ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পাদিত) ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, মাওলা ব্রাদার্স ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৪৪-৪৫

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১৮ The modern nostalgic feels that an irreparable break has taken place between the past and the present, in society and in man's soul. The dubious material gains of progress have been made at the price of stupendous spiritual loss. The nostalgic modern sensibility, looking back on the past, is like Othello viewing Distimona strangled on the bed. He has thrown away all that is precious and valluable in his life in his pursuit of a self- condemned aim. ... The mudered past is reborn as vision more precious than enything the present has offer.' Stephen spender, "Hatred and Nostalgia in the modern, 1965, Methuen & co Ltd. 11 New Fetter lane, London ec, page. 209

১৯ T.S Ediot, 'The Possibility of a Poetic Drama' 'Scleted Essays', 2000, Dhaka Publications 4497/14, 1st floor Gure Nanak Market, Nai Sarak, Delhi-110006, Page. 50.

২০ 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, এপ্রিল ২০০১, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২

২১ I use 'Signature' to mean the sum total of individuating factors in a work, the sign of the Persona or Personality thought which an Archetype is rendered and which itself tends to become a subject as well as a means of poem. Litereature, Properly speaking can be said to come into existence at the moment a Signature is imposed upon the Archetype. The purely archetypal, without signature element, is the myth' -Leslie Fiedler, ' Archetype and signatures, the Relationship of poet and poem', David J. Burrows, 'Myth & Motif's in literature' David J. Barrows & others, 1973, The Free press, A Division of macmillan publicsling co; The New York, Page. 28

২২ Ibid, Page, 28-29

Dhaka University Institutional Repository

২৩ 'Tradition is a matter of much wider significance. It can not be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical senge, not only of the pastness of the past, but of its presence; .... No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artist,' T.S. Eliot, 'Tradition and the individul talent' 'Selected Essary,' 2000, Doaba Publications, 4497/14, 1st floor Guru Nanak Market, Nai Sarak, Dellhi-110006, Page. 2

২৪ Ibid, Page. 5-6

২৫ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঐতিহ্য ও টি.এস.এলিয়ট', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ', জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১৫৬

২৬ 'A ceremonial act; a procedure resulting from custom, Ritual puts chaotic experience into an ordered form (Such as dence); it usually is associated with important life function such as adulthood, marriage, death,' 'Mythy & Motifs in litera.ture' Ed; by, David J. Burrows and ofhers, 1973, The Free Press A Division of Macmillan Publicashing co; The New York, Page. 460-461

২৭ ' ... instead of the narrative method, we many now use the mythical method. It is. I Seriously believe, a step toward making the modern world for art', T.S. Eliot, 'Myth', Laurence Coupe. 1997, London and New York, Page. 35

২৮ বার্ণিক রায়, 'ঐহিত্য ও বাংলা কবিতা', কবিতা: চিত্রিত ছায়া, ১৩৭৮, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি কলিকাতা-৬, পৃ. ২৮

২৯ 'জোসেফ এ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স' ও 'ডক্টর ফস্টাস' পুরনো ইহুদী স্থান মিশর ও মধ্যযুগের জার্মান জীবনের প্রতীকীয়তায় আড়ালে আজকের ক্লান্ত নষ্ট সভ্যতার ও সময়ের নিহিত ও অতীত চেতনার সমাহিত মুমুক্ষার উপন্যাস সব; এ যুগ কি এর চেয়েও বড় উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে? মানের এই বই গুলোর সমগভীর সমবিস্তীর্ণ পটের উপন্যাস কোথায়? জীবনানন্দ দাশ, 'ডক্টর ফস্টাস: টমাস মান', 'অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলি', 'জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সংগ্রহ', ফয়জুল লতিফ, পৃ. ১৪১-১৪২

৩০ বুদ্ধদেব বসু 'মাইকেল' 'সাহিত্যচর্চা' ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০৭৩, পৃ. ২৫-২৬

৩১ ডক্টর কমলেশ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র ভূমিকা', আগস্ট ১৯৮০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৭১

৩২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিনান্ত', 'কুলায় ও কালপুরুষ', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ', জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৭২

৩৩ 'Mythopoesis, the creation of myth, as by modern writers; the development of symbols and narrative that represent controling philosophic Ideas for given group of people', David J. Burrous & others, 1973, The free press, A Division of Macmillan Publicashing Co; the New York, Page. 458

Dhaka University Institutional Repository

৩৪ আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ' 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, অক্টোবর ১৯৮৩, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা-৬, পৃ. ২৪৫

৩৫ রামবসু, 'কাব্যনাটক', 'নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নভেম্বর ১৯৯৪, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩০৩-৩০৫

৩৬ 'An actor in an Elizabethan paly is either too realistic or too absract in his treatment,... The difficulty in presenting Elizabethan plays is that they are liable to be made too modern or falsely archaic.'- T.S. Eliot, 'Four Elizabethan Dramatists', 'Selected Essays', 2000, Doba Publications, 4497/14, Guru Nank Market, Nai Sarak, Delhi – 110006, Page. 65

৩৭ Ibid

৩৮ T.S. Eliot, 'The Possibbility of Poetic Drama', 'Selected Essays', 2000, Doba Publications, 4497/14, Guru Nank Market, Nai Sarak, Delhi – 110006, Page 49

৩৯ '.... but where you have 'imitations of life' on the stage, with speech, the only standerd that we can allow is the standerd of the work of art, aiming of the same intensity at which poetry and the other forms of art aim.' Ibid, Page. 54

৪০ W.B. Yeats, উদ্বৃত, ড. কণিকা সাহা, 'আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যঃ উদ্ভব ও বিকাশ', জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট, কলকাতা-৬, পৃ. ৯

৪১ এলিয়টের একটি বেতার ভাষণ থেকে উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪২ The poetic drama must have an emotional unity, let emotion be whatever you like.It must have a dominant tone, and if this be strong enough. The most heterogeneous emotions maay be made to re-inforce it' T.S. Eliot, 'Selected Essays', 1951, Faber and Faber, Page 214

৪৩ অশ্রুকুমার সিকদার, 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা', 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর ১৯৮৩, ভারত বুক এজেন্সি ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা-৬, পৃ. ২৭৯

৪৪ T.S. Eliot, 'The Need for Poetic drama' উদ্বৃত, ড. কণিকা সাহা, 'আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্যঃ উদ্ভব ও বিকাশ', জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট, কলকাতা-৬, পৃ. ১৫

৪৫ 'Permanent literature is always a presentation, either a presentation of thought, or a presentation of feeling by a statement of event in human action or objects in the external world'- T.S. Eliot, The possibility of a Poefic "Drama' Seleted Essays, 2000, Dhaka Publications 4497/14, 1st floor Gure Nanak Market, Nai Sarak, Delhi-110006, Page. 52

৪৬ মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য এ কালের জীবনভাষ্য', ফেব্রুয়ারি ২০০৯, করুণা প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০, পৃ. ১০

৪৭ T.S. Eliot, 'The Possibbility of Poetic Drama', 'Selected Essays' , 2000, Doba Publications, 4497/14, Guru Nank Market, Nai Sarak, Delhi – 110006, Page 49

৪৮ T.S. Eliot 'Three voices of poetry' 'selected essays's, 2000, Doaba Publications, 4497/14, Guru Nanak Market, Nai Sarak, Delhi-110006, Page. 94

৪৯ Ibid, Page. 81

৫০ রাম বসু, 'কাব্যনাটক' 'নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নভেম্বর ১৯৯৪, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩১৩

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৫৩ The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an 'objective corrective' in other words, a set of objects, a situation chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the enternal facts, whcih must terminate in sensory experience, are given the emotion is immediately evoked. ... The artistic 'inevitablity' lies in this complete adequacy of the external to the emotion; and this is precisely what is deficient in *Hamlet*. Hamlet (the man) is dominated by an emotion which is inexpressible, because it is in excess of the facts as they appear. And the supposed identity of Hamlet with his author is genuine to this point: that Hamlet's bafflement at the absence of objective equivalent to this feelings is a prologation of the bafflement of his creator in the face of his armistice problem T.S. Eliot 'Hamlet and his problems' 'Selected Essays', 2000, Doaba Publications, 4497/14, Guru Nanak Market, Nai Sarak, Delhi-110006, Page. 59-60

৫৪ 'It is the 'Monalisa' of literature' Ibit Page. 59

৫৫ 'The Three voices of poetry' Ibid, Page. 84

৫৬ 'In a vrse play you will probably have to find words for several characters differing widely from each other in background Temperament, education and intelligence, Ibid.

৫৭ অশ্রুকুমার সিকদার 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা' 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত), ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬, বিধাণ সরনী কলকাতা, ৬ অক্টোবর, ১৯৮৩, পৃ. ২৮৪

৫৮ T.S. Eliot 'Poetry and drama' in on Poetry and poets 19957, Faver and Faver, London, Page. 73

৫৯ Ibid, Page. 79

৬০ Ibid, Page. 76

৬১ 'It will be poetry and when the dramatic situation has reached such a point of intensity beacuse the emotions can expressed at all' Ibid. 79

৬২ অশ্রুকুমার সিকদার 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা' 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত), ভারত বুক এজেন্সী, ২০৬, বিধাণ সরণী কলকাতা, ৬ অক্টোবর, ১৯৮৩, পৃ. ২৮৯

৬৩ T.S. Eliot 'Poetry and drama' in on Poetry and poets 1957, Faver and Faver, London, Page. 80-81

৬৪ Ibid. Page. 80

৬৫ উদ্ধৃত, ড. কণিকা সাহা, 'আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য : উদ্ভব ও বিকাশ', জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট, কলকাতা-৬, পৃ. ৯

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব বসুর মিথ-ভাবনার স্বরূপ :

কবিতা, অনুবাদ ও প্রবন্ধ

বুদ্ধদেব বসুর অশৈশব আগ্রহের বিষয় মিথ। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *ছোট্ট রামায়ণের* হাত ধরে শৈশবে তাঁর শিল্পবোধের জাগরণ – এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। আশ্চর্য যে, সেই সময় থেকেই বুদ্ধদেব মিথকে দেখেছেন সাত্ত্বিকতার উর্ধ্বে কবিত্বের এক অসাধারণ উন্মীলনরূপে, আস্বাদনের আনন্দরূপে –

> ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে বইতে আমি জেনেছিলুম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর *ছোট্ট রামায়ণ*, ছোট্ট সচিত্র, বিচিত্র-মধুর, সে বই ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী।[১]

বইখানি কবির শিশুহৃদয়ের বুভুক্ষাকে পরিতৃপ্ত করেও প্লাবিত হতো। আর সেই মুগ্ধ বালক সম্মোহিতের মতো ছুটে চলতো বাল্মীকির আঁকা নিরুদ্দেশের পথে – 'কী ভালো আমার লাগতো সে-সব নদী, বন, পাহাড় –পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকুট – ছবির মতো এক-একটি নাম – ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো।[২] বিস্ময়ের ব্যাপার যে, শিশু বুদ্ধদেবের মধ্যে প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায় কল্পনাবোধ সৌন্দর্যচেতনা, শিল্পিতা – এককথায় স্বভাব-কবিত্ব, নইলে সীতাহরণ, রাম-রাবনের যুদ্ধের ঘটনা-বিক্ষুব্ধতা, বীরত্ব, শৌর্য কিছুই আকর্ষণ করে না, বরং বালক-বুদ্ধদেবকে বিহ্বল করে বনবাসের বৈচিত্র্য। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণে – 'সীতাকে না-হলেও তখন আমার চলতো এমনকি, রাবণকে না-হলেও – কেননা, রাম-লক্ষণের বনবাসের অমন অপরূপ ফূর্তিটা মাটি হলো তা সীতা-রাবণের জন্যই।'[৩] রামায়ণের আধার শুধু নয়, উপেন্দ্রকিশোরের সে ভাষা, ছন্দ, ধ্বনিতে আত্মহারা আনন্দের আস্বাদ লাভ করতেন বুদ্ধদেব –'*চঞ্চল*'র যুক্ত বর্ণ নিয়ে আমার রসনা সুখাদ্যের মতো খেলা করতো, তার অনুপ্রাসের অনুরণনে বুক কাঁপতো আমার। যোগীন্দ্র সরকার পদ্য পড়িয়েছিলেন অনেক, কিন্তু কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়'।[৪]

শুধু কবিত্বই নয়, প্রাচীন কবির কাব্য সেই নবীন বালকের সদ্যস্ফূরিত চৈতন্যে জন্ম দিয়েছিল নাট্যবোধের প্রথম প্রেরণা – 'কিন্তু শুধু পদাবলি আউড়েই আমার তৃপ্তি নেই, রামলীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীর-ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্ফ: আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ওই যে, মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে – ঐ হলো তড়কা রাক্ষসী'।[৫] শৈশবের স্বপ্নমুগ্ধ চেতনায় মিথ, কবিতা ও নাটকের এই সহাবস্থানই হয়তো অনেক পরে বুদ্ধদেব বসুকে পৌঁছে দেয় তাঁর মোক্ষে – বুদ্ধদেব বসুর মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটকগুলি তারই চূড়ান্ত প্রতিফল হিসেবে কল্পনা করা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর মিথ-তৃষ্ণার মূলে সর্বদাই সক্রিয় থাকে হৃদয়গ্রাহিতা, চিত্রময়তা ও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা 'কল্পনা-মণির' অনুসন্ধান। একারণেই কৃত্তিবাসের কাব্যের অসামান্য লোকপ্রিয়তা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর নিকট তা উৎকৃষ্ট নয় এবং রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত *রামায়ণ* সারানুবাদ হওয়া সত্ত্বেও প্রশংসিত। কারণ, বুদ্ধদেব বসুকে অভিভূত করে রাজশেখর বসু অঙ্কিত বাল্মীকির *কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে* বর্ষা ও শরৎঋতুর মধুর বর্ণনা – সীতা-উদ্ধারের পূর্বে রামের সৌম্য, প্রশান্ত দৃষ্টিতে প্রকৃতি সম্ভোগের আনন্দটুকু – 'রাজশেখর বসুকে ধন্যবাদ, *কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে* বর্ষা ও শরৎঋতুর মধুর বর্ণনাটুকু বাল্মীকির মুখেই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন – এ-বর্ণনা কৃত্তিবাস বেমালুম বাদ দিয়েছেন বলে তাঁকে প্রশংসা করা যায় না, কেননা কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্রণ – তিন দিক থেকেই এ ঋতুবিলাস সুসংগত ও সুন্দর। ঘনজটিল বনের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ যেন একটি স্বচ্ছ নীল হ্রদের ধারে এলুম, সেখানে নৌকো আমাদের তুলে নিয়ে জলের গান শোনাতে লাগলো; ওপারে জটিলতর পথ, কুটিলতম কাঁটা-কিন্তু এই অবসরটুকু এমন মনোহর তো সেই জন্যই'।[৬] তবে, মিথ-নির্মাণের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু সর্বদাই প্রাচীন কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল,

Dhaka University Institutional Repository

মূলানুগত্যে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন – 'ভুল করবো, মারাত্মক ভুল, যদি মনে করি কৃত্তিবাসের রম্যকাননে আদিকবির, মহাকাব্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের ফল কুড়োনো সম্ভব'। কারণ, আদিকবির ওজস্বিতা, নিরাসক্তি, বাস্তববোধ, সত্যনিষ্ঠা 'আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়ালিজমের চেয়েও নির্মম, নির্ভীক' বলে তিনি মনে করেন। আধুনিক সাহিত্যের মতোই তাতে সঙ্গতি রক্ষার দায় নেই, ঘটনার বিস্তৃতি সেখানে আপেক্ষিক, তুচ্ছ ও প্রধানের অবস্থান পাশাপাশি, ভালো ও মন্দ চূড়ান্ত স্বভাবে বিরাজমান – এবং তা অনায়াসে ধারণ করে 'চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন।'[৭] ফলে, যে কোনো অনুবাদ বা পুনর্নির্মাণ অপেক্ষা প্রাচীন কাব্য সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ, শক্তিসম্পন্ন। কবির ভাষায় – 'যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ; মহাকাব্যে ট্রাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই; তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোট ঘটনায় ভেদ নেই – সমস্তই সমান, আগাগোড়াই সমতল – এবং সমস্তই ঈষৎ ক্লান্তিকর।'[৮] প্রাচীন মহাকাব্যের এই ধীর, গম্ভীর চলন, মহৎ ব্যপ্তি, নির্বিকার অভিব্যক্তি ও সত্যনিষ্ঠাই বুদ্ধদেব বসুর আস্থা অর্জন করে। ভারসাম্য, আভিজাত্য, সুশৃঙ্খলা, শিল্পসামঞ্জস্য এবং একইসাথে অন্তর্ময়তা ও কবিত্ব-কল্পনা রক্ষিত বলেই কালিদাসের *মেঘদূতম* বুদ্ধদেব বসুর সাগ্রহ সাধনার বিষয়। প্রবহমান মেঘকে দূত করে প্রিয়ার নিকট যক্ষের বার্তাপ্রেরণ এখানে নিমিত্তমাত্র। এই আবেগের অনুষঙ্গে উজ্জয়িনীপুরে অপেক্ষমান এক বিরহী নারীকে লক্ষ করে মর্ত্যলোক ও অমরার অপার্থিব, দৃষ্টিনন্দন, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনই কবির কাছে মুখ্য। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় –

> প্রথমে মনে হতে পারে *মেঘদূতে* যক্ষের বিরহ একটি অছিলামাত্র: কবির আসল উদ্দেশ্যে তাঁর প্রিয় কয়েকটি ভূদৃশ্যের বর্ণনা আর তারপর তার ভূস্বর্গের চিত্ররচনা। পূর্বমেঘে যে-সব নদী, নগর ও পর্বত আমরা পর-পর দেখে যাচ্ছি তারা সকলেই সুন্দর, তবু তারাও সুন্দরতমের ভূমিকাস্বরূপ কাজ করছে; এই পার্থিব সৌন্দর্যের শেষ প্রান্তে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে অলকা, এলদোরদো, সব-পেয়েছির দেশ, এবং এক তিলোত্তমা নারী, কবির মানস-প্রতিমা, যাকে উদ্ঘাটন করার জন্য – আমরা দেখামাত্র বুঝতে পারি – কবি এতক্ষণ ধরে আয়োজন করছিলেন। ... আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এক চিত্রশালা অতিক্রম ক'রে যাই আমারা, ভারতীয় চিত্রশালায় যা দেখতে পাই না সেই ভূদৃশ্য পর-পর এগিয়ে আসছে ও স'রে যাচ্ছে – কোনো ক্রমশ-উন্মোচিত চৈনিক পটচিত্রের মতো যেন – তারপর দেখি যক্ষপ্রিয়ার আশি চরণ পূর্ণ প্রতিকৃতি : বর্ণনা শুধু বর্ণনার উপর নির্ভর ক'রে এমন স্মরণীয় কাব্য পৃথিবীতে বোধ হয় আর লেখা হয়নি।৯

মেঘদূতের এই রোম্যান্টিক আবেদন, বাহুল্যবর্জিত মিতাচার, কবিত্ব ও নাটকীয়তার নম্য-বঙ্কুর ভারসাম্য, অত্বর ও সমলয়সম্পন্ন গতি ও ছন্দের উৎকর্ষ স্বভাবতই বুদ্ধদেব বসুর কবিত্ব-সন্ধানী মনকে তৃপ্ত, উদ্বুদ্ধ করে। আর সেজন্যই মাইকেলকে কখনোই স্বীকৃতি দিতে পারেননি তিনি। কারণ, মাইকেল পুরাণকে ব্যবহার করেছেন মাত্র, পুরাণের পুনর্জন্মসাধন কিংবা তাকে মর্মগ্রাহী করে তুলতে সক্ষম হননি। মূলত মিথের ভিতর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে সুরকে অসুর আর অসুরকে সুর হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী মানসিকতা ছিল মধুসূদনের। রাম ও তার বাহিনীর প্রতি ঘৃণা এবং রাবণের প্রতি সহানুভূতির এই চরম, একমুখী ও পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্যই তাঁকে বিচ্যুত করে সংবেদশীলতা ও অন্তরাশ্রয়িতা থেকে। ঘটনা-সংক্ষুব্ধতা, যুদ্ধ-দামামা, জয়-পরাজয় আর বীর্য-কারুণ্য-হাহাকারের হৈ চৈ-এ অলক্ষ্য প্রবাহিত অন্তরাত্মার আহবান উপেক্ষিত থেকে যায় তাঁর মহাকাব্যে। ফলে, এতো অসংখ্য মিথ ও তার দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহ, অগণিত চরিত্র সমাবেশ সত্ত্বেও মাইকেল আমাদের হৃদয়ের উপরিতল মাত্র স্পর্শ করেন। মাইকেলের রচনায় চরিত্রগুলো মানস-গঠন ভাস্কর্যের মতো কাঠাামোবদ্ধ – দ্বিধা, দুর্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মজিজ্ঞাসায় তারা কেউ স্বকালের মুখপাত্র হয়ে ওঠে না। চরিত্রগুলো স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয় না। ফলে, মধুসূদনের মহাকাব্যের এই আড়ম্বর, কৃত্রিমতা, সংযমবর্জিত চিৎকারধর্মিতা, কারুণ্যের আতিশয্য বুদ্ধদেব বসুর নিকট স্বভাবতই অন্তঃসারশূন্য বলে বিবেচিত হয়। তাঁর মূল্যায়নে –

Dhaka University Institutional Repository

> মেঘনাদবধ কাব্য হ'য়ে ওঠা পদার্থ নয়, একটা বানিয়ে তোলা জিনিশ। আয়োজনের, আড়ম্বরের অভাব নেই, সাজসজ্জার ঘটাও খুব, কিন্তু সমস্ত জিনিসটা আগাগোড়াই মৃত, কোথাও আমাদের প্রাণে নাড়া দেয় না, হৃদয়ে আন্দোলন তোলে না। পুরোপুরি নয় না হোক অন্তত পাঁচটা-ছ'টা রস মেপে-মেপে পরিবেশন করেছেন কবি, কিন্তু তাঁর বীর রসে উদ্দীপনা নেই, আদিরসে নেই হৃৎস্পন্দন; তাঁর করুণ রসে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, এবং বীভৎস্য রস শুধুই বীভৎসতা। মহাকাব্যের কানুন সবই মেনেছেন তিনি, বড্ড বেশি মেনেছেন; কখনো মিল্টন, কখনো বা ভার্জিলকে স্মরণ ক'রে নিয়মরক্ষার জন্য তাঁর আবিরাম ব্যস্ততা। ফলে সমগ্র কাব্যটি হয়েছে যেন ছাঁচে-ঢালা, কলে-তৈরি নির্দোষ নিস্প্রাণ সামগ্রী;[১০]

কালিদাসের মেঘদূতের সংযম যার কাছে প্রশংসিত, মধুসূদনের কাব্যের কৃত্রিম আবেগ ও বাহ্যাড়ম্বর তাঁর নিকট নিন্দিত হবেই। কারণ, 'কবিতা ও কবিতার মতো মিথলজি'ই বুদ্ধদেব বসুর মিথিক আদর্শ।[১১] একারণেই পুরাণের পুনর্জন্মের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথই হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রাণনা। তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের বীজ নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথের কাহিনী (১৯০০) কাব্যের অন্তর্গত 'পতিতা' কবিতায়। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা*, *কর্ণকুন্তীসংবাদ* কিংবা *গান্ধারীর আবেদন* বুদ্ধদেব বসুর মিথ-সন্ধিৎসু কবি-চেতনার দীক্ষাস্থল। পুরাণের কাহিনীকে বর্তমান জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে পুনর্জীবিত করে তোলা, পৌরাণিক চরিত্রগুলোর মধ্যে নতুন মনোলোক সৃষ্টি করে তাদের স্বকালের মুখপাত্র করে তোলা এবং তাতে একটি শাশ্বত মহিমা দানের শিল্পিতায় বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই সার্থক পথস্রষ্টা এবং পুরাণের বিনির্মাণে বুদ্ধদেব বসুর অগ্রজ ও অনুসরণীয় পথিকৃৎ। বুদ্ধদেব বসুর বিবৃতিতে, মাইকেল নয়, মিথ-নির্ভর সাহিত্য নির্মাণে রবীন্দ্রনাথই নতুন যুগের মহাকবির গৌরবে অভিষিক্ত –

> রবীন্দ্রনাথের এ-সব কাব্য থেকে মহৎ শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয় যে, চিরন্তনতা স্থাণুতার নামান্তর নয়, সাহিত্যে তাকেই চিরন্তন বলে যার মধ্যে অব্যক্ত ইঙ্গিতের পরিমণ্ডল সমস্ত ভবিষ্যতকে আপন গর্ভে ধারণ করে, যুগে যুগে অজাতের জন্মে, অব্যক্তের ব্যঞ্জনায় যার অপূর্ব রূপান্তর কখনোই শেষ হয় না। এই রূপান্তরের যাঁরা যন্ত্রী বা যন্ত্র, তাঁরাই মহাকবি, এবং সাহিত্যে কালিদাসের পরে এ-আখ্যা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। পুরাণের চিরন্তন চরিত্রগুলোকে রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে স্বকালের মুখপাত্র ক'রে তুলেছেন যে তারা মহাভারতের অপভ্রংশ আর নেই, তাঁদেরও স্বাধীন সত্তা হয়েছে, তারা স্বতন্ত্ররূপেই জীবন্ত ও গ্রহণযোগ্য।[১২]

পুরাণ ও পুরাণবলম্বী এইসব সাহিত্যের পর্যবেক্ষণ, রুচিবোধ এবং পরিশীলন থেকে মিথের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর উপলব্ধির যে সংশ্লেষণ পাওয়া যায়, তা হলো – পুরাণের নবজন্ম এমন এক আধুনিক কবিকৃত্য, যেখানে আদিকবির রচনার নৈষ্ঠিক অনুসরণ সত্ত্বেও চিরকালীনতার সাথে সমকালীনতার সংযোগে সর্বকালীন এক অখণ্ড মানবচেতনার রূপায়ণ সাধিত হয় এবং এই নতুন নির্মাণে পুরাণের চরিত্রগুলোও সমকালীন বাস্তবতার অংশভাগী হয় – তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব, জিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধি। কালের বন্ধন ছিন্ন করে পুরাকাল বর্তমান কাল ও ভাবীকালকে একই সাথে ধারণ করে বলে পুণঃপুনর্জাত হয়েও এইসব সৃষ্টি অর্জন করে চিরত্ব। পুরাণ ও পুনর্নির্মিত এইসব সাহিত্যের আস্বাদনসূত্রে অর্জিত বুদ্ধদেব বসুর উপলব্ধি তাঁর কবিতা, অনুবাদ ও মিথ-বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ঘনীভূত হয়ে ক্রমশ দার্শনিক অভিজ্ঞানে পরিণত হয়, একইসাথে বহুমুখী প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করে শিল্পিত আত্মবিশ্বাস।

প্রথমপর্বে বুদ্ধদেব বসু বিচ্ছিন্নভাবে কবিতার মধ্য দিয়ে মিথের বিচিত্র প্রয়োগ ঘটান। তারপর ১৯৬৩ সালে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক ইন্দো-ইউরোপীয় এপিক' সম্পর্কে অধ্যাপনা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন অনেক তথ্য, সংকেত, প্রতিসাম্য – সে সবের সাথে সংযোগ ঘটে শিল্পী-চেতনায় এতদিনকার সংগৃহীত উপাদানগুলোর। আর এই দু'য়ের সুসংবদ্ধ ও সৃষ্টিশীল প্রকাশ ঘটে বুদ্ধদেব বসুর *মহাভারতের কথা* (১৯৭৪) গ্রন্থে।

Dhaka University Institutional Repository

এরই ধারাবাহিকতায় অবশেষে বুদ্ধদেব বসু বোধের সামীপ্য অর্জন করেন কাব্যনাটক ও নাটক রচনার মধ্য দিয়ে, যেখানে পরিণত বয়সে উপনীত বুদ্ধদেব বসুর জীবনের অভিজ্ঞতা, দর্শন, অনুসন্ধান ও শিল্পচেতনার শীলিভূত রূপ মূর্ত হয়। এতদিন ধরে পুরাণ-চর্চার মধ্য দিয়ে যেসব ভাবনা কখনো কবিতায় বীজ রূপে, ভ্রূণরূপে দেখা দিয়েছে, কখনো হঠাৎ বিদ্যুতাভাসের মতো চকিতে হৃদয়কে আলোড়িত করেছে অথচ স্পষ্ট একটি অবয়বের অভাব সম্পূর্ণতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছিল, অথবা জীবনাভিজ্ঞতার সাথে সংযোগের জন্য যথার্থ বহিরাশ্রয় সন্ধানে ব্যাকুল ছিল কিংবা জীবনদর্শনের কোনো একটি পূর্ণ বিন্দুতে উপনীত হওয়ার সাধনায় ব্যগ্র ছিল, সেইসব ভাবনা, চেতনা, চিন্তন ও সিদ্ধির শিখরবিন্দুতে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলোর অবস্থান। তাই কাব্যনাটকে প্রতিফলিত বুদ্ধদেব বসুর জীবনবোধ ও মিথ-ভাবনার সম্বন্ধসূত্র ও পরিণতি-পরম্পরা মূলত তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও অনুবাদের মধ্যেই আবিষ্কার করা সম্ভব।

প্রথম পরিণত কাব্য *বন্দীর বন্দনা* (১৯৩০) থেকে শুরু করে শেষকাব্য *স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৭১) পর্যন্ত পূর্বাপর মিথ-চেতন কবি বুদ্ধদেব বসু। প্রথমদিকে বিচ্ছিন্ন অনুষঙ্গে বিভিন্ন কবিতায় মিথ কিংবা মিথচূর্ণ অথবা মিথাভাস ব্যক্ত হয়েছে। এরপর *দময়ন্তী* (১৯৪৩) কাব্যপর্ব থেকে সুস্পষ্টরূপে কখনো রূপকে অথবা প্রতিরূপকে ক্রমশ কবির কবিতা মিথাশ্রয়ী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যায়ে *শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর* (১৯৫৫) কাব্য থেকে কবিতা, মিথ ও কবির লব্ধদর্শন সুসন্নিহিত মাত্রা লাভ করে। এইভাবে, বলা যায় কবিতা লিখতে লিখতেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর মিথ-চেতনার প্রান্তে উপনীত হন – যেখানে জীবনদর্শনের সাথে মিথ-ভাবনার পরিণয়ে তা 'সাগর-সঙ্গমের চরিতার্থতা লাভ করে'।[১৩]

বন্দীর বন্দনায় প্রকৃতি ও প্রেমের অনুষঙ্গে মিথচূর্ণ বা মিথাভাস লক্ষ করা যায়। এ কাব্যে যৌবন-অভিশপ্ত কবি পুরাণের শাপভ্রষ্ট দেবের মতো কল্পনা করেন নিজেকে – যে নব্যনয়নে নিঃশেষে পান করতে চায় প্রকৃতিকে – পঙ্কিল কদর্যের, নিরুদ্ধ কামনার শূন্য-শুষ্ক অন্তর মুক্তি পেতে চায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে –

শাপভ্রষ্ট দেব আমি
আমার নয়ন তাই, বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়িতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লবমর্মর
প্রেমগুঞ্জনের মতো কী অমৃত ঢালে মর্মমাঝে।[১৪]

যুগে যুগে ক্ষাত্র-রাজাদের দুর্নিবার রাজত্ব-পিপাসা ও তাদের রিরংসার যূপে উৎসর্গীকৃত সীতা-সাবিত্রী-শকুন্তলার পরিণতি প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু ব্যবহার করেন পুরাণের অনুষঙ্গ –

শতদার নারীমাংসলোভী,
কামুক রাজন্যকূল ছুঁয়ে ছেনে রেড়াতেন ফিরি,
বিশ্বের সুতনুরাশি। কুমারীত্ব করিতে মোচন
পটুতার নাহি ছিল সীমা। নারীমেধ-যজ্ঞ-মাঝে
ইন্ধন হয়েছে শত শকুন্তলা।

… … …

শয্যাকক্ষে একনিষ্ঠতায়
সীতার সতীত্ব শিক্ষা; সন্তানের বহুবচনতা
সাবিত্রীর সুপবিত্র প্রেমের লক্ষণ [১৫]

Dhaka University Institutional Repository

বন্দীর বন্দনায় কবি বারংবার এই কথাই ব্যক্ত করেন যে, এইসব লোভ, রিরংসা আর প্রতাপ নশ্বর ইতিহাসমাত্র, নিষ্ঠুর কালস্রোতে কেবল বেঁচে থাকে কবি ও কবিতা –

তবু জানি, যতদিন
বাসুকির ফণা নাহি ভেঙে পড়ে, পাপের প্রহারে,
আমরা রহিবো ততদিন। না, না – নহে কবিযশ,
মহান কাব্যের বুকে নহে সে নামের অমরতা [১৬]

কবির গভীর প্রত্যয় এই যে, কালের আবর্তে হারিয়ে যায় রাজ্যপাট-ইতিহাস, হারায় সৌন্দর্য এবং 'পুঞ্জীভূত কুৎসিত জঞ্জাল, কেবল হারায় না কবিরা। কারণ তাঁরা 'বিধাতার নির্বাচিত', তাঁরা 'মহাকালের নিত্যসঙ্গী' – 'মোরা সেই জীবনের কবি/ আমাদের চিরসঙ্গী নৃত্যক্ষিপ্ত রিক্ত মহাকাল (মোরা তার গান রচি)। *বন্দীর বন্দনাতে* তে এই যে, কবির কালভাবনা উপ্ত হয়, তাই পরবর্তীকালে *কালসন্ধ্যা, সংক্রান্তি* প্রভৃতি কাব্যনাটকে সুস্পষ্ট দর্শনে উন্নীত হয়।

বন্দীর বন্দনা কাব্যে 'মৈত্রেয়ী, 'অমিতা' কিংবা 'কঙ্কাবতী' – সব নারী সম্পর্কেই কবি মোহমুক্ত। কারণ, মান-অভিমান, স্মৃতি-কল্পনা সবাই কবির কাছে প্রবঞ্চণা – একমাত্র সত্য কামনা। তাই, কঙ্কাবতীর 'নতুন ননীর মতো তুন'র অন্তরালে কবি প্রত্যক্ষ করেন 'কুৎসিত কঙ্কাল'– তার স্বকীয়তাহীন ধার করা প্রেমের ঋণকে উপহাস করেন দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ির রূপকে –

মোরে প্রেম দিতে চাও? প্রেমে মোর ভুলাইবে মন!
তুমি নারী, কঙ্কাবতী; প্রেম কোথা পাবে?
আমারে কোরো না দান, তোমার নিজের যাহা নয়।
ধার-করা বিত্তে মোর লোভ নাই; সে ঋণের বোঝা
বাড়িয়া চলিবে প্রতিদিন –
যতক্ষন সেই ভার সর্বনাশ না করে তোমার।
সে ঋণ – করিতে শোধ দ্রৌপদীর সবগুলি শাড়ি
খুলিয়া ফেলিতে হবে।
সভামধ্যে মোর দৃষ্টি – পরে
নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ
তোমাকে দাঁড়াতে হবে, রহিবে না আর
রহস্যের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল [১৭]

বন্দীর বন্দনায় দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ির মিথ ব্যবহৃত হয় নারীর সৌন্দর্য ও রহস্যের উন্মোচনের ক্ষেত্রে। পরবর্তীকালে *দ্রৌপদীর শাড়ি* কাব্যে এই মিথই ব্যবহৃত হয় সভ্যতার হাতে দ্বারা বিপন্ন প্রকৃতির অন্তহীন রহস্যের প্রতিরূপকে 'কাম-চেতনা' বুদ্ধদেব বসুর, জীবন ভাবনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু *বন্দীর বন্দনায়* মিথের অন্তরালে কবি যে শরীরী প্রেম কিংবা তনুসর্বস্বতার ঘোষণা দেন – তা কি সত্যিই কবির আরাধ্য? 'সুনীল গগণ হতে ঝরে পড়া সুনীল জোৎস্নায়' যাঁর অবরুদ্ধ অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়, পরবর্তীকালে যিনি অনাম্নী অঙ্গনা ও তরঙ্গিণীর মতো চরিত্রের স্রষ্টা, এমন নির্জলা কামনা কি সত্যিই তাঁর কাঙ্ক্ষিত দর্শন? নাকি এ পর্যায়ে রবীন্দ্রবৃত্ত থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র সত্তা অর্জনের লক্ষ্যে তা আরোপিত এক অদম্য প্রয়াস মাত্র? প্রকৃত পক্ষে 'বন্দীর বন্দনায়' প্রেম-চেতনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মূলত এ কাব্যে কামনা সম্পর্কে দ্বিধাহীন উচ্চারণের তলে তলে স্ববিরোধ ও সংশয়ের যন্ত্রণা প্রচ্ছন্ন ছিল। কামনাকে তখনো দর্শনে পরিণত করতে না

Dhaka University Institutional Repository

পারায় এ পর্যায়ে কবির এই আত্মিক বন্দী-দশা। পরিবর্তিত কাম-চেতনায় উপনীত বুদ্ধদেব বসুর স্বীকারোক্তিতে – 'সৌন্দর্য উপলব্ধিতে নিজের ভিতর যত মানসিক প্রলোভন ও দুর্বলতা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নসম্ভার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা – এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রনা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত। এই অভিস্পাতের অংশটা অবশ্য আমাকেই মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, কেননা আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম তার মূলে এই কথাটি ছিল'।[১৮] – এ আত্মবিরোধ কবির পক্ষে যদি সচেতন প্রয়াসও হয়, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, তা কবি-মানসে স্থায়িত্ব পায়নি। অনতিকাল পরেই তাঁর কামভাবনার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় – যেখানে কবি অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত-উচ্ছ্বাস। এর দু'টি কারণ। প্রথম কারণ, কবির বস্তুজগৎ ও জীবনের সাথে সংশ্লিষ্টতা – প্রথম যৌবনের আবেশ কাটিয়ে ব্যক্তি জীবনের সচেতন উপলব্ধিতে অনুপ্রবেশ এবং দ্বিতীয়ত, শিল্পের ক্ষেত্রে মিথাশ্রয়িতা, যা এক অদৃশ্য অভিভাবকের মতো কবিকে সুনিয়ন্ত্রিত আবেগে চালিত হতে নির্দেশনা দেয়। বস্তুত কবির মিথ-চেতনাই ছিলো তাঁর কাম-ভাবনার শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এক কার্যকরী অনুঘটক। এক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্যটি শিরোধার্য – 'বলা যেতে পারে ইতিহাস-চেতনা যেমন জীবনানন্দের কবি-জীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তির কাজ করেছে, বুদ্ধবেদের অস্থির কবিচেতনার শৃঙ্খলাবিধায়ক বলয়রূপে কাজ করেছে তাঁর মিথিক জীবন-প্রত্যয় বা মিথ-পুরাণের কাহিনীর অঙ্গীকার।'[১৯] এই ধারাবাহিকতায় কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, অনুবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কাম-ভাবনাকে কেন্দ্র করে মানব-মানবীর সম্পর্ক-জটিলতার বিচিত্র ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করে, সাহিত্যিক-জীবনের অজস্র ঘাত-প্রতিঘাত, অভিযোগ-কৈফিয়তের অবসানে পরিশেষে কাব্যনাটকে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে কামের মধ্য দিয়ে পুণ্যের পথে উত্তরণের যে মহৎ দর্শন বুদ্ধদেব বসুর চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সূত্রপাত 'বন্দীর বন্দনাতে'ই।

ছোটগল্প *রজনী হলো উতলা* (১৯২৬) কিংবা *রাত ভ'রে বৃষ্টি* (১৯৬৭) উপন্যাসের জন্য বুদ্ধদেব বসু বিতর্কিত ও অভিযুক্ত হলেও, তাঁর কাম-ভাবনার মৌল বিবর্তনটি সাধিত হয়েছে কবিতার মধ্য দিয়ে। *বন্দীর বন্দনায়* যৌবনের আতিশয্যে চিত্রিত কবির কাম-ভাবনার ভারসাম্য লক্ষ করা যায় পরবর্তী কাব্যগুলো – *কঙ্কাবতী* (১৯৩৭), *দময়ন্তী* (১৯৪৩) ও *দ্রৌপদীর শাড়ি* (১৯৪৮)তে। *বন্দীর বন্দনার* পরের কাব্য *কঙ্কাবতীতেই* আমরা পাই কবির রোম্যান্টিক চেতনায় মূর্ত নারী-প্রতীক কঙ্কাবতীকে – প্রকৃতির সাথে অচ্ছেদ্য এক কল্পনা-প্রতিমা রূপে –

আকাশে ও চাঁদে, জলে আর মেঘে, দিগন্তপারে গাছের ছায়ায়,
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মেঘের শরীরে, জলের স্রোতে –
চুপে চুপে বলা চাঁদের মুখের কথা
চাঁদের মুখের কথা জেগে ওঠে: কঙ্কাবতী!
আমার মনের কথা বেজে ওঠে: কঙ্কাবতী!
তোমার নামের শব্দ স্বনিছে, কঙ্কাবতী!
কঙ্কাবতী গো![২০]

এবার কঙ্কালের সাথে কামনীয়তা, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে কবিতা ও নারীর অদ্বয় সাধানারূপে নতুন নারী সৃষ্টি হয় *কঙ্কাবতী*তে। কারণ, ততদিনে কবি মনে মনে নারীকে মৃণাল করে কবিতার 'ভালোবাসার শ্বেত শিখার পদ্ম'কে ফুটিয়ে তুলতে চান।

দময়ন্তী কাব্যগ্রন্থ থেকে জীবনাভিজ্ঞতার সাথে কবির মিথ-ভাবনার সংযোগ শুরু হয়, যার ফলে এ পর্যায়ে মিথের নির্মাণে কবি পরিণত, পরিমিত ও বাস্তববোধসম্পন্ন। প্রথম থেকেই মিথে আগ্রহী থাকলেও মূলত বুদ্ধদেব বসুর মিথের পুনর্নির্মাণ তাঁর পরিণত বয়সের চেতনা দ্বারাই স্ফূর্তিলাভ করে। একইভাবে বলা যায়, মিথও বুদ্ধদেব বসুর জীবনাভিজ্ঞতাকে পরিণতি দানে ভূমিকা রাখে। *দময়ন্তী* পর্বে বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-ভাবনার এই রূপান্তরটি সমালোচক

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় দেব প্রত্যক্ষ করেন এভাবে – 'একদা যৌবনের শিহরিত উষ্ণতায় ছিল সম্ভোগের আমন্ত্রণ। পরিণত বয়সেও প্রবাহিত বিষাদের নিঃশ্বাস। স্মৃতি এখন সত্তাকে বিচলিত করে। কারণ অনুভবের কৌটোয় গচ্ছিত জীবনের সঞ্চয়। মহাকালকবিকে সচকিত করে। দৃষ্টির স্বচ্ছতায় আলোকিত নিজের বার্ধক্য। চোখের তারায় প্রতিবিম্ব আলো–আঁধারের রূপান্তর। ধ্বংসের কোনও ইঙ্গিত নেই বরং বাঁকে বাঁকে রয়েছে সৃষ্টির উদ্যোগ। ... নির্ধারিত সত্যকে মেনে নিয়ে তিনি কালের প্রবাহের অন্তর্গত রূপান্তরকে অনুভব করেন।'[২১] 'দময়ন্তী' কবিতায় কবি *মহাভারতের* দময়ন্তীর প্রতীক প্রয়োগ করেন তাঁর যৌবনবতী আত্মজার মধ্য দিয়ে। দেব ও মরলোক–কাঙ্ক্ষিত নারী দয়মন্তী স্বয়ম্বর সভায় সহস্র নলের ছদ্মবেশ থেকে বেছে নেয়, তার প্রিয়তমকে। আজ জীবন-মধ্যাহ্নে কবি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর কন্যার মাঝে দময়ন্তীর সেই স্বর্গ-মর্ত্যলুব্ধ যৌবন জাদু। হয়তো একালের কোনো হংসদূত এসে তারও কানে জপে গেছে প্রিয়তম নাম। 'দময়ন্তী' কবিতায় তাই বিপন্ন কন্যার প্রতি পিতার আর্শীবাদ বর্ষিত হয় – যেন সে সমস্ত প্রবঞ্চণার মধ্যেও চিনে নিতে পারে তার অভীষ্ট জনকে –

স্বর্গ তোকে চায়, যজ্ঞ তোকে চায়, মৃত্যু তোকে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে জন্তুর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারই সংগোপনে মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে কানে
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম প্রণাম,
দেবগন ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে এই বর দাও।'[২২]

যৌবনবতী কন্যার এই প্রেমের সূত্রে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত কবির স্মৃতিতে জাগ্রত হয় তাঁর জীবনের যৌবনময় সময়ের কথা – এমনি প্রেমের ব্যক্তিগত স্মৃতি-অনুষঙ্গ, যার পুনরাভিনয় তিনি দেখতে পান আত্মজার মধ্যে –

সেদিন আমার
কাল-কলঙ্কিত, তুচ্ছ শরীরে তাকায়ে
এ-কথা বিশ্বাস তোরে কখনো হবে না –
সহস্র বসন্ত ছিল আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়;
কবে এলো হংসদূত, কয়ে গেল প্রিয়তম নাম,
স্বতঃশ্লথ নীবিবন্ধে আনন্দের ঢেউ তুলে –
সেদিন কখনো ভুলে
ওরে স্বয়ংবরা, তোর এ কথা হবে না মনে –
যে- নারীর দেহ এই পৃথিবীতে তোর সিংহদ্বার
এ- প্রণয় তারই উত্তরাধিকার,
এ-বিশ্বজয়, তারই কাহিনীর পুনরাভিনয়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেব বসু কন্যা দময়ন্তীকে তার মাতার প্রণয়ের উত্তরাধিকারী রূপে লক্ষ করেন। কালের বন্ধন ছিন্ন করে পুরাণের দময়ন্তী, আধুনিক দময়ন্তী ও তার মাতার প্রেম একই কাহিনীর পুনরাভিনয়রূপে প্রতিভাত কবির নিকট। কারণ, প্রেম সেই জৈব যাদু, চিরকালীন প্রেরণা, যা কালে কালে রূপান্তরিতভাবে অধিকার করে নরনারীর মন। প্রজন্মান্তর-ব্যবধানেও তার মৃত্যু নেই –

তবু জৈব জাদু ব্যর্থ নয়।
যে প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে সোপনে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।[২৪]

যৌবন কালদষ্ট হয় পরিত্যক্ত, বিবর্ণ পুতুলের মতো– বিনষ্ট হয় 'ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো'র মতো। কিন্তু প্রেম চির নতুন, অক্ষয়, অজর। প্রদীপ রায় গুপ্ত 'দময়ন্তী' কবিতাকে বুদ্ধদেব বসুর যৌনচেতনার প্রতিফলনরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর 'বার্ধক্যের হাহুতাশ' বলেও অভিযুক্ত করেন – 'যৌনসক্ষমতাই কি যৌবনের একমাত্র গর্ব? বার্ধক্যের বিনয়ের একমাত্র কারণ কি দৈহিক অক্ষমতা? কবি যদি এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চান যে যৌনতার লয় নেই, ক্ষয় নেই, শুধু রূপান্তর আছে আয়ুব সর্পিল সোপানে নবজীবনের অঙ্গীকার, তবে কেন হীনম্মন্যতায় করুণ করে তুলেছেন প্রৌঢ়তাকে।[২৫] প্রদীপ রায়গুপ্ত তাঁর সমলোচনায় স্বাধিকারপ্রমত্ত। আমাদের বিবেচনায় বুদ্ধদেব বসু বার্ধক্যের জীর্ণতাকে স্বীকার করে নিয়েই, প্রেমের চিরন্তনতাকে অঙ্গীকার করেন তাঁর এই কবিতায়। কারণ যৌবন শাশ্বত নয়, তার বির্বতন ও পরিণতি নিশ্চিতভাবে জরা ও মৃত্যু। কিন্তু প্রেম সর্বকালীন। হতে পারে, সে প্রেম জৈব প্রেম এবং তাতে থাকতে পারে নবজীবনের অঙ্গীকার, কিন্তু যুগে যুগে সে প্রেমের স্বরূপ অভিন্ন – একই কাহিনীর 'পুনরাভিনয়'। *দময়ন্তী* কাব্য ছাড়াও দয়ময়ন্তীর মিথের আরও বিচিত্র প্রয়োগ ঘটান বুদ্ধদেব বসু *স্বাগত বিদায়* কাব্যে 'দময়ন্তী ও নল', 'বাহুকের স্বগতোক্তি' প্রভৃতি কবিতায়।

'দময়ন্তী' কবিতায় প্রেম যেমন অফুরন্ত, 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কবিতায় প্রকৃতি তেমনি অনিঃশেষ। *দ্রৌপদী শাড়ি* কাব্যের নাম-কবিতায় কবি প্রকৃতিকে দ্রৌপদীর অফুরন্ত শাড়ির সাথে প্রতীকান্বিত করেন, যেখানে দুঃশাসনরূপী যান্ত্রিকতা যতই দুঃশীল ও দুর্মদ, অবিনীত ও অপ্রতিহত হোক না কেন প্রকৃতির রহস্য-উন্মোচন করতে করতে সে ক্লান্ত হবেই – তবু নিঃসীম নিসর্গ নগ্ন হবে না কোনোদিন – কারণ, দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই তার রহস্য অন্তহীন –

প্রতিশ্রুত হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃৎপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি।
আকাশ ভ'রে উঠলো সোর,
মেঘের ঘোর, জলের তোড়;
মন্ত্র-পড়া অন্তরালে
দিলো না তবু সাড়া।
অসম্ভব দ্রৌপদীর
অন্তহীন শাড়ি।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

শীতের প্রার্থনা:বসন্তের উত্তর (১৯৫৫) কাব্যে বুদ্ধদেব বসু সবচেয়ে বেশি মিথ-সংলগ্ন এবং তাঁর মিথ-ভাবনার একটি পরিণত রূপ এখানে লক্ষ করা যায়। মূলত জীবনাভিজ্ঞতার প্রান্তে এসে বুদ্ধদেব বসু একধরনের আত্মবিশ্লেষণী মন নিয়ে তাঁর বিগত জীবনাভিজ্ঞতা ও সৃষ্টিকর্মের সংশ্লেষণ অনুসন্ধান করেন। ফলে, এ পর্যায়ে এসে এইসব উপলব্ধি তাঁর দর্শনের নিকটতর হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, তার পরিণতিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবনের যে মিথিক দর্শনকে *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯) ও *সংক্রান্তি* (১৯৭৩) নাটকে চিত্রিত করেন, তার বীজ নিহিত ছিল *শীতের প্রার্থনা:বসন্তের উত্তর* কাব্যে। বুদ্ধদেব বসুর কাল-চেতনার বিস্তার ঘটে এই কাব্যে। এ পর্যায়ে কবি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, কিন্তু যৌবন তাঁর কাছে সদাবাঞ্ছিত। আর তাই সৃষ্টি প্রবাহ, প্রবংশ-পরম্পরা তাঁর নিকট গুরুত্বপূর্ণ –

> সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিতা,
> তরুণী নাৎনির তাপে মাতামহী হাত সেঁকে নেন;
> পরস্পর-বিদ্বেষী বুড়োরা
> পরস্পরের মুখে আঁকা
> নিজের জরার ভয়ে হাত পাতে যৌবনের দম্ভের কাছেও –
> আর তাই বুড়োরা এমন একা, আর তাই বার্ধক্য এমন
> নিষ্ঠুর, ভীষণ।[২৭]

শীত আসে – প্রকৃতি মরে যায় আবার বসন্তে মাটির বুকে লুপ্ত বীজ ফলে ওঠে নতুন সম্ভাবনায়। একইভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন প্রবংশের উত্থান, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির প্রবহমানতা লক্ষ করেন কবি –

> কিন্তু মাটির বুক চিরে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে একদিন,
> আবার দেখা দেয় অন্য নামে, নতুন জন্মে, রাশি রাশি ফসলের ঐশ্বর্যে;[২৮]

মানব-জীবনেও সমভাবে বাধর্ক্য ও মৃত্যুর পর নবজন্মের মধ্য দিয়ে প্রজন্মান্তরের মহৎ সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অব্যাহত রয় – প্রকৃতি ও সৃষ্টির এই সাধনাই জীবনের স্বাভাবিকত্ব। তাই কবি মৃত্যুভীত নন, প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য। কারণ, মৃত্যুই নবজন্মের সূচনা –

> যে মৃত্যুকে ভেদ ক'রে সুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
> রাশি-রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চার্য সফলতায়,
> যে – মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবরে ফোটে ফুল
> জ্ব'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায় –
> সেই মৃত্যুর – নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।
> মৃত্যুর নাম অন্ধকার; কিন্তু মাতৃগর্ভ – তাও অন্ধকার, ভুলোনা
> তাই কাল অবগুণ্ঠিত, যা হয়ে উঠেছে তা-ই প্রচ্ছন্ন;[২৯]

মহাকালচেতনা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এই দার্শনিক উপলব্ধিই মহাভারতের মিথের বহিরাশ্রয়ে পরবর্তীকালে শিল্পিত হয় *কালসন্ধ্যা* ও *সংক্রান্তি* নাটকে।

শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর এবং *যে আঁধার আলোর অধিক* কাব্যে কখনো চূর্ণরূপে, কখনো প্রতীকে *মহাভারতের* অর্জুন-মিথ বারংবার ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব বসুর অর্জুন–অনুষঙ্গী কবিতাগুলোতে ব্যঙ্গই মুখ্য, অর্জুন চরিত্রের ব্যর্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটনই কবির উদ্দেশ্য। *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর* কাব্যে 'অসম্ভবের গান'

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় গান্ধারীর অভিশাপে 'মৌষলপর্ব' দ্বারকাপুরী নিমজ্জনের সময় গাণ্ডীবধারী নিষ্ক্রিয় অর্জুনের অসহায়ত্ব ও ব্যর্থ-বীরত্বকে উপহাস করেন কবি –

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে মন,
থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি।
কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
এক বসন্তেই শূণ্য তূণ।[৩০]

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় এই অর্জুনকে এবং তার ঘটনাবহুল জীবনকে প্রতীকীভাবে সম্পর্কিত করেন আধুনিক যুগের কবি বা শিল্পীর দ্বন্দ্বময় সংগ্রামী জীবনের সাথে, অর্জুনের 'অসাধ্য সাধনের' সংকল্পের সমান্তরালে তিনি লক্ষ করেন জড়তার বিরুদ্ধে আধুনিক শিল্পীর চৈতন্যের সংগ্রাম সাধনা। আর অর্জুনের প্রেম-তৃষ্ণায় তিনি একালের কবি-শিল্পীর অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসার অস্থিরতা এবং বিকল্পের তৃষ্ণাকে লক্ষ করেন। সর্বোপরি 'কালসন্ধ্যা'য় অর্জুনের পরাভবকে তিনি 'আধুনিক মানুষের জীবন-নিয়তির' প্রতীকে চিহ্নিত করেন।[৩১] কিন্তু, আমাদের বিচেনায় এ প্রতীক- ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পিত, বিশেষত তা বুদ্ধদেব বসুর উপলব্ধি বা উদ্দেশ্যকে ধারণ করে না। বুদ্ধদেব বসুর অর্জুন-বিষয়ক কবিতাগুলোতে দ্বিতীয় মাত্রা অনুসন্ধানের পূর্বে আমরা লক্ষ করি, সেখানে অর্জুনের প্রতি ব্যঙ্গই প্রধান। বিশেষত যুগ যুগ ধরে মহাবীর বলে খ্যাত অর্জুনকে প্রকৃত বীর বলে স্বীকৃতি দিতেই নারাজ বুদ্ধদেব বসু। অর্জুন সম্পর্কে তিনি প্রথম থেকেই সংশয় পোষণ করেন। কারণ,অর্জুনের ঐশ্বর্যের অন্তরালে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন দারিদ্র্য। অর্জুন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মূল্যায়নে তা স্পষ্ট –

> তিনি (অর্জুন) কৃষ্ণের এক ক্রীড়নক মাত্র, কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের একটি উপলক্ষ শুধু, – তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর একটিও উপার্জিত নয়, উপহার প্রাপ্ত; তার মুকুটের উজ্জ্বলতম সব রত্নই কৃষ্ণের দ্বারা সন্নিবিষ্ট হয়েছিলো।[৩২]

বুদ্ধদেব বসুর বিচারে অর্জুন কৃষ্ণের কূট কৃপাধন্য, দৈবপক্ষপাতপুষ্ট একটি নির্বীর্য চরিত্র ছাড়া কিছু নয়। আর সেজন্যই শল্যপর্ব থেকে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব যেমন খণ্ডিত, অর্জুনের ভূমিকাও তেমিন সংকুচিত হয়ে আসে। শুধু কৃষ্ণই নয়, ভীষ্ম-দ্রোণ-উলুপী- চিত্রসেন – স্বর্গের প্রধান দেবতারা প্রত্যেকেই ছিল অর্জুনের পক্ষপাতী। অর্জুন মহাভারতের আরোপিত, দেবধন্য বীর চরিত্র – বুদ্ধদেবের ভাষায়, 'বিশ্বপ্রকৃতির আদুরে ছেলে' – 'এরকম কোনো বিশুদ্ধ স্বকীয় কর্ম অর্জুনের জীবনে একটিও নেই। সবই তাঁর জন্য করে দেয়া হয়েছিলো, তাঁর বিঘ্নহীন পথ বহু যত্নে রচনা করে দিয়েছিলেন অন্যেরা, তিনি শুধু পথের বাঁকে বাঁকে জয়মাল্যগুলি গ্রহণ করেছিলেন।'[৩৩] অথচ, এই পক্ষপাতের নিমিত্তে অর্জুনের এমন কোনো নৈতিক ও হৃদয়গত গুণ লক্ষ করা যায় না। বরং নৃশংসতা ও নির্বিবেকী অন্যায়ই পরিলক্ষিত হয়। অর্জুনের জয়যাত্রার পথে মর্মান্তিকভাবে বলি হয়েছে তরুণ নিষাদ-বীর একলব্য, ভয়াবহভাবে বঞ্চিত, নিঃশেষিত হয়েছে কর্ণ ও তার অহম। অর্জুনের যুদ্ধনীতিও প্রায়শই নীতিহীনতার নামান্তর। *যে আঁধার আলোর অধিক কাব্যের* 'শিল্পীর উত্তর' কবিতায় বুদ্ধদেব তো এই কথাগুলোই বলেন –

যুদ্ধে হয়েছি অজেয়
নির্বিবেক পক্ষপাত মেনে নিয়ে, যার যূপে প্রথম কৌন্তেয়
বধ্য হ'লো, একলব্য বিকলাঙ্গ; আর যদিও সত্তায়
ক্ষাত্রধর্ম বদ্ধমূল, অস্ত্র ফেলে, অমল ব্যথায় –
সময় সংকটে যবে অপ্রকৃতি উপচীয়মান –
শুনেছি অমৃত কণ্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান।
সব সত্য।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

অর্জুনের বীরত্ব, সংগ্রাম, বিজয় সবকিছুকেই যখন বুদ্ধদেব বসু পরিকল্পিত বলে মনে করেন, এমনকি অর্জুনের বীরত্বকেই পরাশ্রয়িতা বলে মনে করেন, তখন অর্জুনের জীবনের সাথে কমলেশ চট্টোপাধ্যায় কথিত আধুনিক শিল্পীর দ্বন্দ্বময় সংগ্রামশীল জীবনের তুলনা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? ব্যাঙ্গার্থে 'বহুমুখী প্রতিভা'ধারী – অর্জুনের আরেকটি যোগ্যতা 'ললনা-প্রিয়তা'ও বারবার উপহসিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ও প্রবন্ধে। 'পঞ্চমাংশে সমাপন্ন সামাজিক পতি' অর্জুন পাঞ্চালীকে প্রবঞ্চনাই করেছে সারা জীবন। 'নারীত্বের মদিরায় মজে' সুবিধাজনক সময়ে ভেঙ্গেছেন এমনকি ব্রহ্মচর্যব্রতও – মেতেছেন 'বসন্তের হুলুস্থুলে' জীবন-অভিযাত্রার পর্বে পর্বে সুভদ্রা, উলুপী, চিত্রাঙ্গদার সাথে 'অপভ্রংশ' প্রণয়ে পেতেছেন 'ক্ষণস্থায়ী বাসরশয্যা' –

কামনার সান্দ্র আবেদনে জ্বলেছি সম্মত ধূপ
হাজার শয্যায়, মনে মনে দ্রৌপদীকে দুর্বল জেনেও![৩৪]

সুতরাং, এহেন ভোগলিপ্সু, পার্থিবেয় অর্জুনের সাথে বুদ্ধদেব বসু কেন কমলেশ–কথিত 'আধুনিক শিল্পীর শিল্পের বিকল্প তৃষ্ণার' সাথে তুলনা করবেন? কমলেশ চট্টোপাধ্যায় *কালসন্ধ্যায়* 'মৌষলপর্ব' অর্জুনের পরাভবের মধ্যেও 'আধুনিক মানুষের জীবন-নিয়তি' কে প্রত্যক্ষ করেন।[৩৫] কিন্তু, যে অর্জুনের বীরত্ব, যুদ্ধজয় সবই অন্তঃসারশূন্যতার নামান্তর এবং যে সর্বাংশে, সর্বভাবে ঋণী, তার পতনে বা পরাভবে বুদ্ধদেব কি সত্যিই বিচলিত, মর্মাহত? না, বরং *মৌষল পর্বে* অর্জুনের এ পরিণতিই তাঁর নিকট যথোচিত, স্বাভাবিক; ট্রাজেডি তো নয়ই। অর্জুন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু অন্তত অপক্ষপাতী। টোমাস মানের উপন্যাসের ইঙ্গিতে তিনি মনে করতেন – 'অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, মানবিক সীমান্তলঙ্ঘী অভীপ্সার জন্য কঠিন মূল্য না-দিয়ে উপায় নেই' – আর অর্জুনের জীবন চরিতের মধ্য দিয়েও এই কথাটা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে।'[৩৭] বুদ্ধদেব বসু মনে করেন – কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে কৃষ্ণ কেবল অর্জুনের সারথিই ছিলেন না, ব্যাপক অর্থে, পাণ্ডব পক্ষের সমস্ত যুদ্ধেই সারথ্য করেন তিনি, মাধ্যম হিসেবে 'ভৃত্যের মতো' ব্যবহার করেন অর্জুনকে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর অর্জুনের বীরত্ব ক্ষমতা সমস্ত কিছুর নিঃস্বতা ঘটিয়ে তাকে পতনের মুখে নিক্ষেপ করে চলে যান কৃষ্ণ। অথচ, সারথির এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বোঝার মতো ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। অর্জুনের এই মূঢ়তা ও নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধদেব বসু ক্ষমাহীন বিদ্রূপে উপর্যুপরি বিদ্ধ করেন – মহাভারতের এই অজেয় বীরকে তুলনা করেন বুদ্ধিশূন্য 'বালিকা বধূ'র সঙ্গে – 'রবীন্দ্রনাথের বালিকাবধূর মতোই বুদ্ধিহীন, তিনি যেন ধরে নিয়েছিলেন এই মধুর খেলাই চলবে চিরকাল'।[৩৮] অর্জুনের সমস্ত ঐশ্বর্য অপহৃত হবার পরও নিজের বীর্যহীনতা ও পূর্বাপর কৃষ্ণ-নির্ভরতার প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি তাঁর হয় না, উপরন্তু তিনি 'কোনো সিংহাসনচ্যুত রাজা'র পূর্বতন উপাধিসমূহের প্রতি আসক্তির মতো নির্লজ্জভাবে আঁকড়ে পড়ে থাকেন তাঁর নিষ্ক্রিয় গাণ্ডীব ও নিঃশেষিত তূণীরদ্বয়। বরুণদেবতার বারংবার নির্দেশে মহাপ্রস্থানের পথে যখন তিনি বাধ্য হন সেগুলো সমপর্ণ করতে, তার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমাদের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অর্জুনের পরাভব নিঃস্বতা এবং মৃত্যুতে বুদ্ধদেব বিন্দুমাত্র ব্যথিত নন, বরং যথার্থ প্রতিফল মনে করে তাতে স্বস্তিবোধ করেন এবং বলেন – 'এক জীবন্মৃত অর্জুনের চেয়ে মৃত অর্জুন আমাদের পক্ষে অনেক বেশি শ্লাঘনীয়।'[৩৯] এই অর্জুন, যার সম্পর্কে বুদ্ধদেব একটি ইতিবাচক উক্তিও উচ্চারণ করেননি, যার 'সুন্দর আননে চিন্তার ছায়া পড়ে না' কখনো, অন্তর্জীবনে যে নিশ্চল, আলোড়নহীন – যার মধ্যে সংবেদন কিংবা সূক্ষ্মতার লেশমাত্র নেই, তাঁকে কেমন করে কবি কোনো সংরক্ত চিত্তের আধুনিক শিল্পীর প্রতীকে উপস্থাপন করেন, কীভাবে শিল্পী-সমগোত্রীয় বলে মনে করেন, যেখানে কবি নিজেই আধুনিক মানুষ ও শিল্পীদের প্রতিনিধি? আমাদের বিবেচনায় অর্জুন নয়, বরং মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে কল্পনা করা যেতে পারে উক্ত প্রতীকে যিনি অন্তরে ধারণ করেন স্বকীয়তা ও স্বভাব-কবিত্ব, বুদ্ধদেবের মূল্যায়নে যিনি 'সকল লোকের মাঝে নিজ মুদ্রা দোষে একা।' যুধিষ্ঠিরই হতে পারে যে কোনো আধুনিক শিল্পীর প্রতিভূ-চরিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

তবে মহত্ত্ব নয়, যুধিষ্ঠির চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর আধুনিক চেতনা। বুদ্ধদেব বসু মূলত পৌরাণিক যুধিষ্ঠিরকে স্থাপন করেন সমকালীন বৈশ্বিক পতনশীলতার ভেতর নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত এক ব্যক্তি রূপে, যিনি সর্বজনীন ধ্বংসোন্মুখ জগতের মধ্যে থেকেও অবিকলভাবে স্বস্থ, যিনি কারো দ্বারা উপদিষ্ট না হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মসন্ধানে ব্যাপৃত এবং নির্ভুলভাবে 'নিজ প্রেরণায় গতিশীল।'[৪৪] আমাদের বিবেচনায়, এই যুধিষ্ঠির হতে পারে বুদ্ধদেব বসুরই পৌরাণিক প্রতিভূ, যিনি তাঁর স্বাধ্যায়নের পথে একাকী উৎসুক, সংগ্রামশীল এক সত্তা, অন্য কোনো দৃষ্টান্তের অনুগামী নন; স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুসারী এবং শেষ পর্যন্ত মহৎ দর্শনে উপনীত – যেখানে বিশ্বমানবত্ম, সুবৃহৎ কালচেতনা এবং, জন্ম-মৃত্যু-পুনরুজ্জীবনের বাস্তবতায় মানুষ শেষ পর্যন্ত নিঃসহায় দর্শক – আর যিনি পূণ্যাত্মা, পরিণামদর্শী, তিনি নিরাসক্ত ও নির্বেদাশ্রয়ী।

এইভাবে একদিকে 'মহাভারতের কথায়' পুরাণের জীবন, চরিত্র ও পুরাণ-নিহিত দর্শন ও বাস্তবতা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বুদ্ধদেব বসুর মিথিক ভাবনা পরিণত হয়ে ওঠে এবং একই সাথে কবিতায় সমকালীন বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার সাথে সেই মিথিক ভাবনার বিভিন্ন প্রয়োগে তা অর্জন করে বহুমাত্রিকতা। ফলে, পুরাকালের জীবন-সত্যের সাথে সমকালীন সংকট ও উপলব্ধির সংযোগে কবির দর্শন একটি দৃঢ় ভিত্তি নিয়ে কাব্যনাটকের লক্ষ্যে পরিণামমুখী হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক রচনার অব্যবহিত পূর্বে মহাভারতের পাশাপাশি কবিতার ক্ষেত্রে *স্বাগত বিদায় থেকে যে আঁধার আলোর অধিক* পর্যন্ত শেষ কাব্যপর্যায়ে কবির মিথ-প্রয়োগের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে কবি ব্যঞ্জনা অপেক্ষা আখ্যানের দিকে অধিক আগ্রহী, কবিতার মধ্যে নাটকীয়তা সঞ্চার ও চরিত্র বিনির্মাণে সক্রিয়। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে 'দময়ন্তী ও নল', 'হনুমানের জীবন ও মৃত্যু', 'সাবিত্রীর জন্য কবিতা', সিরিজ কবিতা – 'দেবযানীর স্মরণে কচ' প্রভৃতির ভাষা ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু ক্রমশ কাব্যনাটকের নিকটবর্তী হয়ে উঠছিলেন। *মরচে পড়া পেরেকের গান* কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীর প্রতীকী প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তো *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র সূত্রপাতই ঘটে যায়। সুতরাং *মহাভারতের কথার* সাথে সাথে এই কাব্যপর্যায়টি তাঁর কাব্যনাটকের একটি অনুশীলন স্তর। তবে, কবিতার মধ্য দিয়ে অখণ্ড মানব-সত্যের উদ্ভাসন চিত্রণ সম্ভব নয়, সেখানে মিথিক অনুষঙ্গে কবির টুকরো উপলব্ধির প্রতীকী প্রকাশই ঘটে থাকে অধিকাংশক্ষেত্রে। কবিতায় যা রূপান্বিত হয়, তা কবির সাময়িক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আর কাব্যনাটকে সেইসব অভিজ্ঞতার সামষ্টিক রূপ প্রতিফলিত হয় জীবনোপলব্ধির সারাৎসার হিসেবে দর্শনরূপে, অভিজ্ঞানের আকররূপে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের বুদ্ধদেব বসুর সেই জীবন-দর্শনকে আবিষ্কার করবো, যা কাব্য-প্রবন্ধ-অনুবাদের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত ও সুবিন্যস্ত হয়ে, একটি অখণ্ড, শাশ্বত জীবনসত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর কাব্যনাটকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১ বুদ্ধদেব বসু, 'রামায়ণ' 'সাহিত্য-চর্চা', ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ০৯

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুপ্ত

৪ প্রাগুক্ত

৫ প্রাগুক্ত

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৭ প্রাগুক্ত

৮ প্রাগুক্ত, পৃ- ১০

৯ বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা: সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', 'কালিদাসের মেঘদূত', ডিসেম্বর ১৯৯৯, মাওলা বাদ্রার্স, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৩৮

১০ বুদ্ধদেব বসু, 'মাইকেল' 'সাহিত্য-চর্চা', ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ০৭

১১ বুদ্ধদেব বসু' 'মুখবন্ধ', 'মহাভারতের কথা', ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ০৭

১২ বুদ্ধদেব বসু, 'মাইকেল' 'সাহিত্য-চর্চা', ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৬

১৩ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল: মিথ্-পুরাণের সন্ধানে', 'বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত); অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, পৃ.৯০

১৪ বুদ্ধদেব বসু, 'শাপভ্রষ্ট' 'বন্দীর বন্দনা', 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ', ১ম খণ্ড, মে ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৩৬

১৫ 'কোনো বন্ধুর প্রতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১৭ 'প্রেমিক', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১৮ 'বুদ্ধদেব বসু, উদ্ধৃত, 'যৌবনের কবি', শীতল চৌধুরী, 'বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত); অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, পৃ.৪২

১৯ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল: মিথ্-পুরাণের সন্ধানে', 'বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত); অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, পৃ.৮৮

২০ বুদ্ধদেব, 'কঙ্কাবতী', 'কঙ্কাবতী', 'বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ-৭', নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ১৯৭৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৭

২১ বিজয় দেব, 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা', 'জলার্ক', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, বইমেলা ২০০৮, মানব চক্রবর্তী (সম্পাদিত), পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২২ বুদ্ধদেব বসু, 'দময়ন্তী', 'দময়ন্তী, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগহ ২য় খণ্ড, নরেশ গুহ (সম্পাদিত), জানুয়ারি ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫৮

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২৫ প্রদীপ রায়গুপ্ত, 'বুদ্ধদেব বসুর প্রেমভাবনায় দময়ন্তীয় পুরাণ প্রতিমা', 'জলার্ক' উনবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, বইমেলা ২০০৮, ৩২ই/এ বাবুরাম ঘোষ রোড, কলকাতা ৭০০০৪০, পৃ. ২৮৬

২৬ বুদ্ধদেব বসু, 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'দ্রৌপদীর শাড়ি', 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ', ২য় খণ্ড, নরেশ গুহ (সম্পাদিত), জানুয়ারি ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১২৩

২৭ বুদ্ধদেব বসু 'মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে', 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

২৮ প্রাগুক্ত, ' শীতরাত্রির প্রার্থনা' পৃ. ২৬৫

২৯ বুদ্ধদেব বসু, 'শীতরাত্রির প্রার্থনা' প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

৩০ বুদ্ধদেব বসু ,'অসম্ভবের গান' পৃ. ২২১

৩১ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল: মিথ্-পুরাণের সন্ধানে', 'বুদ্ধদেব বসু, মননে অন্বেষণে', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯, পৃ. ১০৫

৩২ বুদ্ধদেব বসু, 'ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য: দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য', 'মহাভারতের কথা' পৌষ ১৩৯৭ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৫৩-২৫৪

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

৩৪ বুদ্ধদেব বসু, 'শিল্পীর উত্তর', 'যে আঁধার আলোর অধিক', 'বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ', নবম খণ্ড, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ১৯৭৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১০৬।

৩৫ প্রাগুক্ত

৩৬ ডক্টর কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা*', আগস্ট ১৯৮০, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৭৩, পৃ. ১০৬।

৩৭ বুদ্ধদেব বসু, 'ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য: দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য", 'মহাভারতের কথা' পৌষ, ১৩৯৭ এম.সি. সরকার সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৫৮

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

৩৯ বুদ্ধদেব বসু, 'শেষ যাত্রা', 'মহাভারতের কথা', পৌষ ১৩৯৭, এম.সি. সরকার সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৭১

৪০ বুদ্ধদেব বসু, 'মূল কাহিনী', 'মহাভারতের কথা' পৌষ, ১৩৯৭ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪০

৪১ প্রাগুক্ত

৪২ বুদ্ধদেব বসু 'দুই কুকুর'. 'স্বাগত বিদায়' 'বুদ্ধদেব বসু রচনা সংগ্রহ', নবম খণ্ড, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ১৯৭৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৩

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৪৪ বুদ্ধদেব বসু, ' শেষ যাত্রা', 'মহাভারতের কথা' পৌষ, ১৩৯৭ এম.সি. সরকার সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে মিথের ব্যবহার : জীবনবোধে ও দর্শনে

বুদ্ধদেব বসুর শিল্পসৃষ্টির অন্তিম পর্বটি মিথ-চর্চা ও মিথ-নির্মাণে তাৎপর্যবহুল। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল কালপর্বে তাঁর মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটকগুলির জন্ম। এ পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু জীবন অভিজ্ঞতায় পরিণত, জীবনদর্শনে মীমাংসিত এবং মিথের পুনর্নির্মাণে প্রত্যয়ী শিল্পী। ইতোমধ্যে প্রাচ্য ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবকে আত্মস্থ করে বুদ্ধদেব বসু অর্জন করেছেন শিল্পীর দূরদর্শিতা এবং তাঁর মিথিক ভাবনা ও দর্শনকে উপস্থাপনের যথার্থ মাধ্যম হিসেবে কাব্যনাটকের বিষয়ে হয়েছেন নিঃসংশয়ী, যার প্রতিফলন ঘটে তাঁর মিথাশ্রয়ী প্রথম কাব্যনাটক *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে (১৯৬৬)। এরপর বুদ্ধদেব বসুর মিথ-ভাবনা ও কাব্যনাটকের অবিরল সখ্যে ক্রমান্বয়ে স্বল্প দূরত্বে রচিত হতে থাকে *কালসন্ধ্যা*, (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০), *প্রথমপার্থ* (১৯৭০) ও *সংক্রান্তি* (১৯৭৩)।

মূলত শিল্পসাহিত্যে মিথ-ব্যবহার তখনই মৌলিকতা অর্জন করে, যখন তা স্রষ্টার ব্যক্তিত্বস্পর্শে নবত্বপ্রাপ্ত হয়। আর শিল্পীর ব্যক্তিত্ব (*Persona*) নির্মিত হয় তাঁর সমকালীন অভিজ্ঞতা, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং জীবনোপলব্ধির সূত্রে। সুতরাং পুরাণের পুর্নজন্মের ক্ষেত্রে শিল্পীর জীবনদর্শনের প্রতিফলন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এলিয়টের ভাষায়- 'Every work of Imagination must have philosophy; and every philosophy must be a work of art - অর্থাৎ যে কোনো কল্পনাত্মক শিল্পেরই একটি দর্শন থাকা প্রয়োজন এবং সেই দর্শন যখন 'আর্টে' পরিণত হয়, তখনই তা অর্জন করে সার্থকতা।[১] বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

কাব্যনাটকে বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শন বহুস্তরিক। কারণ, তা একইসাথে ধারণ করে সমকালীন জীবনচেতনা, পুরাণলব্ধ সামূহিক চেতনা এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞানকে। এই ত্রয়ীচেতনার ঐক্যে নির্মিত বুদ্ধদেব বসুর মিথিক দর্শন যথার্থ অর্থেই হয়ে ওঠে ত্রিকাল-সঞ্চারী – যা অতীত ইতিহাস, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যত প্রতীতিকে এক অভিন্নসূত্রে অর্থবহ করে তোলে। মূলত শিল্পের ক্ষেত্রে মিথিক দর্শন তাই, যা সমকালীন হয়েও স্থানকালোত্তীর্ণ, নতুন সৃষ্টি হয়েও শাশ্বত মহিমায় অন্তর্দীপ্ত এবং সামূহিক চেতনাজাত হয়েও শিল্পীর ব্যক্তিত্বস্পর্শে অভিনব। পাঁচটি কাব্যনাটকে মিথের আশ্রয়ে বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনের বিভিন্ন মাত্রা প্রতিফলিত।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

উর্বরতা ও আদি-চেতনার আধুনিক নন্দনকল্প

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলো আকস্মিক উৎসাহে অপর্যাপ্ত সংগ্রহ ও খণ্ডিতবোধে নির্মিত নয়, বরং দীর্ঘদিনের সংগ্রহীত অনুষঙ্গগুলি গ্রহণ-বর্জনের নানা স্তর অতিক্রম করে ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে যোগ্য আধারকে আশ্রয় করে ক্রটিহীন, অনবদ্যরূপে মূর্ত হয়। বহুপ্রজ বুদ্ধদেব বসুর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কাব্যনাটকগুলিই সর্বাধিক সাধনার উদ্দিষ্ট। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এমনি একটি সঞ্চিত একাগ্রতার ফসল। বুদ্ধদেব বসুর জীবনভাবনার মৌল অভিপ্রায় কামচেতনা বিভিন্ন মাধ্যমে বিচিত্রভাবে বারংবার নিরীক্ষিত হয়ে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এই নাটকে- যা একদিকে বৃহত্তর অর্থে সামূহিক চৈতন্যকে ধারণ করে, অপরদিকে তা আধুনিক বিশ্বে নরনারীর ব্যক্তিচেতনাকেও প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই দু'য়ের সমন্বয়ে তা অর্জন করে স্থানকালোত্তীর্ণ বৈশ্বিকতা। আমাদের চেতনায় জাগিয়ে তোলে পোড়োভূমি, বন্ধ্যা পৃথিবী ও বিশ্বজুড়ে মানব-মানবীর বিশুষ্ক অন্তরের বৃষ্টিকাতরতার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টি ও বন্ধ্যাত্বের সূত্রে বৃষ্টি ও উর্বরতাকেন্দ্রিক যৌথ চেতনাটি রূপান্বিত এবং তৃতীয় অঙ্ক থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর অন্তর্সংকটের মধ্যদিয়ে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কাম-কেন্দ্রিক আধুনিক ভাবনাটি ব্যক্ত। এই দুটি মাত্রার সমন্বয় ও সমাধান তৈরি হয় চতুর্থ অঙ্কের শেষ অংশে যেখানে বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনার সংশ্লেষণ সাধিত।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত আবহমানকাল ধরে স্বীকৃত উর্বরতার মিথ (*Myth of fertility*) কে অবলম্বন করে বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটান বলেই *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে তা অর্জন করে সর্বজনগ্রাহ্যতা।

তপস্বী ও তরঙ্গিণীর প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে বুদ্ধদেব বসু পুরাণের অনুসরণে দেখিয়েছেন, লোকে যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দা করে, তাই বিশ্বের বীজমন্ত্র; ব্যবহারিক জীবনে বংশপরম্পর জনন ও জন্মের তা অপরিহার্য উপলক্ষ। কাম ছাড়া বিশ্বপ্রকৃতি নিষ্ফলা, ঋতু রুদ্ধ, জীবের সৃষ্টি প্রবাহ স্থবির। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমস্ত শৃঙ্খলা ব্যাহত। বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে কামকে বৃষ্টির প্রতীকে চিত্রিত করেন, যার অমিয় ধারায় ক্ষেত্র ও বীজ, গর্ভ ও জল, মৃত্যু ও জন্ম পায় সার্থকতা – সভ্যতা থাকে অব্যাহত। অপরদিকে, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে এই কামই আধুনিক মানুষের আত্মপরিচয় ও আত্মমুক্তির মাধ্যমরূপে তাকে সংসার বিচ্যুত করে নিয়ে চলে পুণ্যের পথে। নাট্যকার ব্যক্তির ক্ষেত্রে কামের ভূমিকাকে অধিক গুরুত্ব দিলেও *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনা প্রকৃতপক্ষে দ্বিমাত্রিক।

তপস্বী ও তরঙ্গিণীর প্রথম অঙ্কে অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টি, বন্ধ্যাত্ব ও দুর্ভিক্ষের প্রতিরূপকে ব্যবহারিক জীবনে কামের অপরিহার্যতা চিত্রিত – গাঁয়ের মেয়েদের বৃষ্টি-বন্দনায়, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে, ঋষ্যশৃঙ্গে কৌমার্য-হরণের সমস্ত আয়োজনে। দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীর সাথে ঋষ্যশৃঙ্গের মিলনের মধ্যদিয়ে দু'টি প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রথমত, অঙ্গদেশে বৃষ্টিপাত ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার পুনঃসচলতা এবং দ্বিতীয়ত, তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের আত্মসংকটের সূচনা। ফলে, তৃতীয় অঙ্ক থেকে সামূহিক চেতনার প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয় আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্ব-মানসতা। তৃতীয় অঙ্ক থেকে অঙ্গদেশের উর্বরতা, ঐশ্বর্য, আনন্দ, উৎসব আচারকে প্রচ্ছন্ন রেখে নাট্যকার ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে সচল করেন। ক্রমশ এই অন্তর্সংকট ঘনীভূতরূপে লক্ষ্যাভিমুখী হয় – বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনের সমীপে। তৃতীয় অঙ্কের তরঙ্গিণী তার সনাতন পেশায় বিমুখ, জগৎ-সংসার, প্রলোভন-আহবান থেকে নিরত। রুদ্ধকক্ষে দর্পণের দিকে তাকিয়ে তার হারিয়ে ফেলা মুখচ্ছবি সন্ধানে বদ্ধপরিকর – যা সে দেখেছিলো মুহূর্তের জন্য অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে। স্মৃতিতে জাগ্রত সেই হারানো সত্তার অন্বেষণে তরঙ্গিণী হয় বিস্রস্ত, রক্তাক্ত, প্রায়-উন্মাদ, প্রলাপ-কাতর –

তরঙ্গিণী । আমি রিক্ত, আমি সর্বশান্ত। ... (দর্পণে গভীর ভাবে তাকিয়ে) এই কি সেই মুখ, যা তুমি দেখেছিলে? 'তাপস তুমি কে? কোনো স্বর্গের দূত? কোনো ছদ্মবেশী দেবতা?' এই মুখ এই বসন, এই অলংকার। তুমি কি আমাকেই দেখেছিলে? এই আমাকে? 'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে'। ... আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? আমি স্বপ্নে দেখি তোমার দৃষ্টি – জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি। কিন্তু তুমি যাকে দেখেছিলে তা সে অন্য কেউ? আবরণ নয়, প্রসাধন নয়, ত্বক মাংস মেদ কান্তি নয় – সে কে তবে? বল দর্পণ, সে কে? এক মুখ এক মুখ – একই মুখ ফুটে ওঠে বারবার – অন্য মুখ নেই? এসো - বেরিয়ে এসো দর্পণের গভীর থেকে – বেরিয়ে এসো সেই মুখ।

অপরদিকে শান্তার সাথে বিবাহের পর চতুর্থ অঙ্কে রাজকীয় আচারে আবদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ অন্তর্জগতে নিঃসঙ্গ, উৎপীড়িত, নিস্পৃহ –

ঋষ্যশৃঙ্গ (অলিন্দে) –

বিস্বাদ- বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপুত্র বিবাহ বিস্বাদ,
বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।
আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী ।
ওরা জানে না, কেউ জানে না- আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

রাজত্ব, প্রজাকুল, জায়া-পুত্র, অবিরল উৎসবকৃত্যের ভেতর উৎপীড়িত অথচ বাধ্য ঋষ্যশৃঙ্গের গোপন উৎসুক কামনা তরঙ্গিণীর জন্য –

Dhaka University Institutional Repository

ঋষ্যশৃঙ্গ (পদাচরণা ক'রে)। পতি-পিতা-যুবরাজ আমি? ব্রহ্মচারী-বনবাসী-আমি? না-না- আমি তোমার। অসহ্য নগর - অসহ্য জনতা - কিন্তু এখানেই আমার অপেক্ষা – তোমার জন্য।

অপরদিকে, অংশুমানের প্রতি গুপ্ত আবেগ নিয়ে শান্তাও বিষণ্ন, অবদমিত। আর দাম্পত্যের ছদ্মবেশে শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তরের বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার সন্তর্পণে আধুনিক দাম্পত্যের রূপটিকে সক্রিয় করেন, যার উপন্যাসরূপ লক্ষ করা যায়, *রাত ভ'রে বৃষ্টিতে*। রোম্যান্টিক উদ্বোধনের সাথে সাথে একালের হৃদয়জাত টানাপোড়েনের সংক্রমণ নাটকটিকে চূড়ান্ত মাত্রায় আধুনিক করে তোলে।

শুধু ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীই নয়, তৃতীয় অঙ্ক থেকে প্রত্যেকটি চরিত্রই নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ। অংশুমান রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের যূপে তার প্রণয়ী শান্তাকে হারিয়ে ভারাক্রান্ত, যন্ত্রণাকাতর, ঋষ্যশৃঙ্গ-বিদ্বেষী ও তার অপূরণীয় ক্ষতির প্রতিকারপ্রার্থী – 'ঋষ্যশৃঙ্গ ত্রিলোকের অধীশ্বর হোন – কিন্তু শান্তা আমার।' বঞ্চিত হৃদয় নিয়ে চন্দ্রকেতুও সমদুঃখভাগী। কারণ, চন্দ্রকেতুর একনিষ্ঠ হৃদয়ের উপাস্য তরঙ্গিণী আজ বিস্রস্ত, নির্মোহ, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। এদিকে লোলাপাঙ্গী সমস্ত জীবনের সাধনায় তিল তিল করে সৃষ্ট তার একমাত্র কন্যার বিকারে একদিকে মাতৃত্বের সংকটে অপরদিকে অস্তিত্বের সংকটে উপায়ন্তরহীন। ঋষ্যশৃঙ্গকে হারিয়ে প্রচণ্ড প্রতাপ বিভাণ্ডকও বাতাহত মহীরুহের মতো ভূলুণ্ঠিত, হৃতসর্বস্ব, নিঃসঙ্গ, পরাজিত এক পিতা। পৌরাণিক বিভাণ্ডক বৎসরান্তে ফিরে পায় পুত্রকে তার পুরনো আশ্রমে। কিন্তু, এ নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও ব্যঙ্গবিদ্ধ বিভাণ্ডক বিচ্ছিন্ন আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি। *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* তৃতীয় অঙ্কে শুরু হওয়া এই বহুমুখী অন্তর্সংকটের অবসান হয় চতুর্থ অঙ্কের শেষাংশে, পরিণামী দৃশ্যে, যেখানে তরঙ্গিণীকে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে ইন্দ্রিয়লালসার ক্ষুধা, আর তরঙ্গিণীর চোখে বিস্ময় ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে তার হারানো মুখচ্ছবি দেখতে না পাওয়ায়। এ অংশে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ কামনা-প্রজ্জ্বলিত এবং, তরঙ্গিণীর সংলাপ আশাভঙ্গে আর্দ্র, হতাশাপূর্ণ –

ঋষ্যশৃঙ্গ । (তরঙ্গিণীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, স্বগতোক্তির ধরনে) – তুমি। তুমি আমার হৃদয়ের বাসনা, আমার শোণিতের হোমানল। অন্য কেউ নয়, কিছু নয়।

তরঙ্গিণী । (ক্ষণকাল ঋষ্যশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে থেকে)। আমি সেদিন ছলনা করেছিলাম, তাই বলে তুমিও কি আজ ছলনা করবে? আমার দিকে কেন দৃষ্টিপাত করো না?

ঋষ্যশৃঙ্গ । তৃষ্ণার্তের যেমন জল, তেমনি আমার চোখের পক্ষে তুমি।

তরঙ্গিণী । না, না - তা নয়। তোমার মনে নেই সেই মুখ? যে - মুখ তুমি সেদিন দেখেছিলে? যা অন্য কেউ কখনো দ্যাখেনি? সেই মুখ আমি হারিয়ে ফেলেছি। দর্পণে তা খুঁজে পাই না; আমার মা, আমার প্রার্থী এই চন্দ্রকেতু কেউ জানেনা আমি জন্ম থেকে অন্য এক মুখ লুকিয়ে রেখেছিলাম – তোমার জন্য, তুমি দেখবে ব'লে। আমার সেই মুখ আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর এই মনোবিক্রিয়া নাট্যকারের উদ্দেশ্যপ্রসূত। দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণী-ঋষ্যশৃঙ্গের মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে সঞ্চারিত করেন কামনা এবং, তরঙ্গিণীর মধ্যে রোম্যান্টিক প্রেম। চতুর্থ অঙ্কে সেই অন্তর-বিক্রিয়াকে বুদ্ধদেব বসু পরিণামী রূপ দান করেন। নাট্যকারের ব্যাখ্যায় – 'তরঙ্গিণী সেই আবেশ আর কাটিয়ে উঠতে পারলো না, তাই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে প্রথমে নিরাশ হ'লো সে; এবারে যেন দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাটি উল্টে গেলো – অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গই চাইলেন তরঙ্গিণীকে 'ভ্রষ্ট' করতে, আর তরঙ্গিণী খুঁজলো ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে সেই স্বর্গ, যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখেছিলেন, এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গই তরঙ্গিণীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা।'[২] ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী কামের মধ্য দিয়ে পুন্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হয়। এ পরিণাম পুরাণ অনুগামী নয়; বুদ্ধদেব বসুর সচেতন অভিপ্রায়। ঋষ্যশৃঙ্গের

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে এ পরিণাম ভবিতব্য নয়, বরং স্বাধীন সিদ্ধান্ত – রিক্ততা, শূন্যতা ও অন্ধকারে ডুবতে চাওয়ার স্বেচ্ছা সংকল্প। তরঙ্গিণীর ক্ষেত্রেও তার অভীষ্ঠ পথ অনির্ণেয়, কিন্তু তা তীর্থ নয়; অন্য কোনো সার্থকতার তীর। ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনার সমাধান নিহিত –

> **ঋষ্যশৃঙ্গ** । কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরে যেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানিনা, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে তরঙ্গিণী ।

ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর এই উদ্বর্তনের সিদ্ধান্তে, শূন্য হয়ে এককভাবে সংসার থেকে নিষ্ক্রান্তির মধ্যে সমালোচক লক্ষ করেন বোদলেয়ারীয় বিষাদ ও আধ্যাত্মিক অন্বেষা।[৩] মূলত চরিত্র দু'টির নিষ্ক্রমণ আধুনিক মানুষের সত্তানুসন্ধান ও আত্মআবিষ্কারের স্ববশ সংকল্পচালিত সিদ্ধান্তের প্রতিফলন – বুদ্ধদেব বসুর স্বোপার্জিত শিল্পীসত্তার অন্তর্ময় বহিঃপ্রকাশ।

বুদ্ধদেব বসুর এই কাম-ভাবনার সংশ্লেষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আর ব্যষ্টিকেন্দ্রিক আদি চেতনা, যেটি দ্বিতীয় অঙ্কের পর থেকে নাটকে প্রচ্ছন্ন ছিল, চতুর্থ অঙ্কের শেষাংশে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কামচেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং বুদ্ধদেব বসুর দর্শনকে একটি সামগ্রিকতা দান করে। মিলনের মধ্য দিয়ে দু'জন নরনারী আত্মবশ ও নিঃসঙ্গরূপে এবং ব্যতিক্রমীভাবে সংসারচক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেও জগৎ সচল থাকে পূর্ববৎ। শান্তা ও অংশুমান সেই পথের পথিক। তারা হয় অঙ্গদেশের উর্বরতার ধারক। পুরানো আখ্যানকে লঙ্ঘন করে শান্তা ও অংশুমানের রোম্যান্টিক পরিণয় ঘটিয়ে বুদ্ধদেব বসু জৈবসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বহমান রাখেন। পুরোহিতের বাণীতে সেই অব্যাহত প্রবংশ-পরম্পরার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয় –

রাজপুরোহিত ।

> মুক্ত হলো স্রোতস্বিনী, অঙ্গদেশ রজস্বল,
> পুত্র এলো স্বরাজ্যে, পূর্ণ হ'লো প্রতীক্ষা
> শান্তার পতি অংশুমান, যেমন সত্যবতীর শান্তনু;
> – উৎসব করো জনগণ, ধ্বনিত হোক জয়কার।

এইভাবে উর্বরতা সংক্রান্ত মিথচেতনা ও আধুনিক বিশ্বে নরনারীর কামচেতনা একীভূত হয়ে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনকে অখণ্ডতা দান করে আর সমকাল ও পুরাকালকে একপাত্রে ধারণ করে তা অর্জন করে শাশ্বতের সুদৃঢ় ভিত্তি। কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় – 'বুদ্ধদেব বসু রচিত আধুনিক মানসতাসম্পন্ন কাম ও প্রেমের কাহিনী শাশ্বত মিথ কাহিনীর অন্তর্ভুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলেই আধুনিক মনস্তত্ত্ব সমৃদ্ধ বুদ্ধদেবের নিজস্ব বক্তব্যও বিশ্বজীবনের দৃঢ়ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়েছে।'[৪]

অনাম্নী অঙ্গনা

আদি-চেতনার মহত্তর উদ্ভাসন

স্বসৃষ্ট কাব্যনাটকগুলির মধ্যে *অনাম্নী অঙ্গনা* ছিল বুদ্ধদেব বসুর প্রিয়।[৫] এর কারণ হতে পারে দু'টি – এক. *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* পর *অনাম্নী অঙ্গনায়* বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনার অপর একটি মাত্রা প্রতিফলিত, ভিন্ন প্রতিক্রিয়ায়; দুই. কাব্যনাটকগুলির মধ্যে *অনাম্নী অঙ্গনাতেই* নাট্যকার সর্বাধিক কল্পনাশ্রয়ী।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টির দিক থেকে *অনাম্নী অঙ্গনা তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* নিকটবর্তী না হলেও ভাবের দিক থেকে দু'টি নাটক অদূরবর্তী।

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে কামের মাধ্যমে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর পুণ্যপথে নিষ্ক্রমণের ঘটনায় বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনার দার্শনিক প্রয়োগ ঘটে, যেখানে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, আত্মশুদ্ধি ও আত্মোপোলব্ধিই মূল লক্ষ্য। অপরদিকে, একই দর্শনের প্রতিফলনে ভিন্নতর উত্তরণ লক্ষ করা যায় *অনাম্নী অঙ্গনায়*, যেখানে কাম ব্যবহৃত হয় বৈশ্বিক স্বার্থে এক মহত্তর জন্মের প্রক্রিয়ারূপে – এক অনূঢ়া মাতার ভবিষ্যতদর্শী কল্যাণময়ী সংকল্পের মাধ্যম হিসেবে; ঠিক যেমন সংকল্পে কুমারী মাতা মেরী তার গর্ভে লালন করেছিলেন যীশুকে ভবিষ্যত পৃথিবীকে ত্রাণের উদ্দেশ্যে। দু'টি নাটকের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর অন্বিষ্ট কামভাবনার দুইটি মাত্রাকে মুদ্রিত করেন শিল্পে।

যদিও বুদ্ধদেব বসু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে একটি পৌরাণিক কাহিনীকে তাঁর কল্পনা দিয়ে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন, তবু ঐ নাটকের আখ্যান নির্মাণে কল্পনাশ্রয়িতা অনেক কম। কারণ, পুরাণের ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যানই যথেষ্ট কল্পনাসুন্দর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। বুদ্ধদেব বসু সেখানে বৃষ্টি ও বীর্যের মৌল *রিচ্যুয়াল*টির সমন্বয় সাধন করেন এবং সবকিছুর উর্ধ্বে কাম-সর্ম্পকিত তাঁর দর্শনটি করেন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, অনাম্নী অঙ্গনার পুরাণ-উৎস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত – কেবল অম্বিকা প্রেরিত দাসীর সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মিলন ও তাদের পুত্র বিদুরের জন্ম – এ পর্যন্তই। মহাভারতের এই সংক্ষিপ্ত, সাধারণ আখ্যানটিকে কল্পনা, কাবিত্ব ও মহত্ত্ব দিয়ে সম্প্রসারিত করেন বুদ্ধদেব বসু *অনাম্নী অঙ্গনা*তে – তাতে সঞ্চালিত করেন তাঁর কামসংক্রান্ত উপলব্ধির ভিন্নতর উদ্ভাসন।

অনাম্নী অঙ্গনায় যে প্রধান এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাঁর পৌরাণিক পরিচয় হস্তিনাপুর রাজপ্রসাদের ' অপ্সরোপমা এক দাসী'মাত্র, যে কখনো দাসী, কখনো শূদ্রাণী রূপে *মহাভারতে* উল্লেখিত। বুদ্ধদেব বসুও তার নামকরণ করেননি, কিন্তু তাকে দিয়েছেন নামাতিরিক্ত এক পরিচয় – *অনাম্নী অঙ্গনা*, যা শিল্পীর রোম্যান্টিক প্রযত্নের স্মারক। নামের মতোই চরিত্রটিও নাট্যকারের যত্ন-কল্পিত। নাট্যরম্ভেই অঙ্গনার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে তার গান নিয়ে, যে গানে স্বনিত হয় তার স্বপ্ন - এক সুঠাম তন্তুবায় যুবক, আপন ঘর আর তেঁতুল তলার ছায়া দিয়ে রচিত তার ছোট্ট, সুখদ, অনার্য জীবনের স্বপ্ন –

অঙ্গনা

অনেক দূরে ছোট্ট এক কুটির,
খড়ের চালে রৌদ্র জ্বলে সোনা,
সামনে উঠোন, খিড়কিদোরে পুকুর,
তেঁতুলতলায় শিউরে ওঠে ছায়া:
– দূর অনেক দূর।

কিন্তু, তার স্বপ্ন বিস্বাদ হয় দাসীত্বের শৃঙ্খল স্মরণে। দাসত্ব তার স্বপ্নের শৃঙ্খল অথচ একটি মাত্র সংঘটনে এই দাসীত্বই তার কাছে হয়ে ওঠে বরণীয়। অঙ্গনার এই রূপান্তরই এই নাটকের বুদ্ধদেব বসুর অন্বিষ্ট। বেদব্যাস, যিনি কবি, মেধাবী, স্বাধ্যায়বান, তিনি ক্ষেত্রজ উৎপন্নের ক্ষেত্রে রাজবধূদের রতির পক্ষে উৎকট, পীড়াদায়ক, ভীতিকর। যার ফলশ্রুতিতে জন্মে ক্ষেত্রজ দুই বিকলাঙ্গ রাজপুত্র – ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু – একজন জন্মান্ধ, অপরজন শক্তিহীন, পাণ্ডুগাত্র। আর সেজন্যই কুরুকুল রক্ষায় মরিয়া সত্যবতীর নির্দেশে পুনর্বার সেই বীভৎস রতিকৃত্যে অসম্মত অম্বিকা সেই শয্যায় তার বিকল্পরূপে প্রেরণ করে অঙ্গনাকে, যে চেয়েছিল 'দাসীত্ব থেকে মুক্তি আর মন্ত্রপূত বিবাহের বন্ধন'। রাণীর ছদ্মবেশে জন্তুর মতো সে প্রেরিত হয় ভীষণকায় ব্যাসদেবের শয্যায়, পরিকল্পিতভাবে। কিন্তু এই কাম, যা ছিল অম্বিকার কাছে আত্মরক্ষার উপায়, তাই অঙ্গনার নিকট হয়ে ওঠে মোহনীয়, অনির্বচনীয়, অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা – ভীতি নয়, পীড়া নয়, কামের মধ্য দিয়ে সে অর্জন করে এক অনাস্বাদিতপূর্ব উপলব্ধি –

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গনা

আমার স্মরণ যেন বিপর্যস্ত। বলতে পারবো না
কখন জেগে ছিলাম, কখন স্বপ্নে, কখন তন্দ্রায়।
অন্ধকারে
একবার তাঁর দৃষ্টি আমাকে বিঁধলো – ভীষণ, উজ্জ্বল
অগ্নিকুণ্ডের মতো চক্ষু। একবার তাঁর বাহু
অশ্বত্থের জটার মতো লম্বিত হ'লো আমার দিকে।
একবার তিনি অরণ্যের মতো
আমাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়লেন। নীড়ের মধ্যে পাখির মতো
আমার মুখ –
হারিয়ে গেলো তাঁর শশ্রুদামের তৃণে, দূর্বায়, পল্লবে।
আর আমার দেহ
যেন আমার সঙ্গে বিবাদ ভুলে হ'য়ে উঠলো মধুর।

ঋষির সঙ্গে অঙ্গনার প্রথম কামের স্মৃতি স্নিগ্ধ হয়। সে উপলব্ধি করে নারীদেহের রহস্য, উপভোগ করে আপন নারীত্বের আস্বাদ। সমালোচক দীপেন্দু চক্রবর্তী অঙ্গনার এই কামের অভিজ্ঞতাকে বলেন 'এক ক্রীতদাসীর' 'উচ্চবর্ণের এক ধর্ষকামী পুরুষের সঙ্গলাভ' এবং বুদ্ধদেব বসুর এই রূপায়ণের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বলেন – 'তিনি নিপীড়িত নারীর চেয়েও যৌনতার অন্য এক দার্শনিক বয়ানে বেশি আগ্রহী', যা 'ভাবালুতা'-আক্রান্ত এবং বাস্তবতাকে রোম্যান্টিক রূপ ধারণ করায়।[৫] দীপেন্দু চক্রবর্তী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি মূল্যায়ন করেন এবং বুদ্ধদেব বসুর নাট্য প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু বরাবরই সমাজতন্ত্র বা যে কোনো মতাদর্শ থেকে মুক্ত শিল্পী। সামাজিক বাস্তবতাই সাহিত্যের একমাত্র অভিপ্রায় হতে পারে না – একথা বারংবার বুদ্ধদেব বসু নিজ মুখে উচ্চারণ করেন। সমকালেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ নতুন কবিদের সাথে তাঁর মতাদর্শগত পার্থক্য তৈরি হয়ে যায় এই সূত্রে। বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন – 'কবিতা এক গাঢ়তর বোধের জগৎ, ভাত-ভাত বলে সরল চিৎকার করলেই সেটা কবিতা হয় না।'[৬] ফলে, দীপেন্দু চক্রবর্তীর সমালোচনা যতই রূঢ় বা বাস্তবসম্মত হোক না কেন, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে কিংবা *অনাম্নী অঙ্গনায়* বুদ্ধদেব বসু কেবল 'যৌনতার দার্শনিক বয়ানে আগ্রহী'- এ মূল্যায়ন খণ্ডিত, একদেশদর্শী। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'কাম' হতে পারে নরনারীর বিশুদ্ধ চেতনায় বিবর্তন বা উদ্বর্তনের মাধ্যম – এই সত্যই বুদ্ধদেব বসুর কাম ভাবনার মর্মকথা। *অনাম্নী অঙ্গনায়* সামান্য শূদ্রাণীর চেতনার উন্মীলন ঘটে কামস্পর্শে। তার স্বপ্ন-প্রার্থনার ঘটে আমূল পরিবর্তন, যেন জন্মান্তর সাধিত হয়। কারণ, বেদব্যাসের আশীর্বাদে সে আপন কন্দরে ধারণ করে এক সম্ভাবনাময় জন্মের অঙ্কুরকে, যিনি হবেন ধীমান ও প্রজ্ঞাবান – একদিন যুদ্ধমত্ত পৃথিবীতে যিনি শান্তির দূত রূপে প্রণম্য হবেন। তাই দাসত্বমুক্তি নয়, আপন ঘরের স্বপ্ন নয়; গৌরবময় মাতৃত্বে অভিষিক্ত হবার স্বপ্নে দাসীত্বই কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে অঙ্গনার নিকট। এক সুদূরপ্রসারী চরিতার্থতার স্বপ্নে, এক ভবিষ্যত সম্ভাবনার সাধনায় সে আত্মপ্রতিশ্রুত –

অঙ্গনা

না দেবী, পুত্রের জন্য নয় –
আমার নিজেরই জন্য। আমি দেখতে চাই দূরযাত্রীকে তীরে
দাঁড়িয়ে,
দেখতে চাই আকাশে আমার জয়ধ্বজা –
একমাত্র ধবলতার সংকেত -
ঘোর যুদ্ধে পৃথিবী যখন রক্তাক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সে :
নম্র, মৃদুভাষী, ধীর –
(তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত)
পিতার মতো বিদ্বান, মাতার মতো নেপথ্যচারী,
মাতার মতো দীনতায় ধন্য, পিতার মতো উদাসীন,
ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মন অথবা শূদ্র নয়,
নয় শত্রু বা মিত্র, সংসারী বা সন্ন্যাসী :
এক অখণ্ড ভাবনায় মগ্ন,
ভুক্তভোগী, তবু সুদূর –
আমার স্মরণচিহ্ন, আমার প্রমাণ, আমার অভিজ্ঞান
তাই, দেবী,
আমার পক্ষে দাসীত্ব আজ বরণীয় গুণ্ঠন,
নামহীন অস্তিত্ব এক দুর্গধাম,
যার অন্তরালে আমার বীজময় রাত্রি –
বিনা বিক্ষেপে, বিনা অপব্যয়ে –
ফ'লে উঠতে পারে গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালি ধানের মতো,
আমারই মধ্যে উৎপন্ন, কিন্তু ভোক্তা যার ভবিষ্যৎ।

অঙ্গনার কক্ষে লালিত এই সন্তানই ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'বিদুর' নামে খ্যাত, যিনি স্বয়ং ধর্মরাজের প্রতিরূপ, যিনি 'কলহের দ্বারস্বরূপ, বিনাশের মুখ স্বরূপ', কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মূলকারণ যে দ্যূতক্রীড়া, তাতে বাধাদানকারী এবং সর্বোতভাবে শান্তিকামী ও প্রজ্ঞাবান পুরুষ বলে খ্যাত। এই ভবিতব্যকে স্পর্শ করার স্বপ্নেই অঙ্গনা তার পূর্বস্বপ্নছিন্ন। বিশ্বস্বার্থের জন্য ব্যক্তিস্বার্থত্যাগী অঙ্গনার মহত্তর উদ্ভাসনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-অস্তিত্বের সাথে ব্যষ্টি-অস্তিত্বের এক সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন করেন বুদ্ধদেব বসু। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বৃহৎ পৃথিবীর কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত করেন আর কামই সেই মহৎ উত্তরণের মাধ্যম। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণী বেছে নেয় নৈঃসঙ্গের পথ, কিন্তু অঙ্গনা নির্বাচন করে সর্বকল্যাণ সাধনের মহান এক দায়িত্ব। বুদ্ধদেব বসুর *অনাম্নী অঙ্গনা* তাই ব্যক্তির রূপান্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সম্পৃক্ত হয় বিশ্বকল্যাণের সাথে। এভাবে বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনার দু'টি ভিন্ন উত্তরণ নিয়ে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং *অনাম্নী অঙ্গনা* স্বতন্ত্র মহিমায় অনবদ্য দুই শিল্প।

কালসন্ধ্যা
সৃষ্টি-ধ্বংস-পুনরুজ্জীবনের শিল্প

মহাভারতের ''মৌষলপর্ব''র দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংসের বর্ণনা থেকে আহৃত বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* নাটকের আখ্যান। এ নাটকে বুদ্ধদেব বসু অবলম্বন করেন ভয়াবহভবে সংঘটিত 'একটি সম্পূর্ণ সভ্যতার ধ্বংস' এবং 'মানুষিক বুদ্ধি ও চেতনার সার্বিক ও প্রতিকারহীন নির্বাপণ।'[৭] আর এই ধ্বংস ও অবক্ষয়ের বাস্তবতায় *কালসন্ধ্যা* নাটকে বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠা করেন মহাকালের বৈনাশিক রূপ ও তার ধ্বংস-পুনঃসৃষ্টির প্রতীতি।

চলমান সভ্যতায় কখনো কখনো নামে আকস্মিক ছন্দঃপতন। সভ্যতাকে রক্ষার প্রয়োজনেই ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। সংহারক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মহাকাল। তখনই পৃথিবীতে নামে কালসন্ধ্যা। বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্যে –

> বিরতিরও প্রয়োজন ঘটে মাঝে-মাঝে, আসে মাঝে মাঝে সন্ধিলগ্ন যখন কালের ঘূর্ণন যেন মুহূর্তের জন্য থেমে যায় - যখন সব যুদ্ধ সমাপ্ত, সব উদ্যম নিঃশেষ, পৃথিবীর বীর বংশ লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়, কোথাও

Dhaka University Institutional Repository

নেই কোনো সংকট বা সংঘর্ষ, এবং কোনো নতুন সূচনারও ইঙ্গিত নেই। আসে এমন সময়, যখন 'সংগ্রহ' ও 'সংহার' সমার্থক হ'য়ে ওঠে, পূর্ণ হয় কোনো-এক বৃত্ত, বিশ্ব সংসারে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই প্রয়োজন ঘটে ধ্বংসের।[৮]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছত্রিশ বছর নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হবার পর পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকায় নামে এইরকম একটি সন্ধিক্ষণ। আর পৌরাণিক সেই ধ্বংস-কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অন্তঃসঞ্চালিত করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক অবক্ষয়, জীবনের অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধের বিপন্নতা, ব্যক্তির নিঃসহায়তা এবং তার দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য-সংঘাতের বাস্তবতা। আধুনিক কবি যাকে বলেছেন 'অশ্লেষার রাক্ষসীবেলা', আদিকবি যাকে বলেছেন 'কালবিপর্যয়নিবন্ধন', বুদ্ধদেব বসু তাকেই বলেন কালসন্ধ্যা এবং যে দর্শনটি দ্বারা এই ত্রিকাল এক বিন্দুবদ্ধ হয়, তা হলো সুবৃহৎ কালচেতনা। তাই বুদ্ধদেব বসু নাটকের ভূমিকাতেই এর ব্যাপ্তি নির্দেশ করেন – 'বলা বাহুল্য, দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহুদূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব-ইতিহাসের একটি আদিসত্য বিরাজমান।'[৯] বুদ্ধদেব উল্লেখিত এই আদিসত্য বা রিচুয়াল, যা আজও প্রবহমান এবং রূপান্তরিতভাবে ভবিষ্যতেরও অলিখিত নির্বন্ধ, তা হলো বিপুল, ব্যাপ্ত, নির্মোহ, নির্দ্বিধ, সুমহান কাল – যা প্রত্যক্ষের অতীত অথচ সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রক – সভ্যতার রক্ষা, ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবন যার অধীন – একই সাথে 'লোকসংগ্রহ' ও 'লোকসংহার' যার কর্ম, সেই প্রবৃদ্ধ কাল, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যার মানবমূর্তি। *কালসন্ধ্যা* নাটকে যদুবংশের ধ্বংসকে বুদ্ধদেব বসু কোনো আকস্মিক বিপর্যয়রূপে চিহ্নিত করেননি, বরং তাকে সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতরূপে উল্লেখ করেন। এই ধারাবাহিকতা একদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্মৃতিতে অতীতস্পর্শী, অপরদিকে তা ভাবীকালের সম্ভাব্য সত্যরূপে দূরপ্রসারী। কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের দুই যুগ পর সংঘটিত দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস এ নাটকের প্রেক্ষাপট। *মহাভারত* অনুসারে এ সংঘটন গান্ধারীর অভিশাপ কিংবা নারদ ও কণ্বমুনির ব্রহ্মশাপের ফল বলে বিবেচিত হলেও এ নাটকে সেসব প্রতীকী মূল্য বহন করে মাত্র। *কালসন্ধ্যায়* যদুবংশের ধ্বংস কোনো নিয়তি-নির্ধারিত বিষয় নয়, বরং ঘটমান বাস্তবতারূপে চিত্রিত। এরকম একটি ভয়াবহ বিপর্যয় সাধনের সমস্ত কার্যকারণ এখানে উপস্থিত – সমুদ্র গর্জনে, আকাশে কালোমেঘের সংকেতে, দুর্যোগের পূর্বাভাসে, দ্বারকাবাসীর পরস্পর কলহে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে, ও বিলাসমত্ততায়। 'পূর্বরঙ্গে' দুই বৃদ্ধের কথোপকথনে দ্বারকাপুরীতে প্রথম শঙ্কা ও দুর্লক্ষণের প্রসঙ্গ আসে। কারণ, তারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আর বীভৎস অতীতকে ভুলে উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের আশায় ক্ষীণজীবী। কিন্তু তাদের সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে 'চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান' – ঠিক যেমন বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভস্মস্তূপ থেকে জ্বলে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন, মাত্র একুশ বছরের ব্যবধানে। মূলত ''মৌষলপর্ব''কে বুদ্ধদেব বসু মনে করেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এক সংক্ষিপ্ত অনুবৃত্তি, এক উপসংহার – ''মৌষলপর্ব'টি কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের এক সংক্ষেপিত ও ভীষণতর পুনর্লিখন অথবা এক মর্মভেদী মন্তব্য, সেই দীর্ঘায়িত ঘটনাবলির সারাৎসার – তার ব্যাখ্যা, তার সর্বশেষ পরিণাম।'[১০] অর্থাৎ 'মৌষলপর্ব'টি মহাকলের একটি অসম্পূর্ণ নাট্যের শেষাংশ। ফলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্মৃতি দ্বারকাবাসীর মধ্যে এক স্নায়ুবিক বিভীষিকা নিয়ে তখনো বর্তমান, তাদের অস্তিত্ব থেকে তা অমোচনীয়। দিনরাত অসংখ্য অভিশাপ তাদের তাড়িত করে ফেরে। যারা জীবিত, তারা যন্ত্রণার পুনর্জন্ম থেকে বিস্মরণপ্রার্থী। এক অনমনীয় পাপবোধে তারা মানসিকভাবে আকান্ত। ফলে ভ্রান্তি, আধ্যাস, দুঃস্বপ্ন তাদের স্বাভাবিক জীবনকে করে তোলে বিপর্যস্ত। বিশুদ্ধ অন্নে তারা প্রত্যক্ষ করে অগণিত কীটের অস্তিত্ব, দুঃস্বপ্নে অনুভব করে মুষিক-দংশন, ছাগলের ডাকে তারা শোনে শৃগালের অশুভ চিৎকার। এইসব দুঃস্বপ্নকে ভুলে থাকার মরিয়া প্রয়াসে তারা নিমজ্জিত হয় নির্লজ্জ কামোল্লাসে ও মদমত্ততায়। নগরে, প্রভাসতীর্থে নারী-পুরুষ পরস্পর লিপ্ত হয় অজাচারে আর অপরিমেয় মদ্যপানে। আর যারা নির্বিকার এবং নির্বিচারী নয়, তারা ভীত প্রতিহিংসার ভয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সুভদ্রার আশঙ্কায় –

সুভদ্রা

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হ'লে
বিধবার আর্তনাদ, মাতার ক্রন্দন,
ভীষ্মের অনুশাসন, মৈত্রীর স্বাক্ষর;
তারপর অশ্বমেধ, বানপ্রস্থে গেলেন বৃদ্ধেরা,
কেটে গেলো ছত্রিশ বৎসর।
তবুও কি স্থিতি নেই – ক্ষমা নেই?
তবু প্রতিহিংসার?

ক্রমশ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ করে যদুকুলের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয় হনন-স্পৃহা। মদিরার উত্তুঙ্গ চূড়ায় সাত্যকি উল্লেখ করে কৃতবর্মা কর্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের হননের নির্মম ইতিহাস। নিন্দারোষে প্রজ্জ্বলিত কৃতবর্মা স্মরণ করিয়ে দেয় সাত্যকি কর্তৃক ছিন্নবাহু, ধ্যানমগ্ন ভূরিশ্রবার হননের নৃশংসতা। এভাবে তাদের অবচেতনে রক্ষিত পূর্বাপাপ উন্মোচিত হয়, পুরানো ক্ষোভ উন্মথিত হয় নতুন করে, তিক্ত হয় কলহ। সাত্যকি-কৃতবর্মা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিপরীত পক্ষের দুই অবশিষ্ট সৈনিক হত্যা করে পরস্পরকে, বরণ করে তুচ্ছ মৃত্যু। ক্রমশ এই জিঘাংসার আগুন ব্যাপ্ত হয় দ্বারকাপুরীর সর্বত্র। বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকেরা নির্বিচারে জ্ঞাতিক্ষয়ের অন্ধ উন্মাদনায় মাতে। কৃষ্ণের কবিত্বময় প্রেক্ষণে-

কৃষ্ণ

বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকেরা আরম্ভ ক'রে দিলেন
নির্বিচারে পরস্পরে অস্ত্রাঘাত।
প্রদ্যুম্ন, রুক্মিণীপুত্র, অচিরাৎ ধুলায় লুটালো।
হত শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ
ইত্যাদি জ্ঞাতির – দ্রুত – পরম্পর কিংবা যুগপৎ –
যেন ঝরে শুকনো পাতা অবিরল চৈত্রের বাতাসে,
অথবা ঝঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম।
পিতা করে পুত্রের মস্তক চূর্ণ, পুত্র মাখে পিতার শোণিত অঙ্গে,
কেউ হানে নিজের কণ্ঠেই খড়্গ।

বুদ্ধদেব বসু '*মৌষলপর্বে*'র জ্ঞাতিধ্বংসের ঘটনার সাথে প্রতিসাম্য অনুভব করেন ইস্কিলাস রচিত গ্রিক নাটক 'থেবাই - এর বিরুদ্ধে সাতজন'- এ রাজত্বকে কেন্দ্র করে মর্মঘাতী ভাতৃহত্যার ঘটনার সাথে, যা সংঘটিত হয়েছিল অয়দিপৌসের অভিশাপে।[১১] 'মৌষলপর্বে'র এ ইতিহাস আরো ভয়াবহ, মর্মন্তুদ, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সংঘটিত স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা।

কালসন্ধ্যা নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক শুরুর পূর্বেই এই ভয়াবহ জিঘাংসাকৃত্য সমাপ্ত হয়। কৃষ্ণ হন্তারক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে ত্বরান্বিত করে। তাঁর হাতে তুলে নেয়া তৃণ পরিণত হয় বেগবান বজ্রতুল্য মুষলে, মুর্হূতে নিঃশেষ হয় যদুবংশ। কৃষ্ণের এই লোকক্ষয়কারী ঈশ্বরত্বের অন্তরালে বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেন 'এক ভূষণরিক্ত জীবনক্লান্ত পুরুষকে', এক বৃদ্ধ কাণ্ডারীকে, যিনি তাঁর কুল-ধ্বংসের উন্মাদনায় নির্লিপ্ত দর্শক – যদুবংশের নৈতিক অবক্ষয়ে তিরস্কারোদ্যত নন, তাদের পতনেও নির্মোহ, উদাসীন, অনুগ্র; এক দার্শনিকের মতো। কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী কৃষ্ণই মহান কালাবতার। নিজের সেই মহাকালরূপী কালান্তক সত্তাকে তিনি উপলব্ধি করেন দ্বারকাপুরীর এই প্রলয়ংকরী সন্ধ্যায়, তা ব্যক্ত করেন অর্জুনের নিকট –

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ

তবু-সেই অনুভূতি! – যেন এক সত্তা আছে,
অন্য কিছু নেই, আছে একমাত্র সেই সত্তা –
পায় না বৃদ্ধি বা ক্ষয়, জন্মে না, মরে না,
একবার অস্তিত্ব সম্ভব হ'লে কোনো কালে ঘটে না বিলয়;
যার মুখগহ্বরে অনন্তকাল ধ'রে
যুগপৎ উপস্থিত বর্তমান, অতীত ও ভাবীকাল,
জড়, প্রাণ, জীবিত, মৃতেরা।
আর সেই সত্তা যেন –
(মৃদ হেসে)
আমি!

কৃষ্ণের এই সংহার ও সংহারক চৈতন্য কবিত্বময়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো তা স্থূল নয়, বক্র নয়, এক জীবন-সন্ধিৎসু দার্শনিকের প্রলাপের মতো অভ্রান্ত তাঁর উপলব্ধি। *কালসন্ধ্যা* নাটকে ব্যাসদেবের পূর্বে একমাত্র তিনিই মূর্তিমান কাল হয়ে তার স্বরূপ ব্যক্ত করেন। কাল স্থির নয়, যা এই মুহূর্ত; তাই পরবর্তী মুহূর্তে বিলীন হয়। মৃত্যুর জন্য শোক তাই অনর্থক। কারণ কৃষ্ণের উপলব্ধিতে –

কৃষ্ণ

জন্ম থেকে সকলেই মৃত, চিরকাল সকলেই মৃত,
জীবিত ও মৃতে কোনো ভেদ নেই।

গতি, আবর্তন, পুনরাবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় জীবন ও মৃত্যু স্বাভাবিক। মৃত্যু বা ধ্বংসও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। কারণ, তা না হলে জীবনের স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায়, ইতিহাস পূর্ণ হয় না, ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। করুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দ্বারকাবাসী ভেবেছিলো প্রলয়ের অবসান হয়েছে। কিন্তু ধ্বংস ও জীবন চক্রক্রমিক নিয়মে পুনরাবৃত্ত হয়। দ্বারকাপুরী নিমজ্জনের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ সভ্যতা বিলীন হয়ে যায়; পূর্ণ হয় কালের ঘূর্ণন। তবু কেউ বেঁচে থাকে, কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকে, যা সভ্যতাকে পুনর্জন্ম দান করে, ভবিষ্যতকে ধারণ করে। এইভাবে চলে 'ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ এক চিরবর্তমান'। জীবনচক্রের এই আবহমান সত্যটিই বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠা করতে চান *কালসন্ধ্যায়*। সেই দর্শনই উচ্চারিত হয় কৃষ্ণের মুখে –

কৃষ্ণ

ধরো, যদি দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়,
লুপ্ত হয় আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য,
যদি ঘটে প্রলয়, তবুও –
কিছু থাকে – কী থাকে ভাবো।
যদি ভাবো, যদি ভেবে দ্যাখো,
কিংবা যদি কখনো নিজেরই মধ্যে ডুবে যাও, গভীর, গভীরতর
হয়তো বা অগ্যতা উত্তর পাবে;
যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত
যা নেই, কখনো ছিলো না।

দ্বারকাপুরীর নিমজ্জন ও কৃষ্ণের ধ্বংস-পুনরুজ্জীবনের এই উপলব্ধির মধ্যে পাশ্চাত্য *flood myth* বা বন্যা-পুরাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার সম্ভব। বিশ্বপুরাণে বন্যা জন্ম-ধ্বংস ও পুনর্জ্জীবনের প্রতীক। কারণ, তা সবকিছু ভাসিয়ে নেয়, শুধু

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষণ করে নতুন জন্মের বীজ, নতুন সূচনার নিমিত্তে। ব্যাবিলনীয় এবং হিব্রু পুরাণে এই প্রতীক বহুল ব্যবহৃত। ভারতীয় পুরাণে কালী ও মনুর মিথও একই তাৎপর্য বহন করে। হিব্রু পুরাণে বন্যা হলো সংহার মূর্তিধারী এক 'মহান মাতা' (*Great Mother*), যিনি প্লাবনের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেন যে, জীবন মৃত্যু-নির্ভর; মৃত্যু ছাড়া জন্ম হয় না, পূর্ণ হয় না জীবনবৃত্ত –

> The Deluge cleanses and gives birth to new forms even as it destroys the old. It is the breaking of the eternal waters of the Great Mother — the destructive mother who, whether her name is 'Kali' or 'Demeter' sweeps aways the old life but preserves the germ of a new begining. The 'Noah' or the 'Utnapishtim' or the 'Manu' who is spared the hero of new life who is born of the cosmic waters of the womb of the great mother. The flood myth, like the myths of the destroryer mother herself, reminds us that life depends on death, that without death there can be no cycle, no birth.[১২]

শুধু দ্বারকাপুরী নয়, স্বয়ং কৃষ্ণ, যিনি সংহারক, তিনিও সংহারের উর্ধ্বে নন। ব্যাধের এক তুচ্ছ বাণে তাঁরও অন্তর্ধান ঘটে। কারণ, কালের বিচারে 'মহৎ প্রতিভাও দণ্ডনীয়'। মহাকালের পরাক্রম কেড়ে নেয় অর্জুনের বীর্য, অহঙ্কার। হতবাক পার্থের সামনেই দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় যদু বংশের নারীরা, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আত্মদান করে তাদের কাছে। পরাস্ত, বিধ্বস্ত ও জীবন্মৃত অর্জুন নতশিরে দণ্ডায়মান হয় ব্যাসদেবের সম্মুখে। আর তখনই নাটকের 'উত্তর কথনে' অর্জুনের প্রতি উপদেশের সূত্রে ব্যাসদেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সমস্ত সংঘটনের উৎস ও সার –

ব্যাসদেব

তুমি পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো
অন্তত বিনয়, দৈন্য আত্মসমর্পণ।
শেখো:
অনাচার, সদাচার, ধর্মাধর্ম সব আপতিক
যা-কিছু সময়োচিত, তাই যথাযথ।
শেখো:
কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে, যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য ঘাতকের স্থান-বিনিময়।
অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়, বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই, সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।

ব্যাসদেব বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত অর্জুনকে জানান যে, পৃথিবীতে কেউ বা কোনো কিছুই নশ্বর নয়। জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয়-লুপ্তির বাস্তবতায় 'কালের ভূর্জপত্র', যা 'অবিরল নবজাত' যা বেঁচে থাকে পৃথিবীর নতুন, নতুনতর মানুষের স্মৃতিতে ও তাদের সৃষ্টিতে – তাই কেবল সত্য – তাই 'চিরবর্তমান'। কারণ 'মানব – ইতিহাসের আদিসত্য এই যে, প্রতিটি সভ্যতার মানবকীর্তি অবিনশ্বর হয়ে থাকে ইতিহাসের পাতায় পাতায় – বর্জাইস অক্ষরে। আজ যে – সভ্যতা অবলুপ্তির কালবৃত্ত সম্পূর্ণ করলো – সেটিই মানব-সভ্যতার শেষ চিহ্ন নয়। নতুন সভ্যতার কালবৃত্তের নতুন চিহ্নও সেদিন থেকেই শুরু হয়। মানব-সভ্যতা নানা রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বৈনাশিক কালকে অতিক্রম করে অনাগতের দিকে যাত্রা করে।'[১৩] পুরাতন কালের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয় নতুন কালের ভিত। *কালসন্ধ্যায়* দ্বারকাপুরী ধ্বংসের পর সেই কালান্তরের যাত্রায় অর্জুনের প্রতি কর্তব্যের নির্দেশনা উচ্চারিত হয় ব্যাসদেবের মুখে –

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাসদেব

ভুলে যাও বীরত্ব; যুদ্ধ ও জয়। এ মুহূর্তে
আছেন হৃতাবশিষ্ট মহিলারা –
সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা,
বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশুগণ।
তাদের স্থাপন করো অভিপ্রেত রাজ্যে বা আশ্রমে
... ...
জেনো, আজ এক বৃত্ত পূর্ণ হলো, অন্য এক বৃত্ত এর পরে
হাত আরদ্ধ এখনই।
যাত্রা করো, বিদায়

ব্যাসদেবের নিরাসক্ত উক্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরাতনের গর্ভে জায়মান নতুন সভ্যতার এই ইঙ্গিতিই সর্বকালীন ও সার্বজনীন, শাশ্বত। সেই সাথে বধ্যঘাতকের স্থানবিনিময়ও সম্ভাব্য অনিবার্য। *মহাভারতের* যদুবংশের ধ্বংসের দৃষ্টান্তে নির্মিত এই আবহমান জীবন-সত্যের মিথ-ভাষ্য বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা*।

সংক্রান্তি

কালসন্ধির কাব্যনাটক

সংক্রান্তি বুদ্ধদেব বসুর সর্বশেষ কাব্যনাটক। রচনাকাল অনুযায়ী *কালসন্ধ্যা* সংক্রান্তির পূর্ববর্তী হলেও পৌরাণিক প্রেক্ষাপট ও কালপর্ব অনুযায়ী *সংক্রান্তি* পূর্বসূত্রী। অর্থাৎ *কালসন্ধ্যা* যেখানে *মহাভারতের* 'মৌষলপর্ব'-আশ্রিত, সেখানে ছত্রিশ বৎসর পূর্বের কুরুক্ষেত্রের রক্তাক্ত প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে রচিত *সংক্রান্তি*। রচনাকালের দূরত্ব সত্ত্বেও দু'টি নাটক ভাবগত সাদৃশ্যে সন্নিকটবর্তী। বলা যায়, *সংক্রান্তি* নাটকের আখ্যান ও ভাব যেখানে শেষ, *কালসন্ধ্যার* সেখান থেকে আরম্ভ।

সংক্রান্তিতে কাব্যনাটকের নাতিবৃহৎ মাধ্যমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সুবিশাল প্রেক্ষাপটকে এক অসাধারণ শৈল্পিক কৌশলে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ রূপে উপস্থাপন করেন বুদ্ধদেব বসু। মাত্র তিনিটি চরিত্রের সংলাপে নাটকটি ধারণ করে আছে বৃহৎ প্রেক্ষাপট। যে কৌশলটি নাট্যকার প্রয়োগ করেন, তা হলো – একদিকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রয়োজনে সঞ্জয়ের বিবৃতির মধ্য দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চলমান নাটকীয়তাকে দৃশ্যমান করে তোলেন, (অবশ্য এ টেকনিক আদি কবিরই আবিষ্কার), অপরদিকে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে পুর্বসংঘটিত যুদ্ধবিবরণটির চুম্বক রূপ অবগত করেন এবং নাট্যকার তাঁর আখ্যান শুরু করেন যুদ্ধাবসানের দিন, অর্থাৎ অষ্টাদশ দিবসকে কেন্দ্র করে।) বলা যায়, অবরোহী পদ্ধতিতে নাট্যকার আখ্যানের পূর্বাপর সংরক্ষণ করেন তাঁর নাটকে। কাহিনীর শেষাংশ থেকে আরম্ভ করে এইরকম একটি পূর্ণবৃত্ত নিমার্ণ অনন্য সাধারণ – এই সংশ্লেষণ যথার্থ অর্থেই শৈল্পিক। কিন্তু নাট্যকারের দার্শনিক সংশ্লেষণ আরো বেশি অনির্বচনীয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি মহৎ বংশের অবলুপ্তির ঘটনায় নাট্যকার একটি অলঙ্ঘনীয় কালগ্রাস ও তার ফলে সংঘটিত একটি কাল-সংক্রান্তিকে চিহ্নিত করেন এবং কোনো যুদ্ধই যে ধর্মযুদ্ধ নয়, বরং মানবীয় বিপর্যয়ের নামান্তর সে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। এই ভাবনাই আমরা বর্ধিতরূপে লক্ষ করি *কালসন্ধ্যা* নাটকে, যেখানে বধ্যঘাতকের স্থানান্তরে কাল আবারো সংহারক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় কৃষ্ণরূপে – আবারো পৃথিবীতে আসে এক সন্ধিক্ষণ এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় নতুন জন্মের ইঙ্গিত। জীবন-মৃত্যু-পুনর্জন্মের ধারাবাহিকতায় একটি পূর্ণবৃত্ত প্রকাশে *সংক্রান্তি* ও *কালসন্ধ্যা* পরস্পর পরিপূরক; *সংক্রান্তিতে* যার আরম্ভ, *কালসন্ধ্যায়* তার পরিণাম নির্দেশ। বুদ্ধদেব বসুর দার্শনিক উপলব্ধির সম্পূর্ণতায় নাটক দু'টি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সন্নিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্তি নাটেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রতিরূপকে সমকালীন বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি কল্পনা করা যায়। সমস্ত পৃথিবী হিংসায় মত্ত, রণোন্মাদনায় বধির। দুই-দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় বিশ্ব মানবিকভাবে বিপর্যস্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলভোগ সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে পড়ে অনিবার্য। অপ্রতিরোধ্য এই কালগ্রাস, অপরিমেয় তার ক্ষতিসাধন। যদিও বুদ্ধদেব বসু পূর্বাপর নির্বিপ্লবী ও রাজনীতি-বিবিক্ত এবং রাজনীতি মানে তিনি মনে করেন 'কপটাচরণ, ক্রূরতা, ধূর্ততা, ক্ষনিকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধ্রুব আদর্শের অবমাননা', তবু বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিজম, সভ্যতার সংকট বুদ্ধদেব বসুকে বিচলিত করেনি, তা নয়। তাঁর উপলব্ধিতে –

> বাণিজ্য-মন্দার জোয়ারে যখনি ভাটা পড়ে এলো, তখনই দেখলুম ইটালি আবিসিনিয়ার গলা কাটবার জন্য ছুরি শানাচ্ছে। বর্তমান মহাযুদ্ধের সেই তো আরম্ভ। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হ'লো জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয়। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলুম একটা সুসভ্য, উন্নত মহৎ জাতি নিজেদের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অমূল্য উত্তরাধিকার পায়ে ঠেলে ফেলে বর্বরতার কাঁটাওলা বর্ম পরে বীভৎস মূর্তিতে দাঁত ঘষছে। ... বোঝা গেলো, পৃথিবীতে লোভ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; বিশেষ একটি শ্রেণির স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখবার জন্য শুধু যে দুর্বল বিদেশী জাতির উপরেই অত্যাচার চলে, তা নয়, স্বজাতিকেও রক্তস্রোতে ভাসানো হয়; শুধু যে বিদেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিজেদের উন্নতিসাধন করা হয় তা নয়, নিজের দেশের মধ্যে যারা মুক্তির আদর্শ মানেন, যারা সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁদের বধ করতে লুব্ধতার ছুরি সর্বদাই উদ্যত।[১৪]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই ক্রূরতা, অমানবিকতা ও প্রকারন্তরে আত্মবঞ্চনার আবেদনটিই অন্তঃশীল *সংক্রান্তি* নাটকে এবং বুদ্ধদেব বসুর মহাকাল-চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে তা মহত্তর ব্যঞ্জনাপ্রাপ্ত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমগ্রতাকে ধারণ করলেও *সংক্রান্তি* নাটকের আখ্যান শুরু হয় *মহাভারতের শল্যপর্ব* থেকে এবং যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসকে অর্থাৎ শেষ দিনকে কেন্দ্র করে। সেখানে সঞ্জয় চলমান যুদ্ধের বিবৃতিকার এবং ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতা ও মন্তব্যকারী। নাটকে সঞ্জয় যুদ্ধ-বিবৃতি শুরু করার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে শোনা যায় যুদ্ধের পূর্ব বিবরণ – কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষের বীরদের ভূলুণ্ঠিত হবার ইতিহাস-চুম্বক। ধৃতরাষ্ট্রের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি দশম দিনে কৃষ্ণাশ্রয়ী অর্জুন কর্তৃক শরশয্যায় আলম্বিত হন ভীষ্ম। চৌদ্দতম দিনে অর্জুনের দ্বারাই অতর্কিতে ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন ঘটে এবং সাত্যকি কর্তৃক সেই নিরস্ত্র, ছিন্নবাহু, ধ্যানাসীন ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ হয়। মায়াবলে সূর্যকে ঢেকে দিয়ে কপটভাবে পরাজিত ও বধ করা হয় জয়দ্রথকে একই দিনে। পঞ্চদশ দিনে, সুকৌশলে মিথ্যার দ্বারা পুত্র শোকে শিথিল করে প্রতিহত করা হয় দ্রোণকে, সপ্তদশ দিনে রথচক্রকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে কৃষ্ণের সাহায্যে অর্জুন অন্যায়ভাবে শিকার করে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণকে। এভাবে কুরুপক্ষের অমিতবীরবৃন্দ ভূলুণ্ঠিত হয় পাণ্ডবদের শাঠ্য, বক্র-কৌশল ও রণনীতি ভঙ্গের দ্বারা। কৌরব পক্ষও নিষ্কলঙ্ক নয়।) বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নে 'কৌরব পক্ষের একটিমাত্র সামরিক কলঙ্ক অভিমন্যুবধ' – একজন নিঃসঙ্গ তরুণ বীরকে চক্রব্যূহে বদ্ধ করে বধ করার ঘটনাও অমানবিক ও হৃদয়বিদারক কম নয়। এভাবে যাকে ইতিহাসে বলা হয় ধর্মযুদ্ধ, তা আসলে শাঠ্য, প্রবঞ্চনা আর বর্বর উত্তেজনার নামান্তর। যে যুদ্ধ আজ অপ্রতিরোধ্য, তাও একদিন শেষ হয়, শোক নির্বাপিত হয় কিন্তু তার ফলস্বরূপ জয়ী হয় মৃত্যু, কালের শিকার হয় অগণিত মানুষ। আর মহাকাল মিটিয়ে নেয় তার অনিঃশেষ ক্ষুন্নিবৃত্তি। সঞ্জয়ের বিবরণে –

সঞ্জয়

দুই পক্ষের যোদ্ধারা –
ভারতবর্ষের সন্তান, ঐরাবতবর্ষের সন্তান –
ব্যূহভ্রষ্ট, ছত্রভঙ্গ, বিশৃঙ্খল,
আর্ত, বিস্রস্ত জনতা –

Dhaka University Institutional Repository

হননশীল
পলায়নশীল
মরণশীল –
মৃত্যু অবশেষে জয়ী শুধু মৃত্যু,
মহাকালের খাদ্য আজ প্রচুর-
এই সুন্দর অগ্রহায়ণে
ক্ষেত্র থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ পরিপক্ব ধ্যানের মতো
দেহ থেকে উৎপাটিত জীবাত্মা –
গণনার অতীত, বেদনার অতীত, বিমিশ্র –
তারা কথা বলতো ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, এখন একইভাবে স্তব্ধ।

মহাকালের এই সন্ধিক্ষণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ শিকার দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে প্রধান এবং কুরুপক্ষে একমাত্র জীবিত বীর। যুদ্ধক্লান্ত, অবসন্ন, বিশ্রামপ্রার্থী দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদের শক্তিবর্ধক পবিত্র জলে নেমে নিজেকে পুনঃসক্রিয় করতে চায়। পাণ্ডবেরা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে তাকে হ্রদের আশ্রয় থেকে টেনে তুলে আনে। যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে তার উরুভঙ্গ করে ভীমসেন, বাল্যস্মৃতিও যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সংবেদনা জাগায় না। অন্যায়ভাবে দুর্যোধনকে বধ করে পাণ্ডবপক্ষ, ধর্মেও অধর্মে কৃষ্ণ যাদের সহায়। এই যুদ্ধ, যা কেবল শত্রুসংহারকৃত্য নয়, বরং এক আত্মঘাতী উন্মাদনা; শঠতা, ক্রূরতা, বিশ্বাসভঙ্গ যার ভিত্তি, বেদনা যার একমাত্র অর্জন – সেই যুদ্ধ কারো কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। *সংক্রান্তি* নাটকে মহাযুদ্ধের এই ভয়াবহতাকে উপস্থাপন করে বুদ্ধদেব বসু তাঁর যুদ্ধ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটান সত্যদর্শিনী গান্ধারীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে –

গান্ধারী

যুদ্ধ অন্যায়, যুদ্ধ নিবারণীয়।
কিন্তু একবার আরম্ভ হ'লে
পাপ থেকে জ্ব'লে ওঠে পাপ,
ছড়িয়ে পড়ে হিংসা থেকে প্রতিহিংসা,
চিত্তভ্রংশ থেকে চিত্তভ্রংশ –
অপরাধহীন কেউ থাকে না।
কিন্তু কেন যুদ্ধ? কেন এই পরিকীর্ণ সন্তাপ?

মাত্র আঠারো দিনের এই যুদ্ধ জন্ম দেয় কেবল দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন, ব্যর্থতা, মনঃস্তাপ, বিষাদ ও বিস্বাদ। এ এমন এক যুদ্ধ, 'জয়পরাজয় যেখানে সমার্থক ও সমানভাবে অর্থহীন'। এ যুদ্ধ আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। কিন্তু এও সত্য যে, যুদ্ধ অনিবরণীয়, অরোধ্য; সভ্যতার সংকট ও সংক্রান্তি অবধারিত। নিরুপদ্রব বলে নেই কিছু। কারণ, হিংসা ও হননের বীজ মরে না কখনো। গান্ধারীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে নাট্যকারের সেই উপলব্ধিই উচ্চারিত –

ধৃতরাষ্ট্র

বনে, নির্জনে যেখানেই যাও,
আছে জন্ম, জীবন, জীবনের শৃঙ্খল।
শিশুরাও নিষ্পাপ নয়, গান্ধারী।
মাতার স্তন্যে সংক্রমিত হয় পাপ,
পৃথিবীর অন্নে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সব কর্মে পাপ, সব ধর্মাচরণে পাপ –
দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরে কোনো ভেদ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধাবসানেও জিঘাংসার মৃত্যু ঘটেনা; এক অদৃশ্য, অপ্রতিরোধ্য জীবানুর মতো তা ক্রমে ক্রমে সংক্রামিত করে পৃথিবীকে, ধাবিত করে আরেক ধ্বংসের লক্ষ্যে। তার দৃষ্টান্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর দ্বারকাপুরীতে যদুবংশের বিনাশ ও বিলয়ের ঘটনা। তবে, পুনর্জন্মের প্রয়োজনেই মহাকাল রোপণ করে উন্মাদনার বীজ। সংহারে প্রবৃত্ত হয় সৃষ্টি। লুপ্ত হয় সভ্যতা, ভবিষ্যত থাকে সচল। পৃথিবীতে এমনিভাবে বারবার সংক্রান্তি আসে, তবু মহাকাল চলে নির্বিঘ্নে, পরাক্রমে, ভ্রূক্ষেপহীন। সভ্যতার পর্বে পর্বে যুগান্তর সৃষ্টিকারী এই অনিবার্য সন্ধিলগ্নের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সময়চেতনাকে অঙ্গীকার করেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে। *সংক্রান্তি* নাটকে ব্যাসদেবের বরে দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের মহাকাল-বন্দনায় এই নিরাসক্ত সত্য ভাষণই উচ্চারিত –

সঞ্জয়

মহাকাল! মহান ! আমিও প্রণাম করি তোমাকে।
লোকে তোমাকে বলে দণ্ডধারী, দন্ডদাতা,
কিন্তু আমার মনে হয় স্বহস্তে তুমি সংহার করো না,
শুধু হরণ করো বুদ্ধি, রোপণ করো উন্মাদনা।
আর এমনি ক'রে ইন্দ্রগণ পতিত হন,
মানুষের ইতিহাসে আসে ক্লান্তিকাল,
মহৎ বংশ লুপ্ত হয়ে যায়।

সঞ্জয়ের মুখে বুদ্ধদেব বসুর তাঁর জীবন ভাবনাকে ব্যক্ত করেন, কারণ তিনি ত্রিকালদর্শী এবং পুরাণ-কথকের ভূমিকায়, তিনি 'একের সঙ্গে অন্য বহু মনের সংযোগ সাধক' সূত্রধার।[১৫] কাব্যনাট্যকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য থাকে সেটাই। এভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 'ভূতভবিষ্যবিৎ' সঞ্জয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী কালচেতনা শিল্পিত হয় *সংক্রান্তি* নাটকে।

প্রথম পার্থ

আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি-চৈতন্যের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা ও আত্মসংকল্পের মিথিক রূপায়ণ

কালসন্ধ্যা ও *সংক্রান্তি* নাটকে বুদ্ধদেব বসু ব্যষ্টিচেতনাকে কেন্দ্র করে মিথের রূপায়ণ ঘটান। আর এই ব্যষ্টিচেতনার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির বিপন্নতা, বিচ্ছিন্নতা ও সংগ্রামের সংরক্ত শিল্প *প্রথম পার্থ*। *প্রথম পার্থের* আখ্যান-উৎস *মহাভারতে*'র 'উদ্‌যোগ পর্ব' । কুরুক্ষেত্র যখন অবিলম্বে সংঘটিতব্য মহাসমরের জন্য প্রস্তুত, যুদ্ধের আয়োজনে উদ্ব্যস্ত উভয় পক্ষ, আর যুদ্ধের প্রশ্নে শঙ্কিত ও দ্বিধান্বিত সমস্ত জনতা, তখন ভগীরথীর তীরে নির্জন বনভূমিতে এক মহাবীর অথচ সর্বান্তকরণে নিঃসঙ্গ কর্ণের জীবনের নাটকীয় গ্রন্থিমোচন ও তার পরিণাম *প্রথমপার্থ* নাটকের উপজীব্য। *মহাভারতে*র কর্ণ, বীরত্বে যিনি অর্জুনের সাথে তুলনীয়, দানে যিনি সূর্যের মতো উদার, ত্যাগে মহিমান্বিত, যার জীবন পুঞ্জ পুঞ্জ বঞ্চনায় পরিপূর্ণ, লোকাপবাদের ভয়ে জন্মক্ষণেই মা যাকে ভাসিয়ে দেয় অশ্বনদীপ্রবাহে, রাতের অন্ধকারে আর ক্ষত্রিয়জ হয়েও যে সমস্ত জীবনে বারংবার তার বর্ণপরিচয়ের জন্য দণ্ডিত, বীরত্বে-প্রেমে-প্রাপ্তিতে উপর্যুপরি উপেক্ষিত প্রিয়জন এবং দেবতাদিদ্বারা সমভাবে – জীবনটাই যার কাছে এক যন্ত্রণাময় প্রহসন, সেই নিঃসঙ্গ, নির্লোভ, আত্মপ্রত্যয়ী, অনম্য কর্ণই বুদ্ধদেব বসুর *প্রথমপার্থ* নাটকের নামচরিত্র, কেন্দ্রীয় অবলম্বন।

মৃত্যুর মূল্যে মহত্ত্বের অধিকারী এই করুণ অথচ যশস্বী চরিত্র রবীন্দ্রনাথকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল *কর্ণকুন্তীসংবাদ* রচনায়। কর্ণের জীবনের সন্ধিক্ষণে কুন্তী কর্তৃক তার আত্মপরিচয় প্রকাশের মুহূর্তে পুত্র ও মাতার করুণ, ব্যথিত স্নেহবুভুক্ষা ও বাৎসল্য রবীন্দ্র-নাটকের উপজীব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে কর্ণ দ্বান্দ্বিক নয়, বরং রোম্যান্টিক আবেগে দ্রবীভূত; কুন্তীর প্রতি একটি মাত্র অভিযোগে উচ্চকিত, আরক্ত, ব্যথিত। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের লক্ষ্যও

Dhaka University Institutional Repository

ছিল সে পর্যন্তই। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থের* কর্ণ সীমাহীন নৈঃসঙ্গ, চূড়াস্পর্শী অহম, অনমনীয় সততা, অন্তরাশ্রায়িতা, সংগ্রামশীল চৈতন্য ও আত্মক্ষয়ী পরিণতি নিয়ে হয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব-জটিল আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি; একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদেব বসুর সমকালে কলোনীশাসিত সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদের সত্তার সংকট (*identity crisis*), তাদের অহমগত পরাভব, যোগ্যতা সত্ত্বেও অপ্রতিষ্ঠা, বঞ্চণা, যৌন-জীবনে অবদমন – এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য কর্ণ চরিত্রের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। কর্ণ চরিত্র নির্মাণে বুদ্ধদেব বসুর স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা এখানেই।

প্রথম পার্থ নাটকে কর্ণ উন্মূল, উদ্ভিন্ন এক চরিত্র; নয় বৃক্ষপ্রতীম কোনো ব্যক্তিত্ব – 'আমি চাইনা উদ্ভিদের মতো জীবন'। কর্ণ অহংপ্রবণ ও ভীষণভাবে আমিত্ব-চেতন; অদৃষ্টবাদী নয়, কর্মে আস্থাশীল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ কুরু নয়, পাণ্ডব নয় – একক, নিঃসঙ্গ ও স্বাধীনচেতা। কর্ণের আত্মোপলব্ধিতে-

কর্ণ

আমিও তা-ই ভাবি মনে-মনে: আমি কে?
পান্ডব নই, কৌরব নই –
অনাত্মীয় এক আগান্তুক, কালস্রোতে ভাসমান এক পাত্র
নির্বন্ধে ভরা, নিরুদ্দেশ, জল আর বাতাসের বেগে চালিত।
এক অনাহত অতিথি আমি হস্তিনাপুরে,
কুলগোত্রহীন, নিষ্প্রয়োজন,
দৈবক্রমে কুরুবংশের কাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট –

কর্ণের এই নৈঃসঙ্গ চেতনা, তার মানস-গঠন আকস্মিক নয়। সমস্ত জীবন ধরে বিবিধ বঞ্চণার লক্ষ্য সে। নির্জিত হয়ে হয়ে কর্ণ প্রথমে হয়েছে নিঃসহায়, সেখান থেকে নিঃসঙ্গ, নির্জনতাপ্রিয়, ক্রমশ জীবন-বিবিক্ত, আত্মচারী এবং এ সবকিছুর প্রতিকারে ক্ষমাহীনভাবে প্রতিশোধস্পৃহ। দিবাকর ঔরসে, কুন্তীর গর্ভে জন্মপ্রাপ্ত কর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছিল নদীজলে। কুমারী মাতা তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল কালস্রোতে। তারপর সারথি অধিরথের পুত্র ও রাধেয় রূপে পরিচিত কর্ণ বারবার বঞ্চিত হয়েছে তার হীনজন্মের জন্য। অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শিনীতে সমস্ত অমাত্য, জনতা ও প্রতিযোগীদের সামনে দ্রোণাচার্যের উপহাসের লক্ষ্য ছিল সে যেহেতু, অর্জুনকে হতে হবে অপ্রতিদ্বন্দী, তাই তার এই মূলোচ্ছেদ। কর্ণের গ্লানিবোধে –

কর্ণ

আমি ছিলাম অন্যতম প্রতিযোগী। কৃপাচার্য আমার বংশপরিচয়
জিজ্ঞাসা করলেন,
আমার উত্তর শুনে হেসে উঠলেন অভিজাতবর্গ।
আমি বেরিয়ে এলাম লক্ষ চোখের তলা দিয়ে,
বিনা পরীক্ষায় পরাস্ত, অবমানিত –
আমি, কুন্তীর প্রথম সন্তান।
হয়তো ভীষ্ম তা ভুলে গেছেন, যিনি আপনাদের পূজ্য,
হয়তো দ্রোণ তা ভুলে গেছেন, যিনি কুরুপাণ্ডরের গুরু,
কিন্তু – আমি ভুলিনি।

ক্ষত্রিয়জ হয়েও এই মর্যাদাহীন জীবন, প্রতিস্পর্ধী চেতনার বিপরীতে এই অবমাননা মহাবীর হয়েও স্বীকৃতিহীন সংকুচিত জীবনই কর্ণকে নিমজ্জিত করে শূন্যতায়, একইসাথে উদ্দীপ্ত করে জীবনপণ প্রতিশোধস্পৃহায়। শুধু বীরত্বে নয়, জীবনের প্রতিটি সুবর্ণ মুহূর্তে কর্ণকে হতে হয়েছে নির্জিত, উপহসিত। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাকে হতে হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থকাম। অযোগ্য নয়, শুধু অন্ত্যজ বলে স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করে কর্ণকে কেননা, অর্জুন ছিল তার বরণীয়। আবারো যজ্ঞভূমি থেকে বিতাড়িত কুকুরের মতো ফিরে আসে কর্ণ – অতৃপ্ত কামনা নিয়ে অভ্যস্ত হয় সূতনারীর সাথে সরল দাম্পত্যে। কিন্তু এই প্রতিকারহীন অবিচারে তার অবমানিত আত্মা, অবদমিত পৌরুষ, পরাহত যৌবন ব্যর্থ আক্রোশে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে করেছে দগ্ধ, বেদনাদীর্ণ, সংক্ষুব্ধ। কর্ণের যন্ত্রণাময় সংলাপে –

কর্ণ

দ্রুপদ কন্যা! –
যার চিন্তা আমাকে বহু রাত্রি বিনিদ্র রেখেছিলো,
দিনের পর দিন অশান্ত,
অপমানে দগ্ধ, প্রতিশোধস্পৃহায় অস্থির,
আর আকাঙ্ক্ষায়-আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল;
নষ্ট আশা,
ব্যর্থ পরিতাপ,
দুর্মর স্মৃতি,
আমার অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন –
ভাবিনি সেই তোমাকেই আবার চোখে দেখবো।

সেই আরাধ্য অথচ অসাধ্য পাঞ্চালীকে দ্যূতসভায় দুঃশাসন কর্তৃক বিবস্ত্র ও নিগৃহীত হতে দেখে কর্ণ স্বভাবতই উপহাস করে পঞ্চপতির উদ্দেশ্যে, যাদেরকে দ্রৌপদী বরণ করেছিলো অসৎভাবে, কর্ণকে উপেক্ষা করে – যাদের কর্মফলেই দ্রৌপদীর এ দুরবস্থা। কর্ণের কামনা, ক্রোধ ও দুঃখ তাই দুর্বিনীত উল্লাসে ঐ একটিবারের মত মুক্তি পায়। পল্লব সেনগুপ্ত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে কর্ণের এই উল্লাসকে তাঁর অবদমিত যৌন চেতনা চরিতার্থের প্রকাশ বলে উল্লেখ করেন – 'নিছক জন্মপরিচয়ের জন্য দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কর্ণের অবমাননা ঘটা এবং ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব-নির্মিত প্রাসাদে দুর্যোধনের বিভ্রান্তি দেখে তাঁকে কৃষ্ণসখীর বিদ্রূপ করা – এই দুটি কারণে ঐ দুই মহাবীর দ্রুপদতনয়ার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেনই। আবার তাঁর অসামান্য রূপলাবণ্যের মোহনীয়া আকর্ষণও তাঁদের নির্জিত করেছে চিরকাল। ... দ্রৌপদীকে নগ্ন করতে চাওয়া, কিংবা তাঁর উদ্দেশে অশ্লীল ইঙ্গিত করা অথবা তাঁকে পঞ্চপুরুষের নর্মসহচরী হবার জন্য 'বেশ্যা' বলে গালিগালা দেওয়া, কি চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে শ্লীলতাহানি করার মধ্যে দুর্যোধন, কর্ণ দুঃশাসনের শুধু বৈরনির্যাতনের মনোভাব কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসিকতাই কাজ করেনি; তাঁর সম্পর্কে একটা চেপে রাখা লোলুপ দেহজ আকাঙ্ক্ষাও সমপরিমাণে ক্রিয়াশীল ছিল।'[১৬] পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর বিশ্লেষণে দুর্যোধন-দুঃশাসনের সাথে কর্ণ চরিত্রটির সাধারণীকরণ করেছেন। কিন্তু, দুর্যোধন-দুঃশাসন সম্পর্কে উক্ত অভিযোগ সত্য হলেও কর্ণ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, অন্তত বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ ততটা স্থূল নয়। *প্রথম পার্থে* কর্ণের উল্লাস বিকৃত কামনার বহিপ্রকাশ নয়। বরং অন্যায়ভাবে বঞ্চিত কর্ণ তা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থের আনন্দ থেকে, পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি ধিক্কারে, যারা দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষায় পরাস্ত। *প্রথমপার্থ নাটকে* কর্ণ নারী-আসক্ত নয় প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে 'নারী তাঁর বিলাস নয়, প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালাবাসেন।' অহমই এই কর্ণের প্রধান অবলম্বন। তাই, আত্মশ্লাঘা ও আত্মাভিমান ছাড়া কর্ণের আর কিছু নেই। ভীষণভাবে অপচয়িত তার সমস্ত জীবন। আর জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কর্ণ যখন তার সারাজীবনের বঞ্চনার পরিশোধে জিঘাংসু, তখনই তার সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে আসে কুন্তীর স্নেহের আহ্বান, রাজ্যের প্রলোভন, দ্রৌপদীর ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের আহ্বান, কৃষ্ণের সৌহার্দ্যের নিমন্ত্রণ।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে কর্ণকে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী জেনে উপযুক্ত সময়ে তার সতৃষ্ণ অন্তরকে প্ররোচিত করতে চায় কুন্তির সঞ্চিত স্নেহ, কিন্তু কর্ণের নিকট সে সম্মোহন অভ্যর্থনা, আলিঙ্গন এখন সুদূর পরাহত। ততদিনে তাদের মধ্যকার ব্যবধান দুস্তর। কুন্তীর প্রতি কর্ণের সংলাপে –

কর্ণ

বেদনা-মনস্তাপ-প্রায়শ্চিত্তঃ সব অর্থহীন এখন।
কালস্রোত আমাকে অনেক দূর টেনে এনেছে।
তুমি আছো তীরে, আমি এখনো ভাসমান-
হাত বাড়লেও স্পর্শ পাবো না।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণের মতো বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ কুন্তীর আহ্বানে সম্মোহিত নয়, বরং সতর্ক; বিশ্বাসী নয়, বরং সন্দিগ্ধ –

কর্ণ

তা'হলে ... এই আপনার অভীষ্ট? পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি
অর্জুনের আয়ু?
সেই জন্যই এই পরিত্যক্ত পুত্রকে আজ
মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করলেন?

কুন্তীর আবেদনে তাই কর্ণ নির্মোহ, পাঞ্চালীর প্ররোচনায়ও সমভাবে উদাসীন। কারণ, কর্ণ দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞ। সে জানে পৃথিবী শুধু বনভূমি, পতঙ্গের গুঞ্জন আর পল্লবের মর্মর দিয়ে রচিত নয়; সেখানে আছে রাজধানী, প্রাসাদ, চক্রান্ত, সংঘর্ষ। ফলে, কর্ণের নিকট দ্রৌপদীর বন্ধুত্বের আহ্বান বিফল, মৈত্রী প্রস্তাব তিরস্কৃত। কারণ, কর্ণ 'ভালোবাসার কাঙাল' নয়, 'আয়ুর ভিক্ষুক' নয়; নিঃসঙ্গ এক যোদ্ধা – আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে অনড় –

কর্ণ

মহত্তম সেই যুদ্ধ, যা নিঃস্বার্থ,
বিশুদ্ধ সেই চেষ্টা, যা নিষ্ফল।
আজ পাণ্ডবেরা জয়োৎসুক, কৌরবেরা জয়োৎসুক,
আকাঙ্ক্ষায়, আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা চঞ্চল –
পাঞ্চালী, তুমিও তা-ই।
শুধু আমি ইচ্ছাহীন, শঙ্কারহিত,
তুমি জেনো, আমি দুর্যোধনের যন্ত্র নই,
কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু বলে ভাবিনা –
আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ।

রাজত্বের অংশ, জেষ্ঠ্য পাণ্ডবরূপে স্বীকৃতি, দ্রৌপদীর বাহুডোর, জয়-পরাজয় কিছুই কর্ণের কাঙ্ক্ষিত নয়; তার সংকল্প আমৃত্যু এক ব্যক্তিগত যুদ্ধ – 'আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব – আমার ব্যক্তিগত।' কারণ, এই যুদ্ধ তাকে দেবে আত্মপরিচয়। নিজের কাছে সে হতে পারবে প্রমাণিত, প্রকাশিত। কারণ, এতদিন ধরে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগটুকু থেকেও বারবার বঞ্চিত হয়েছে মেধাবী কর্ণ। এ যুদ্ধ তার আত্মস্বীকৃতি অর্জনের মরনপণ পরীক্ষা – তার প্রতিভা প্রমাণের একমাত্র সুযোগ। কর্ণের সংকল্পে –

কর্ণ

এই যুদ্ধ
আমার বহুকালের প্রতীক্ষিত, প্রত্যাশিত।
সে অর্থ দেবে আমাকে, আমার অস্তিত্বকে।

Dhaka University Institutional Repository

আর বিনিময়ে
নেবে আমার চরম চেষ্টা, অন্তিম উদ্যম,
আমার সব অব্যবহৃত আবেগ।

তাই কৃষ্ণের কল্যাণ-প্রস্তাব, সন্ধির অনুরোধেও কর্ণপাত করে না কর্ণ। এমনকি কৃষ্ণের মুখে নিজের সংঘটিতব্য পরিণতির কথা জানার পরও নয়। বরং, কৃষ্ণের বিকল্প প্রস্তাবে সম্মত হয় কর্ণ। অক্ষয় বটরূপী মহাকালের বৃন্তে ফলে ওঠা মৃত্যু নিয়ে কর্ণ হতে চায় কিংবদন্তী – মহাকালের ইতিহাসে অনপনেয় এক নাম। মৃত্যুর মূল্যে সেই মহত্তর প্রতিষ্ঠা কর্ণের অভীষ্ট, যার ফলে এক মৃত্যুহীন অস্তিত্বরূপে সর্বযুগের মানুষের মনে সে অমরত্বে আসীন হতে পারে – এক 'ভাস্বর মহান পরাজিত বীর'রূপে –

কর্ণ

জানি, আমিও জানি,
সব এক অলঙ্ঘ্য সূত্রে গাঁথা হ'য়ে আছে।
আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট,
যার ডালে ডালে পক্ব হ'য়ে ফলে ওঠে
অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা,
অসংখ্য কার্যকারনের একটিমাত্র পরিণাম,
অসংখ্য জিজ্ঞাসার পরে একটিমাত্র উত্তর।
সেই মহাবৃক্ষের কোনো-একটি শাখায় এবার দুলবে
রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু।

কালের ঘূর্ণনে লুপ্ত হবে ঘটনারাশি, জীবন-কর্ম-স্মৃতি সমস্তই – বিস্মৃত হবে অতীত। তারই মধ্যে বেঁচে রবে কর্ণের মৃত্যুর মহত্ত্বগাথা। অর্জুনের হাতে কর্ণের পরাভব তাই অসম্ভব। কালের মূল্যে বিস্মৃতিহীন অমরত্ব নিয়ে বিজয়ী রবে কর্ণই। মহাকালের পটে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট, জিজ্ঞাসা ও পরিণামের আধুনিক রূপায়ণ বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থ*। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এ নাটকেও বুদ্ধদেব বসু ব্যক্তি-অস্তিত্বের সঙ্গে সামষ্টিক-অস্তিত্বের সূত্রটি শেষ পর্যন্ত যুক্ত করেছেন দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপের মধ্য দিয়ে –

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

কেউ কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব – মৃত্যুর মূল্যেও,
মানি তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আমি তাঁদের ভয় করি।
আমি বলি, তারাই ধন্য, যারা সাধারণ,
যাদের চরম লক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি –
তাদেরই জন্য মানব-বংশ আবহমান।

অধিকাংশ নাটকেই বুদ্ধদেব বসু এমনিভাবে ব্যক্তির অস্তিত্বকে অঙ্গীকার করেও সামষ্টিক জীবনের সাথে যোগসূত্র অক্ষুন্ন রাখেন। কারণ, ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি এবং সমষ্টি ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীন আর এই দুই মিলে তৈরি হয় সমগ্রতার চেতনা। বুদ্ধদেব বসুর মিথিক দর্শনের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে আধুনিক জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়েও জীবন-প্রবাহের আবহমানতায় তিনি শ্রদ্ধাবান।

মিথ নির্মাণের ক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যকদের সাথে বুদ্ধদেব বসুর সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানে যে, তাঁরা সমকালীনতাকে মুখ্য বিবেচনায় রেখে পুরানের প্রচ্ছদমাত্র গ্রহণ করেন। আর বুদ্ধদেব পুরাণ থেকে অর্জন করেন বাস্তব জ্ঞান এবং সমকালের সাথে তাকে যুক্ত করে একটি বৃহৎ জীবন-চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মিথিক দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী নয়, বরং একটি ধারাবাহিক বিবর্তনিক সত্তায় আস্থাবান – জীবনের একটি পুরাবৃত্ত সৃষ্টিতে আগ্রহী। পুরাণ কাহিনীকে তিনি নিছক গল্পকাহিনী ভাবেননি। আধুনিক জীবন অপেক্ষা তাকে কম মর্যাদা দেননি। বুদ্ধদেব বসুর স্বীকৃতিতে – 'আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যেসব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন) আমি সেগুলোকে অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সেই বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার সন্ধান করেছি।'[১৭] আধুনিক জীবনকে স্বীকার করে নিয়েই প্রবহমান জীবন অস্তিত্বকে আবিষ্কার বুদ্ধদেব বসুর মিথ-চেতনার মৌল উদ্দেশ্য। অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর দর্শন যতই উন্মূল বা অনিকেত হোক না কেন, কাব্যনাটকের মিথিক দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি মূলাশ্রয়ী অস্তিত্বে বিশ্বাসী, চিরন্তন মূল্যবোধে দীক্ষিত; সুস্থির, প্রজ্ঞাবান এক শিল্পী।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১ T.S. Eliot 'The Possibility of Poetic Drama', 'Selected Essays' 2000, Doaba Publications, 4497/14, Guru Nanak Market, Nai Sarak, Delhi-110006, Page. 53

২ বুদ্ধদেব বসু, 'প্রযোজনার জন্য পরামর্শ' 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', আষাঢ়, ১৪০৮ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৮৪

৩ ডাঃ জগন্নাথ ঘোষ, 'নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু', বইমেলা, ১৯৯৮, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৯

৪ ডক্টর কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* ভূমিকা', আগস্ট ১৯৮০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৩৫

৫ দীপেন্দু চক্রবর্তী, 'জন্মশতবর্ষে বুদ্ধদেব বসুর নাটক : আমার চোখে', 'জলার্ক', বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, উনবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, মানব চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ২০০৮, পৃ. ৯৯

৬ শঙ্খ ঘোষ, 'তিরিশ বছর আগে', উদ্ধৃত, 'বিপন্ন বিস্ময়' বুদ্ধদেব বসু শতবর্ষের তর্পণ', জানুয়ারি ২০০৮, অহর্নিশ প্রকাশনা, ৫০৮/৮ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরপগনা ৭৪৩২২২, পৃ. ২৭১

৭ বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকান্ডারী', মহাভারতের কথা', পৌষ ১৩৯৭, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৩০

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

৯ বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা' 'কালসন্ধ্যা' মাঘ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৯

১০ বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকান্ডারী', 'মহাভারতের কথা', পৌষ ১৩৯৭, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২২৮

১১ প্রাগুক্ত, পাদটীকা, পৃ. ২৪০

১২ David Adams Leeming, 'The Flood' 'The World of Myth' coppyright, 1990 by Oxford University press. Inc. page 43

১৩ মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য', ফেব্রুয়ারি ২০০৯, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৫৫

১৪ বুদ্ধদেব বসু, 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম', উদ্ধৃত, 'উত্তরাধিকার' বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৬৪২-৬৪৩

১৫ বুদ্ধদেব বসু, 'গীতার পটভূমি', 'মহাভারতের কথা', পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত, পৌষ ১৩৯৭, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১১৪

১৬ পল্লব সেনগুপ্ত, 'ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা – উৎসের সন্ধানে', উদ্ধৃত, চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত,'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', এপ্রিল ২০০১, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২০০-২০১

১৭ বুদ্ধদেব বসু, 'মুখবন্ধ', 'মহাভারতের কথা', পৌষ ১৩৯৭, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে মিথ-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য : কাঠামো বিন্যাসে ও চরিত্র উদ্ভাবনে

স্বাধ্যায় ও সৃষ্টিশীলতার গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যে বুদ্ধদেব বসু মিথ-বিনির্মাণের এক অসাধারণ মাত্রাচেতন শিল্পী। জীবনাদর্শের বহিরাশ্রয় হিসেবে পুরাণ থেকে যথাযথ আখ্যান নির্বাচন, গ্রহণ, বর্জন, ও তার আধুনিকীকরণ এবং সর্বোপরি অতীত ও বর্তমানের ব্যবধান লুপ্ত করে তাতে ভবিষ্যতদর্শী প্রেরণা সঞ্চারে বুদ্ধদেব বসু যথার্থই প্রাজ্ঞ ও নিষ্ঠাশীল নাট্যকার। তাঁর মিথাশ্রয়ী সবগুলো কাব্যনাটকের আখ্যান-উৎস কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গানুবাদকৃত মহর্ষি বেদব্যাস রচিত *মহাভারত*।

কাব্যনাটকে বুদ্ধদেব বসুর মিথ-ব্যবহারের শিল্পগত মাত্রাবোধ প্রসঙ্গে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু পুরাণাশ্রয়ী হয়েও সম্পূর্ণরূপে পুরাণ-সমর্পিত নন। পুরাণ-কথাকে তিনি তাঁর কল্পনা দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেন। তাঁর সবগুলো কাব্যনাটক সম্পর্কেই এ সত্য অল্পাধিক কার্যকরী। ১৯৬৬ সালে *দেশ* পত্রিকায় *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* প্রকাশের পর এতে সূক্ষ্ম কালভঙ্গের অভিযোগ ওঠে পাঠক মহলে। পাঠকের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বুদ্ধদেব বসু বলেন – 'আমার বক্তব্য এই –আর হয়তো বা বহু পাঠকের পক্ষে তা সহজেই অনুমেয়–যে আমি এই কালভঙ্গ ঘটিয়েছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে, তার আন্তরিক প্রয়োজন ছিলো ব'লে।...এ-ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন; এটা যদি গ্রাহ্য হয়, তাহ'লে 'ত্রেতা' যুগের চরিত্রের মুখে 'দ্বাপর' যুগের উল্লেখ থাকলেও কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'[১] এই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েও নাটকের আখ্যান-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি পুরাণের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন। বরং '*মহাভারতে*'র কাহিনী ও ভাবকে যতদূর সম্ভব অক্ষত রেখে তিনি তাঁর কল্পনাকে বিস্তৃত করেন নাটকে। কারণ, বুদ্ধদেব বসু গভীরভাবে আস্থাবান ঐতিহ্যের চিরকালীনতায়। তাঁর চেতনায় মহাভারত 'কোনো সুদূরবর্তী ধূসর, স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবহমান।'[২] আবার এই শাশ্বতবোধের পাশাপাশি আধুনিক নাট্যকার হিসেবে পুরাণ-কথার সাথে সমকালীন বৈশ্বিক ও দৈশিক প্রেক্ষাপট ও আধুনিক মানুষের সংকট-সংবেদনাকে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও তিনি সচেতন। পুরাণ ও আধুনিক চেতনার এই শৈল্পিক মিথস্ক্রিয়ায় বুদ্ধদেব বসু পরিশ্রমী ও পরিমিতিবোধসম্পন্ন নাট্যকার।

কাব্যনাটকগুলোর মধ্যে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* বুদ্ধদেব বসুর মিথ-নির্মাণের প্রথম দৃষ্টান্ত। যদিও ইন্দো-ইউরোপীয় 'হোলি গ্রেইলে'র প্রাচীনতম মিথে এবং আমাদের ভারতীয় পুরাণের মধ্যে *রামায়ণ* ও *জাতকের* কাহিনীতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী বিদ্যমান, তবু বুদ্ধদেব বসু তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের আখ্যান-উৎস হিসেবে নির্বাচন করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বঙ্গানুবাদকৃত *মহাভারতে*র 'বনপর্বে'র 'ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান'। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বৈয়াসিক' লক্ষণযুক্ত *মহাভারতের* মায়াজালে বুদ্ধদেব বসু আবদ্ধ ছিলেন আমৃত্যু –তাঁর মূলানুগত্য ও অনুবাদরীতি বুদ্ধদেবের নিকট ছিল তৃপ্তিদায়ক, সুখপাঠ্য এবং সর্বোপরি তাঁর কল্পনাবৃত্তির পক্ষে উত্তেজক। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* রচনার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্নের '*মহাভারতে*'র অবদান সম্পর্কে নাট্যকারের স্বীকৃতিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

> সেই প্রথম আমি নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি – এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের *পতিতার* বাইরে কিছু জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত – এ সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিলো তখন ...।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

কালীপ্রসন্ন সিংহের *মহাভারতের* কল্পনাসুন্দর এই আখ্যানের আস্বাদই বুদ্ধদেব বসুকে উদ্দীপ্ত করে *মরচে পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৬) কাব্যের নাম কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের মিথের প্রতীকী ব্যবহারে, যা *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* রচনার পূর্বসূত্র। সেখানে পরিত্যক্ত পচা কাঠের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা পেরেকের প্রতীকে তিনি জাগ্রত করেন রাজকীয় জীবনে আত্মোৎপীড়িত ঋষ্যশৃঙ্গের যন্ত্রণাকে। কিন্তু, এসব কিছুরও পূর্বে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* রচনায় বুদ্ধদেব বসুর প্রথম প্রর্বতনার উৎস ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিতা' (১৩০৪) কবিতাটি। নাট্যকারের স্মৃতিচারণে –

> ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের যেসব কবিতা প্রথম প'ড়ে তারপর আর সারাজীবন ভুলতে পারিনি, তার অন্যতম হ'লো *পতিতা* পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহের মধ্যস্থতায়, ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনীটি আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে ও ভাবিয়েছে; লুব্ধ হয়েছি তা অবলম্বন ক'রে নিজে কিছু রচনা করতে।[৪]

অর্থাৎ, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের সৃষ্টিসূত্রের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথের *কাহিনী* (১৯০০) কাব্যের 'পতিতা' কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুর প্রথম প্রণোদনা। বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথই আমাদের সাহিত্যে প্রথম পুরাণের পুর্নজন্ম সাধক। প্রকৃতপক্ষেই, পুরাণের চরিত্রগুলোর মধ্যে একেকটি অনাবিষ্কৃত সত্যকে রূপ দান করা, তার মধ্যে নতুন সংবেদনাকে সঞ্চার করা এবং পুরাণের উপেক্ষিত চরিত্রগুলোকে মানবিক উদ্ভাসনের মধ্য দিয়ে অসাধারণ একেকটি ব্যক্তিত্বরূপে প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্র সাহিত্যেই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের *কাব্যের উপেক্ষিতা (প্রাচীন সাহিত্য)* (১৯০৭), *চিত্রাঙ্গদা* (১৯৩৬), *গান্ধারীর আবেদন* (১৮৯৭), *কর্ণকুন্তী সংবাদ* (১৯২১) কিংবা 'পতিতা' কবিতা – যে কোনো রচনার ক্ষেত্রেই একথা সত্য। অঙ্গদেশে বারিবর্ষণের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গের উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে প্রেরিত বারাঙ্গনাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এক পতিতার মনোলোক উদ্দীপ্ত করে, তার মধ্যে কবিত্বময় চেতনার উদ্ভাসন ঘটানো ও তাকে সত্যতা দানের জন্য কল্পনাশক্তিকে কতদূর পর্যন্ত সূক্ষ্ম করে তোলা যায়, কতো অতলান্তস্পর্শী ও প্রগাঢ় করে তোলা যায়, তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের *পতিতা* কবিতাটি। তপস্বীর অপাপবিদ্ধ দৃষ্টিতে প্রথম নারী-দর্শনের মুগ্ধতা সেই বহুভোগ্যা বারাঙ্গনার অন্তরে নারীত্বের মহিমাকে জাগ্রত করে তার নবজন্ম ঘটায় –

ধন্য রে আজি, ধন্য বিধাতা সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তার দেহময় উঠে মোর জয়, উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।

... ...

দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি, নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা –
দুর দুর্গম মনবনবাসে পাঠাইল তারে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস, সই পথহীন বিজন গেহ
স্তব্ধ নীরব গহণ গভীর যেথা কোনোদিন আসেনি কেহ
সাধকবিহীন একক দেবতা ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে পুজিলা প্রথম পূজার ফুলে
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল জাগে আনন্দ ভকতপ্রাণে
এ বারতা মোর দেবতা তাপস দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।[৫]

নতুন ভাবনার প্রয়োগে স্বৈরিণীর নির্বাসিত অন্তরকে জ্যোতির্ময় উপলব্ধিতে পুনর্জীবিত করে তোলেন রবীন্দ্রনাথ – তার পঙ্কিল হৃদয়কে নির্মল করেন – অন্তরের রুদ্ধ দেবতাকে করেন প্রকাশিত। নতুন উপলব্ধি ও সংকল্পে দিব্য উদ্ভাসন ঘটে তার –

তোমার পূজার গন্ধ আমার মনোমন্দিরে ভরিয়া রবে
সেথায় দুয়ার রুধিব এবার যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

তরঙ্গিণী, পরে বুদ্ধদেব বসু যার নামকরণ করেন, তাকে পুরাণ থেকে তুলে আনা ও তাকে নতুন চেতনায় জাগ্রত করার ভিত্তিটুকু রবীন্দ্রনাথই নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু পরে তাকে সমকাল-প্রসারী অভিব্যক্তি দান করেন। আরো লক্ষণীয় যে রবীন্দ্র-কবিতায় কামের মধ্য দিয়ে পতিতার এই পুণ্যময় সত্তায় উত্তরণ, তার সম্মোহিত চেতনায় বারবার তপস্বীর সেই মুগ্ধ-মন্ত্রের অনুরণন (আনন্দময়ী মুরতী তোমার/ কোন দেব তুমি আনিলে দিবা/ অমৃত সরস তোমার পরশ/ তোমার নয়নে দিব্য বিভা।) এবং রূপোপজীবিকা ছেড়ে সেই মুহূর্তকালের স্মৃতিতে অন্তর্লীন হয়ে থাকার সংকল্প – 'তরঙ্গিণী' চরিত্র রূপায়ণে বুদ্ধদেব বসুকে কতখানি প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, সচেতন পাঠকমাত্রেই তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। বুদ্ধদেব বসুর মতো অহংসচেতন, আমিত্বপ্রবল শিল্পীকে এতখানি প্রভাবিত করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভবপর। যদিও 'পতিতা'র উপলব্ধির পবিত্রতা তরঙ্গিণীর বৈশিষ্ট্য নয়, আধুনিক মানুষের সত্তাসন্ধানের অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিস্রস্ত-চেতন তরঙ্গিণী আরো মর্মগ্রাহী, আরো দহনদীপ্ত। তরঙ্গিণী রবীন্দ্র-কবিতার পতিতার ন্যায় রোম্যান্টিক নয়, বরং আধুনিক, বাস্তবানুগ, দ্বন্দ্ব-বেদনায় চূড়ান্তভাবে সমকালীন। কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের *আঁধারে আলো* (১৩২১) ছোটগল্পে ঋষ্যশৃঙ্গের মিথের প্রচ্ছায়া লক্ষ করে ঐ গল্পের 'বিজলী' চরিত্রের সাথে রবীন্দ্র-কবিতার এই পতিতার সাদৃশ্য প্রকাশ করেন।[৭] এ সাদৃশ্য কল্পনা যুক্তিসঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে, উভয় চরিত্রই উপলব্ধির একই বিন্দুতে সমাপ্ত। দু'টি চরিত্রই রোম্যান্টিকতায় অবসিত – কারণ তারা স্বার্থত্যাগী – পুন্যচেতনার উপলব্ধি ছাড়া তারা আর কিছুই চায় না, তারা কেউই অতিক্রম করে না যন্ত্রণাময় চেতনার স্তর। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসুর তরঙ্গিণীর সাথে তাদের সাদৃশ্য উপরিতলের। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, রবীন্দ্র-কবিতার পতিতা এবং শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের বিজলী এই উভয়ের যেখানে শেষ, সেইখান থেকে তরঙ্গিণী চরিত্রের শুরু। স্বাধিতা নয়, চিত্তবৃত্তি তরঙ্গিণী চরিত্রের নিয়ামক। সর্বোপরি, পতিতা কিংবা বিজলীর উদ্ভাসন যতই অন্তর্তাৎপর্যময় হোক না কেন, সমকালে অবস্থান করে তাদের কাউকেই আধুনিক চরিত্রের স্বীকৃতি দেয়া যায় না, ভাবীকালের মুখপাত্ররূপে মেনে নেয়া যায় না। বুদ্ধদেব বসুর মিথ-পুনর্নির্মাণের স্বকীয়তা এখানেই নিহিত। তাঁর তরঙ্গিণী কালের দাবিতে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর।

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র আখ্যান নির্মিতিতে বুদ্ধদেব বসু *মহাভারত*তের অনুসরণ করলেও নাটকের অনেকাংশ তাঁর কল্পনা-সৃষ্ট। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় – 'সর্বোপরি স্মর্তব্য, এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত – অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনীকে নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা।'[৮]

অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টি থেকে শুরু করে ঋষ্যশৃঙ্গের সাথে বারাঙ্গনার মিলন, রাজধানীতে ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন এবং শান্তার সাথে তার পরিণয়– *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র পৌরাণিক সাদৃশ্য এ পর্যন্তই। নাটকের বাকি এবং প্রধান অংশটুকুই নতুনভাবে পরিকল্পিত। এমনকি রবীন্দ্রনাথের *পতিতা* কবিতাও বারাঙ্গনার হৃদয়ে শুদ্ধ চেতনার উদ্ভাসনেই সমাপ্ত। মূলত অনাবৃষ্টির সময়ে কী উপায়ে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবলপ্রতাপ ইন্দ্র বারিবর্ষণে বাধ্য হন, সেই কিংবদন্তিই *মহাভারতে*র উক্ত কাহিনীর মূল উপজীব্য। কিন্তু, তারপর ঋষ্যশৃঙ্গের আর সেই বারাঙ্গনার কী পরিণতি হলো, তা আদিকবির নিরাসক্তির পক্ষে অপরিহার্য নয়, বরং আধুনিক শিল্পীর কল্পনার পক্ষেই তা সঙ্গত। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কল্পনাকে চালিত করেন মূলত এইখান থেকে। শান্তার সাথে বিবাহের পর রাজসিক জীবনে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ্য, উৎপীড়ন, নিস্পৃহা; শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের নিষ্প্রাণ, আচার-সর্বস্ব দাম্পত্য, অপরদিকে দর্পণের দিকে তাকিয়ে তরঙ্গিণীর সত্তানুসন্ধানের উন্মাদ হার্দ্যপ্রলাপ এমনকি অংশুমান-চন্দ্রকেতু-লোলাপাঙ্গী চরিত্রসমূহের ক্রিয়াকলাপ – সমস্তই বুদ্ধদেব বসুর কল্পনাজাত। সর্বোপরি, চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের নাটকীয় পরিণামটি শিল্পীর সজ্ঞান অভিপ্রায়-সিদ্ধ – নাট্যকারের জীবনদর্শনের রূপায়ণ। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় – 'লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো – নাটকটির বিষয় হ'লো এই'।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

তপস্বী ও তরঙ্গিণী চার অঙ্কের একটি সম্পূর্ণ নাটক। এর আখ্যান পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায়, পুরাকালের স্থলে বর্তমান কাল, পৌরাণিক প্রতিবেশের স্থলে আমাদের পরিচিত ব্যবহারিক জীবন এবং অলৌকিকতার পরিবর্তে বাস্তবতাকে অত্যন্ত সন্তর্পণে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যেন পৌরাণিক আবহকে বজায় রেখে আধুনিক জীবন ও প্রতিবেশকে রূপান্বিত করা যায়। নাট্যারম্ভেই প্রথম অঙ্কে গাঁয়ের মেয়েদের বৃষ্টি-বন্দনার রূপকল্পটির সাথে এলিয়টের *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল* এর *ক্যান্টারবেরি* গ্রামের মেয়েদের 'কোরাসে'র সাদৃশ্য থাকলেও দৃশ্যটিকে বুদ্ধদেব বসুর ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে একীভূত করে তোলেন– এমনকি বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতি-জড়িত পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনের প্রভাবও সেখানে কষ্টকল্পিত নয়। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে গাঁয়ের মেয়েদের গানে 'মধুমতী গাভী', 'ঢেঁকির শব্দ', আঙিনায় শিশির ভেজা 'কুমড়ো', 'ব্যাঙের ছাতা', 'দেয়া', 'বিহান', 'বোন' (ভগ্নি অর্থে) প্রভৃতি অনুষঙ্গ বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিবাহিত পূর্ববঙ্গের শ্যামশ্রীর অবচেতন প্রকাশ বলেই আমাদের ধারণা। গাঁয়ের মেয়েদের বৃষ্টি-প্রার্থনার গানে –

> বল তো বোন, কবে আবার মধুমতী গাভীর বাঁট হবে উচ্ছল?
> ঢেঁকির গম্ভীর শব্দে দিয়ে তাল জাগবে হাতেপায়ে ভঙ্গি?
> ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে? ডাকবে উল্লাসে দর্দুর?
> শিশির বিন্দুর আদরে ভরপুর ঝুলবে আঙিনায় কুমড়ো?

বৃষ্টি-প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে আমাদের পরিচিত গার্হস্থ্য জীবনের রূপটি প্রতিস্থাপন করে নাট্যকার নতুন প্রতিবেশ নির্মাণ করেন। একই সাথে সমকালীন বন্ধ্যসভ্যতার তৃষ্ণার্ত জনতার মুক্তি কামনার রূপকাভাসও নিহিত থাকে এই বৃষ্টি-কাতরতার মধ্যে। রাজপ্রাসাদের দুই তরুণ রাজদূতের কথোপকথন সূত্রে বুদ্ধদেব বসু পুরাকাল ও আধুনিক কালের চেতনাকে করেন সমসূত্রী এবং অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির পশ্চাতে যে অলৌকিক কারণ পুরাণে উল্লেখিত, তাকে দান করেন বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। তাদের কথোপকথনে –

২য় দূত । জনরব, তুচ্ছ জনরব।

১ম দূত । কিন্তু কে জানে তুচ্ছ কিনা! ... তোমার কী মনে হয় বলো তো? রাজা লোমপাদ এক ব্রাহ্মণকে অসম্মান করেছিলেন বলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা, একি বিশ্বাসযোগ্য?

২য় দূত । (বাঁকা হেসে)। তা'হলে তো এও বিশ্বাস্য যে আমি এই লোষ্ট্রে পদাঘাত করলে আকাশ থেকে নক্ষত্র খ'সে পড়বে। পরান্নপুষ্ট, স্বার্থান্বেষী প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন কথা আর কে রটাতে পারে?

২য় দূত । প্রত্যহ কত কাকতালীয় ঘটে। কত স্বপ্নকে সত্য ব'লে ভ্রম হয়। কে জানে কোথায় আছে নিশ্চিতি?

প্রথম ও দ্বিতীয় দূতের এই কথোপকথন নাটকের গৌণ অংশ হলেও এটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এখানে বুদ্ধদেব বসুর পুরাণ-প্রয়োগের একটি বিশিষ্টতা নিহিত আছে। প্রথম দূত দৈবে বিশ্বাসী, পুরাকালের ধারক, রাজপুরোহিতের ধারণায় বিশ্বাসী। তার মুখ থেকেই আমরা অবগত হই যে, অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির কারণ ব্রাহ্মণের প্রতি রাজা লোমপাদের অসম্মান। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু পুরাণের অলৌকিক সত্যের মধ্যে বাস্তবতা সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় দূতের মুখে এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেন 'বিশুদ্ধ কাকতালীয়' বলে। অর্থাৎ, অঙ্গদেশের শুষ্কতা, বন্ধ্যাত্ব, দুর্ভিক্ষ এসব কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া কিছু নয়। চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি অংশুমানের বিদ্বেষ প্রসূত সংলাপেও এই প্রাকৃতিক বাস্তবতার প্রসঙ্গ আসে –

অংশুমান । অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির জন্য রাজা লোমপাদ দায়ী ছিলেন না। বৃষ্টিপাতও আপনার কীর্তি নয়। যা ঘটেছে, তা বিশুদ্ধ কাকতালীয়।

এভাবে, পৌরাণিক বিশ্বাসকে বুদ্ধদেব বসু সরাসরি খণ্ডন করেন না, কিন্তু দ্বিতীয় দূত কিংবা অংশুমানের মন্তব্য দিয়ে তাকে দ্বিধান্বিত করেন এবং এভাবে তিনি পুরাকাল ও বর্তমান সময়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন, জানিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দেন যে, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ, সমস্ত যজ্ঞ নিষ্ফল, শান্তার শিবলিঙ্গ পূজা অর্থহীন–একমাত্র কামের মধ্যে দিয়েই পুনর্জীবিত হতে পারে পৃথিবী – ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর মিলনের মধ্য দিয়ে যা প্রতীকান্বিত হয়।

তপস্বী ও তরঙ্গিণীর প্রথম অঙ্কে শান্তার সাথে অংশুমানের প্রণয় পুরাণ-অনুসৃত নয়। এমনকি মন্ত্রিপুত্র অংশুমানের অস্তিত্বই নেই *মহাভারতে*। শান্তা ও অংশুমানের প্রেমকে কেন্দ্র করে নাটকের এই পার্শ্বপ্রবাহটি বুদ্ধদেব বসুর কল্পিত। প্রথম অঙ্কে রাজমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে শান্তার সংলাপে তাদের প্রণয়ের কথা ব্যক্ত হয় –

> **শান্তা** । অংশুমান ও আমি এক যৌবরাজ্য পেতেছি। আমাদের মন্ত্রী সেখানে হৃদয়, সেনাপতি আমাদের পারস্পরিক প্রীতি, কোষাধ্যক্ষ আমাদের নিষ্ঠা, আর প্রজাগণ আমাদের দৃষ্টি, হাসি, সংলাপ, আমাদের স্বপ্ন ও ভাবীকল্পনা।

শান্তা ও অংশুমানের এই প্রেম একদিকে যেমন নাটকে রোম্যান্টিক আবহ সৃষ্টি করে, তেমনি, নাট্যকারের কয়েকটি উদ্দেশ্যেকেও চরিতার্থতা দান করে। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসু যে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব মানসতাকে সঞ্চারিত করতে চান, তাকে আরো ঘনীভূত করে তাদের প্রেম ও রাজনৈতিক যূপে সেই প্রেমের বলির ঘটনা। তৃতীয় অঙ্কে শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের প্রাণহীন দাম্পত্য, অন্তর্গত বিচ্ছিন্নতা এবং পরিণাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি, ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর কামের মধ্য দিয়ে পুণ্যের পথে উদ্বর্তনের ক্ষেত্রে তা সহায়ক।

অঙ্গদেশের বন্ধ্যাত্ব নিরসনে ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গের মন্ত্রণা, সেই উদ্দেশ্যে বারাঙ্গনা লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীর তলব, বহুমূল্য রত্ন ও প্রচুর ধনের বিনিময়ে তাদের কার্যসিদ্ধির সংকল্প এবং প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র প্রথম অঙ্ক সম্পন্ন হয়। এ অংশে বুদ্ধদেব বসু পুরাণকেই অনুসরণ করেন, কেবল মহাভারতের উল্লেখিত নামহীন প্রবীণা 'বারযোষা' বা বারবনিতা ও তার 'সুনিপুণা পুত্রী'র নামকরণ করেন যথাক্রমে লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণী। এই *লোলাপাঙ্গী*, যাকে একটি বারের জন্য লক্ষ করা যায় *মহাভারতে*, বুদ্ধদেব বসু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে তৈরি করেন একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্ররূপে – তার বারাঙ্গনাসুলভ লোভ এবং চাতুর্যের সঙ্গে যুক্ত করেন মাতৃস্নেহ ও বাৎসল্য। উপরন্তু লোলাপাঙ্গী যেন 'কমিক' চরিত্র বলে বিবেচিত না হয়, সেজন্য তার চরিত্রের ভারসাম্য নির্দেশ করে নাট্যকার আমাদের সে বিষয়ে সচেতন করে দেন – 'কখনো-কখনো (বিশেষত প্রথম অঙ্কে) লোলাপাঙ্গী আমাদের মৃদু কৌতুক জাগাতে পারে, কিন্তু সমগ্র নাটকে তার বেদনার দিকটা ভুলে গেলে চলবে না, মনে রাখতে হবে তার পক্ষে অর্থলোভ ও প্রগল্‌ভতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি তার মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম।[১০]

চার অঙ্কে বিভক্ত নাটক *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র দ্বিতীয় অঙ্ক পুরাণ-অনুসৃত হয়েও বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশ এবং অঙ্গদেশের বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক 'উর্বরতা-কৃত্য'টি সম্পন্ন হয় এ অঙ্কে, দ্বিতীয়ত, এ অঙ্কের শেষভাগকেই বলা যেতে পারে নাটকের শীর্ষসংকট (*Climex*), যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর মিলনের মধ্য দিয়ে তাদের ইচ্ছা, প্রার্থনা ও লক্ষ্যের বিপরীতমুখী পরিণাম ঘটে – নাটকে সঞ্চারিত হয় আধুনিক মানুষের অন্তর্সংকট ও দ্বন্দ্ব। নাট্যকারের ব্যাখ্যায় – 'দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিক থেকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'[১১]। অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কে সংঘটিত ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর কামের ফলেই বুদ্ধদেব-উল্লিখিত 'আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা'র সূচনা হয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয় অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের দৈনন্দিন আশ্রমকৃত্য দিয়ে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ যেন তার অভ্যস্ত আচার, অর্চনা ও কৃত্যে ঈষৎ ক্লান্ত, খানিকটা অন্যমনা – 'আমার দিনব্যাপী ক্রিয়াকর্ম যেন অভ্যাসমাত্র, কিছুই আমার অন্তঃকরণে অনুভূত হচ্ছে না।' সংযম-সর্বস্ব জীবনের প্রতি তিনি যেন কিছুটা অবিশ্বাসী ও দ্বিধাগ্রস্ত – 'কিন্তু আমি

Dhaka University Institutional Repository

ভাবি! এমন কোন প্রাণী আছে, যে আনন্দিত হতে না চায়? আর আনন্দ যার লক্ষ্য, সে কি ব্রহ্মকে আকাঙ্ক্ষা করে না?' বুদ্ধদেব বসু যেন ভবিতব্যের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন নিষ্পাপ ঋষ্যশৃঙ্গকে। ফলে, চরিত্রটির রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়, তার মানস-পরিবর্তনটি আকস্মিক বলে মনে হয় না। বুদ্ধদেব বসু যেখানে পুরাণকে অনুসরণ করেন, সেখানেও এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেন। অল্পক্ষন পরেই ঋষ্যশৃঙ্গ শুনতে পান তাঁর 'আকাঙ্ক্ষার শব্দরূপ' অভূতপূর্ব অনুভূতি, অদৃশ্যপূর্ব নারীমূর্তি, যাকে তিনি ভুল করে ভাবেন স্বর্গের দেবতা–

> **ঋষ্যশৃঙ্গ**। ... সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।)

বিভান্ডকের অনুপস্থিতিতে তরঙ্গিণী তার কবিত্বময় ব্রতকৃত্য দিয়ে সম্মোহিত করে তরুণ, অনভিজ্ঞ ব্রহ্মচারীকে। ঋষ্যশৃঙ্গের পাপবিহীন চোখের তলায় তরঙ্গিণী আবিষ্কার করে তার লালসাতীত নিষ্কলুষ সৌন্দর্যকে, যা কেউ কখনো খোঁজেনি। তরঙ্গিণীর কামনা হয় দ্রবীভূত অপরদিকে, যে মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গ জানতে পারে তার পৌরুষকে এবং তরঙ্গিণীর নারীত্বকে, সেই মুহূর্তে তার অন্তরে জাগে লালসা। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর সংলাপ-পরম্পরায় তাদের এই বিপরীতমুখী মানস-পরিবর্তন বিধৃত –

> **ঋষ্যশৃঙ্গ** । তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।
> **তরঙ্গিণীর** । আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন
> **ঋষ্যশৃঙ্গ** । আমার শোনিতে তুমি অগ্নি।
> **তরঙ্গিণীর** । আমার সুন্দর তুমি
> **ঋষ্যশৃঙ্গ** । আমার লুণ্ঠন তুমি।
> **তরঙ্গিণীর** । বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!
> **ঋষ্যশৃঙ্গ** । আমি তোমাকে চাই – তুমি প্রয়োজন!

এবার ঋষ্যশৃঙ্গের নিঃসংশয়ী কামনার কাছে সমর্পিত হতে হয় আবেশিত, দ্বিধান্বিত তরঙ্গিণীকে। তাদের মিলনে অঙ্গদেশে নামে বৃষ্টি আর এই বৃষ্টির যারা সংঘটক, অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী, তৃতীয় অঙ্ক থেকে তাদের জীবনে নামে অনাবৃষ্টির জ্বালা, বেদনা ও দগ্ধতা।

তৃতীয় অঙ্ক থেকে পরিণামী দৃশ্য পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটিই বুদ্ধদেব বসুর কল্পনা-সৃষ্ট মৌলিক সংযোজন – শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ ব্যতীত। তৃতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণী যেন রুদ্ধস্রোতা এক শুষ্ক নদী – জীবিকা, লোভ, কীর্তির উর্ধ্বে বিবিক্ত, বিস্রস্ত, নিরাশ্রয় এক নারী। মাতৃস্নেহ, চন্দ্রকেতুর নৈষ্ঠিক প্রেম কিছুই আকর্ষণ করেনা তাকে। আত্মরুদ্ধ হয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে সে অন্বেষণ করে তার সেই মুখচ্ছবি, যা সে দেখেছিল অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের চোখের দর্পণে – 'আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিলো-আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি সেই মুখ।' তরঙ্গিণীর এই হারানো মুখচ্ছবি সন্ধানের বিষয়টিতে বুদ্ধদেব বসু ইয়েটস-প্রভাবিত। ইয়েটসের *A Women Young and Old* কবিতার *Before the world was made* অংশের প্রচ্ছায়ায় নির্মিত তরঙ্গিণীর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি। কবিতাংশটি নিম্নরূপ ঃ

> 'If I make the lashes dark
> And the eyes more bright
> And the lips more scarlet,
> Or ask if all be right
> From mirror after mirror
> No vanity's displayed :
> I' am looking for the face I had
> Before the world was made'.[১২]

Dhaka University Institutional Repository

ইয়েটস এর কবিতার এই নারীটিও তার প্রেমিকের চোখের ভেতর দেখা নিজের প্রতিবিম্বকে খুঁজে বেড়ায় দর্পণে। কিন্তু দর্পণ থেকে দর্পণান্তরে – কোথাও দৃষ্ট হয় না সেই মুখচ্ছবি, বিশ্বসৃষ্টিরও পূর্বে যা সৃষ্ট। তরঙ্গিণীর প্রায়-উম্মাদ, বিস্রস্ত চেতনার প্রকাশে ইয়েটসের কবিতার এই ভাবটি বুদ্ধদেব বসু অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে আত্তীকৃত করেন *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে।

তপস্বী ও তরঙ্গিণীর চতুর্থ অঙ্কের ঘটনার কালগত ব্যবধান এক বৎসর। এখানে সেই আশ্রমবাসী অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ এক 'জটিল সাংসারিক চরিত্র' – রাজকীয় আচার, কর্তব্য, পতিত্ব, পিতৃত্ব সবকিছুর মধ্যে এক ক্লান্ত, বিপন্ন, নিঃসঙ্গ প্রাণ। রাজবেশের মতো সংসারও তাঁর কাছে এক ছদ্মবেশ মাত্র। রাতের অন্ধকারে শয্যায় শান্তার স্থলে তিনি কল্পনা করেন তরঙ্গিণীকে। শান্তাও সমভাবে অতৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গের সাথে দাম্পত্যে। সংগোপনে সে লালন করে অংশুমানের প্রতি প্রেম। শান্তার গানে ধ্বনিত হয় তার লুণ্ঠিত স্বপ্নের হাহাকার –

শান্তা (কক্ষে – গান)।

আসে যায় দিন-রজনী,
আসে জাগরণ, তন্দ্রা
শুধু নেই হৃৎস্পন্দন,
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।

মহাভারতে শান্তা চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক সংকট নেই, সেখানে শান্তা পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় ঋষ্যশৃঙ্গের অনুবর্তী, ঋষ্যশৃঙ্গের ঔরসে জন্ম নেয়া পুত্রের জননী এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রমবাসী ঋষ্যশৃঙ্গের পরিচর্যাকারিণী। *মহাভারতের* বিবরণ অনুযায়ী – 'রোহিণী যেমন শশধরের অনুকূলা; অরুন্ধতী যেমন বশিষ্টের প্রণয়িণী; লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের প্রিয়কারিণী; দময়ন্তী যেমন নলের প্রিয়তমা; শচী যেমন ইন্দ্রের বশবর্ত্তিণী; নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদ্গলের সহচারিণী; নৃপতনয়া শান্তা সেইরূপ বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গের প্রিয়কারিণী প্রণয়িনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।'[১৩] পুরাণের এই পতিব্রতা শান্তা *তপস্বী ও তরঙ্গিণীতে* পরিবর্তিত মানসিকতায় আধুনিক, অন্তর্সংকট-পীড়িত রক্তমাংসের মানুষ। চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গে ও শান্তার এই দাম্পত্য সংকট ও আধুনিক জীবনের মনোজটিলতাকে রূপ দিতেই বুদ্ধদেব বসু অংশুমান চরিত্রটি সৃষ্টি করেন, যার উল্লেখমাত্র নেই পুরাণে। এ নাটকে অংশুমানও হয়ে ওঠে একটি আধুনিক চরিত্র, যে বঞ্চিত প্রেমের যন্ত্রণায় ভ্রাম্যমাণ, অনিকেত। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি ক্ষিপ্ত অংশুমান নিজেই অন্যায়ের প্রতিকারে উদ্যত – 'জানুক। আমার বেদনা রাষ্ট্র হোক। তোমার অঙ্গীকার রাষ্ট্র হোক। আমি আর গোপনতা সহ্য করতে পারি না। আমি জ্বলে যাচ্ছি।' তরঙ্গিণীর পাণিপ্রার্থী চন্দ্রকেতুও বুদ্ধদেব বসুর কল্পনা-সৃষ্ট। চতুর্মুখী অন্তর্সংকটে নাটককে দ্বান্দ্বিক ও পরিণামমুখী করে তোলার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব বসু এ দু'টি চরিত্র সৃষ্টি করেন।

তপস্বী ও তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর মিলনের মধ্য দিয়ে যে নাটকীয় আততি শুরু হয়, তার অবসান ঘটে চতুর্থ অঙ্কের শেষ অংশে, ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর পুর্ণের পথে উদ্বর্তনের সিদ্ধান্তে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাম-সম্পর্কিত জীবনদর্শনকে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নাটকের এই পরিণতি দৃশ্যে পুরাণকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করেন। *মহাভারতের* ঋষ্যশৃঙ্গ বৎসরান্তে পিতার নির্দেশে ফিরে যায় আশ্রমে। কিন্তু, এ নাটকে পুণ্যপ্রার্থী বিভাণ্ডকের আহ্বানে সাড়া দেয় না রূপান্তরিত ঋষ্যশৃঙ্গ –

ঋষ্যশৃঙ্গ। হয়তো আমার সমিধকাষ্ঠে আর প্রয়োজন হবে না। অগ্নিহোত্রে আর প্রয়োজন হবে না। মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয় – আমাকে ডুবতে হবে শূন্যতায়।

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিণামে প্রবল-প্রতাপ বিভাণ্ডক চরিত্রটি হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, আধুনিক এক ছেঁড়াখোঁড়া মানুষ, যার সমস্ত জীবনের সাধনাই ব্যর্থ – পুত্রস্নেহ, পুণ্যলোভ সবকিছু থেকে বঞ্চিত বিভান্ডক যেন লক্ষ্যহীন এক মানুষ। লোলাপাঙ্গী তবু চন্দ্রকেতুকে আশ্রয় করে, বিভান্ডকের জন্য থাকে শুধু ব্যর্থ, নিরানন্দ আশ্রমখানি। ঋষ্যশৃঙ্গ চলেন অন্ধকারে, শূন্যতায়, রিক্ত হতে – হয়তো আত্মপোলব্ধি ও আত্মশুদ্ধির জন্য; তরঙ্গিণীকেও নির্দেশ করেন সেই গন্তব্য – '...আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু, তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে তরঙ্গিণী।' যাত্রার পূর্বে ঋষ্যশৃঙ্গ প্রত্যার্পণ করে যান শান্তার কুমারীত্ব। এই অলৌকিকতাটুকুকে নাট্যকার অবলম্বন করেন শান্তা ও অংশুমানের পরিণয়ের মধ্য দিয়ে অঙ্গদেশের প্রবংশপরম্পরাকে অব্যাহত রাখার জন্য। চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গী অভিন্ন বেদনায় পরস্পরের সহচর হয়।

পৌরাণিক আবহকে বজায় রেখে পুরাণের আখ্যান, চরিত্র ও প্রতিবেশকে নিজস্ব কল্পনা ও বাস্তবতা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু সময়োপযোগী করে তোলেন *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে – দার্শনিক উপলব্ধিতে তাতে সঞ্চার করেন চিরন্তন মাত্রা। প্রচলিত নাট্য-কাঠামোর আলোকে *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* আঙ্গিক-সংগঠন বিচার্য নয়, কবিত্ব, কল্পনা, নাটকীয়তা, সংবেদনা ও মনস্তত্ত্বের একটি সংহত মাত্রাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নাটকের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব ও গতি। তবু, একটি সম্পূর্ণ নাটকের মতোই এখানেও চিরকালীন নাটকীয় বিন্যাস – আরোহণ, শীর্ষসংকট, বিমোক্ষণ ও পরিসমাপ্তি প্রায় সুস্পষ্টভাবেই অনুভূত হয়। কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে – *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকটিকে নাটকরূপে পাঠ করলে বা অভিনয় দর্শন করলে নাটকের প্রতিটি সন্ধিস্থলে নাট্যঘটনায় 'ক্রমারোহণে' (*Rising Action*) ঘটনার 'চরম-উর্ধ্বগতিতে (*Cligmex*) এবং উপসংহৃতিতে (*Chastrophe*) আমরা একটি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের গতিসম্পন্ন ঘটনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে প্রাচীন মিথ-কাহিনীর ধ্যান-ধারণার রূপটিকেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দেখতে পাই।'[১৪]

মূলত, চার অঙ্কের *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক পুরাণের ঘটনা ও উর্বরতার অনুষঙ্গ দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু, তৃতীয় অঙ্ক থেকে নরনারীর আধুনিক মনোবাস্তবতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাটকটি, যার লক্ষ্য কামসংক্রান্ত নাট্যকারের জীবন দর্শনের প্রতিষ্ঠা। বর্হিবাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা, পুরাণ ও আধুনিক জীবন, রিচ্যুয়াল ও দর্শনের মাত্রাগত তারতম্য নিয়ন্ত্রন করে নাটকটির কাঠামো ও চরিত্র-তাৎপর্য। পুরাণের আখ্যান থেকে গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন, চরিত্র নির্মাণ ও তাদের মধ্যে আধুনিক মনোদ্বন্দ্ব সৃষ্টির মাধ্যমে ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রন এবং সর্বোপরি নাট্যকারের জীবনদর্শনের সাথে নাটকীয় পরিণামের সম্পূরক ঐক্যে বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* একটি সর্বাঙ্গসূক্ষ্ম, অনবদ্য কাব্যনাটক।

কালসন্ধ্যা

বুদ্ধদেব বসুর *কালসন্ধ্যা* নাটকটির আখ্যানসূত্র *মহাভারতের* 'মৌষলপর্বে'র যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী – যথারীতি বৈশম্পায়ণ বর্ণিত এবং জনমেজয়-শ্রুত। *মহাভারতের* এই বিবৃতিধর্মী কাহিনীটি বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে সরলভাবে রূপায়ণ করেননি। যদুবংশের ধ্বংসের কাহিনী ও তার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট *কালসন্ধ্যা* নাটকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, অধিকাংশক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে চরিত্রের প্রেক্ষণ, মন্তব্য ও সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত। পুরাণের কাহিনীটি নাটকে ধারবাহিকভাবে চিত্রিত হয়নি বরং পূর্বাপররহিত খন্ড-খন্ড দৃশ্যের সংযোজনের একটি সামগ্রিক আবহ নির্মিত হয় নাটকে। যেন মহাকালের নিরাসক্ত স্বরূপটিই লক্ষ করা যায় নাটকের আঙ্গিকে এবং 'টেকনিক'টি নিঃসন্দেহে আধুনিক। *মহাভারতের* কাহিনীটিকে মঞ্চোপযোগী করার লক্ষ্যেই হয়তো নাট্যকার এ ধরনের কাহিনী-বিন্যাসে আগ্রহী হন।

Dhaka University Institutional Repository

মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপে ছত্রিশ বছর পর সংঘটিত হয় যদুবংশের ধ্বংস। 'মৌষলপর্বে' যদু ধ্বংসের বিন্যাসের আরেকটি কারণ উল্লেখ রয়েছে। তা হলো– একবার মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও নারদ দ্বারকাপুরীতে এলে সেখানে সারণ, শাম্ব প্রভৃতি বীরগণ ক্রীড়াচ্ছলে মুণিদের সাথে কৌতুক ও উপহাস করে। মুণিগণ নিজেদের প্ররোচিত মনে করে কৃষ্ণ-তনয় শাম্বকে এই অভিশাপ দেন যে, শাম্ব-প্রসবিত লৌহময় মূষল-প্রভাবেই যদু, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ বিনাশিত হবে।[১৫] কিন্তু *কালসন্ধ্যা* নাটকে গান্ধারীর অভিশাপ কিংবা ব্রহ্মশাপ কেবল প্রতীকী অর্থেই ব্যবহৃত। নাটকের ভূমিকাতেই বুদ্ধদেব বসু জানিয়ে দেন – 'দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই একাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহুদূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান।'[১৬] বুদ্ধদেব বসু উল্লেখিত সেই আদি সত্যটি আর কিছুই না – মহাকালের বৈনাশিক অভিযানে কালের একটি বৃত্ত পূরণ এবং পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে ধ্বংসসাধন।

কালসন্ধ্যা দুই অঙ্কের একটি নাটক, যার প্রারম্ভে 'পূর্ব কথন' এবং সমাপ্তিতে 'উত্তর কথন' সংযোজিত। 'পূর্ব কথন' অংশটি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধদেব বসুর নাটকীয় নির্মাণ, 'মৌষলপর্ব' এর অস্তিত্ব নেই। এখানে দুই বৃদ্ধ দেশের সংকটোন্মুখ সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্বাপর নিয়ে আলাপরত। তাদের সংলাপে উঠে আসে কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের প্রসঙ্গ, কৃষ্ণের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সামনীতির কথা, নতুন উদ্যমে নগর গঠণ, রাষ্ট্র পরিচালনা, জনগনের স্বস্তি ও সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়। তাদের আকাঙ্ক্ষা একটিই – নশ্বর পৃথিবীতে মৃত্যুর পরও যেন তাদের বংশ-পরম্পরা চলে নির্বিঘ্নে। কিন্তু দ্বারকায় দুর্লক্ষণে তাদের সে আশা পরিণত হয় শঙ্কায় –

প্রথমবৃদ্ধ

আমরা ভেবেছিলাম কুরুক্ষেত্রে শোণিত ক্ষরণ
এঁকে দেবে দুঃখের অক্ষরে এক মহত্তর শান্তির ইঙ্গিত,
উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে অর্থ পাবে বীভৎস অতীত।
– কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ?

মূলত নাট্যকার দুই যাদব বৃদ্ধের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 'মৌষলপর্বে'র পূর্ব ইতিহাসের বিবৃতি দেন, বর্তমান অবস্থাটি সুনির্দিষ্ট করেন এবং সংঘটিতব্য প্রলয়ের ইঙ্গিত দেন, যার উদ্দেশ্য নাটকের ঘটনার ভিত্তি নির্মাণ এবং দর্শকের কৌতূহল উদ্রেক। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *প্রথম পার্থ* নাটকেও এইরূপ দুই বৃদ্ধের কথোপকথনকে অন্তর্প্রবিষ্ট করেন। বৃদ্ধের সংলাপ বুদ্ধদেব বসু ব্যবহার করেন এইজন্য যে তারা প্রাচীন, অভিজ্ঞ, দীর্ঘ কাল ও তার বিভিন্ন সংঘটনের সাক্ষী। ফলে, অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারসাম্য তাদের মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব ও যথার্থ। *কালসন্ধ্যা* নাটকে যাদব বৃদ্ধদ্বয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সাক্ষী, তার পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে অবগত এবং তারা যদুবংশ-ধ্বংসের বাস্তবতায়ও বর্তমান। তারাই হতে পারে দু'টি সংক্রান্তির প্রত্যক্ষদর্শী। হয়তো একারণেই বুদ্ধদেব বসু 'পূর্বকথনে' তাদের সংলাপ ব্যবহার করেন। 'পূর্বরঙ্গে' এই ধরনের সংলাপ ব্যবহারকে অনেক সমালোচকই গ্রিক নাটকের প্রভাব বলে মনে করেন। অমিয় দেবের মূল্যায়নে –

> এই পর্যায়ের প্রথম রচনা 'কালসন্ধ্যা'র গোড়ায় একটা 'পূর্বরঙ্গ' আছে। বলা বাহুল্য এটা সংস্কৃত পূর্বরঙ্গ নয়, যা নান্দীপূর্ববর্তী। এটা অনেকটা গ্রিক *প্রলোগসের* মতো – দুই যাদব বৃদ্ধ দু'দিক দিয়ে মঞ্চে ঢুকে অনুত্তোলিত যবনিকার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।[১৭]

কালসন্ধ্যা নাটকের 'পূর্বরঙ্গের' ক্ষেত্রে এ সাদৃশ্যকল্পনা অমূলক নয়। কারণ, গ্রিক নাট্যকার ইস্কিলাসের *থেবাইয়ের বিরুদ্ধে সাতজন* নামক নাটকের সাথে বুদ্ধদেব বসু 'কালসন্ধ্যা'র ঘটনার প্রতিসাম্য লক্ষ্য করেন। সেখানে রাজা আয়দিপৌস এর অভিশাপে সিংহাসন কে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে মর্মঘাতী যুদ্ধ ও পরস্পর হননের ঘটনা ঘটে,

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক যেমন গান্ধারীর অভিশাপে জ্ঞাতি-হননের ঘটনা ঘটে 'মৌষলপর্বে' । বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় – 'পড়ে কম্পিত হয়েছি আতঙ্কে ও করুণায় : দুই সহোদর ও এক পিতৃজাত ভ্রাতা, প্রকৃতিদত্ত সবচেয়ে নিকট ও সবচেয়ে হিংসাগর্ভ সম্পর্কে আবদ্ধ, যারা থেবাই নগরীর সিংহদ্বারে পরস্পরকে হত্যা করেছিলেন। আর এখন দেখছি প্রভাসতীর্থে এতেওক্লেস–পলিনাইকেস ভ্রাতারা সংখ্যায় বহুগুণে বর্ধিত হ'লো; ।'[১৮] *কালসন্ধ্যার* কাহিনীর সাথে গ্রিক নাটকের এই প্রতিসাম্যের সূত্রে ধারণা করা যায় যে, 'পূর্বরঙ্গে' দুই বৃদ্ধের সংলাপে গ্রিক নাটকের প্রভাব থাকা অযৌক্তিক নয়।

কালসন্ধ্যার 'পূর্বরঙ্গে' যে ভয় ও শঙ্কা ইঙ্গিতায়িত, তাই বাস্তবায়িত হয় নাট্যাভ্যন্তরে। প্রথম অঙ্কের শুরুতে বুদ্ধদেব বসু বাতায়নপার্শ্বে উপবিষ্ট সত্যভামা-সুভদ্রার প্রেক্ষণ এবং তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বারকাপুরীর দুর্যোগ ও অবক্ষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। সত্যভামা ও সুভদ্রা চরিত্র দু'টির সাথে পৌরাণিক 'মৌষলপর্বে'র কোনো সম্পর্ক নেই। নাটকের ঘটমান পরিস্থিতির বিবরণ ও মন্তব্যের প্রয়োজনে চরিত্র দু'টিকে কল্পনা করে নেন নাট্যকার। লক্ষণীয় যে, *মহাভারতে* বৃষ্ণি বংশের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত হয় সৌতির মুখে, যদিও 'মৌষলপর্বে'র আখ্যান শুরু হয় যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করে, তবু যুধিষ্ঠির এই ধ্বংসের বার্তা পান মাত্র, সমস্ত বিবরণ শোনার জন্য তাকে অর্জুনের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে হয়। আর অর্জুনও দ্বারকাপুরীর সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। ফলে, বুদ্ধদেব বসু নাটকের ঘটনা বিবরণে সৌতি, যুধিষ্ঠির বা অর্জুন কাউকেই ব্যবহার করেন না। তিনি এমন দু'টি চরিত্রকে নির্বাচন করেন, যারা বৃষ্ণিবংশের পুরোনারী, ঘটনার মধ্যে অবস্থান করে তার পূর্বাপর সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব। সত্যভামা ও সুভদ্রা বুদ্ধদেব বসুর নাটকের অন্যতম দু'টি চরিত্র কারণ, তারাই যদুবংশ ধ্বংসের প্রতিটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এমনকি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত কালবৃত্ত থেকে বেরিয়ে একটি নতুন কালবৃত্তে অংশগ্রহণ করে তারা। ফলে, যৌক্তিক কারণেই বুদ্ধদেব বসু সত্যভামা ও সুভদ্রার দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেন *কালসন্ধ্যা* নাটকে, তবে সম্পূর্ণ নাটকে নয়, কেবল প্রথম অঙ্কে। কারণ, বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইটি ধরনের আবহই বজায় রাখতে চান।

কালসন্ধ্যার প্রথম অঙ্কের শুরুতেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় চিত্রণের মধ্য দিয়ে দ্বারকাপুরীর নিমজ্জনের কার্যকারণটি উপস্থাপিত হয়। *মহাভারতের* 'মৌষলপর্বে' দুর্যোগের পূর্বে এক 'কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরাঃ বিকটাকার কালপুরুষ'কে দ্বারকাপুরীর ঘরে ঘরে বিচরণ করতে দেখা যায়।'[১৯] বুদ্ধদেব বসু এই অলৌকিক অংশ পরিহার করেন, তার পরিবর্তে 'কালসন্ধ্যা' নাটকে অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় চিত্র অঙ্কনের মধ্যদিয়ে দ্বারকাপুরীর নিমজ্জনের যৌক্তিক কার্যকারণ উপস্থাপন করেন। বুদ্ধদেব বসু অঙ্কিত এই আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্রটি এমন বাস্তবোচিত, যে মনে হয় পশ্চিম সাগরতীরে অবস্থিত দ্বারকাপুরীতে এইরূপ বিপর্যয় অস্বাভাবিক নয়, আবার সূক্ষ্মভাবে সেখানে পৌরাণিক প্রতিবেশও অনুভূত হয় – মনে করিয়ে দেয় গান্ধারীর অভিশাপের কথা। সুভদ্রার শঙ্কামিশ্রিত বর্ণনায় –

সুভদ্রা

নেই।
জ্যোতি বা তমিস্রা,
নিদ্রা বা জাগরণ,
আহ্নিক অভ্যাস কিছু নেই।
আকাশে জ্বলছে এক ধিকি ধিকি পিঙ্গল পিণ্ড
করাল দংষ্ট্রা কোন অসুরের মুণ্ড;
জ্বলে নেভে রক্তিম চক্ষু
মলময় তির্যক অনলে,
উদ্দাম জটা থেকে ছুটে যায় অস্থির উল্কা,
জিহ্বা বিলোল, যেন হিংস্র তরক্ষু।

Dhaka University Institutional Repository

সুভদ্রার এ বর্ণনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* (১৯৩২) কাব্যের 'শিশুতীর্থ' কবিতার সূচনা অংশের কথা –

'পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো,
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাতের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে –
ওকি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ রাঙানি!
ওকি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা!'[২০]

কিংবা অনতিক্ষণ পরেই কামোন্মত্ত, সুরাসক্ত, লুণ্ঠনোদ্যত পরস্পরঘাতী যাদবদের অবক্ষয় চিত্রের অনুরূপ ইঙ্গিতও লক্ষ করা যায় 'শিশুতীর্থে' –

সেখানে মানুষ গুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয়-ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারীর আর্তস্বরে বিলাপ করে;
বলে 'হায়হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।'
কোনো কামিনী যৌবন মদ বিলাসিত নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে,
বলে – 'কিছুতে কিছু আসে যায় না'।[২১]

এ সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকটতর হলেও তা সঙ্গত। কারণ, দেশকালভেদে মহাকালের সকল সংক্রান্তির স্বরূপ অভিন্ন প্রায়। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় যীশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে মানুষের মধ্যকার পশুশক্তির উদ্বোধনে যে কালসন্ধির সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বারকাপুরীর সামগ্রিক বিপর্যয়ে সেই কালসন্ধ্যারই প্রতিরূপ লক্ষ করা যায় আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ও এমনকি ভ্রান্তি, জীব ও জড়ের এমনি বিপর্যয়ই দেখা দিয়েছিল। সভ্যতার সংকটকালের ধর্মই এই।

কালসন্ধ্যার প্রথম অঙ্কে দুর্যোগ-চিত্রের পরই রাজপথে সুরাবিহ্বল 'অভিজাত নর-নারীর নির্বিশেষ কামোন্মত্ততার দৃশ্য চিত্রিত। দ্বারকাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, কুলীন-অকুলীন, সম্ভ্রান্ত-নিম্নজাত সকলেই এই বিলোল আনন্দে উচ্ছৃঙ্খল –

পুরুষেরা
হোক বুড়ি হোক ছুঁড়ি
হোক উগ্রসেনের খুড়ি,
চন্দ্রমুখী বিম্বাধরা
কিংবা হতশ্রী!
শোন ডাকছি!

Dhaka University Institutional Repository

রমণীরা

চল ভাঙি ওদের দর্প,
হোক বাঁদর বা কন্দর্প।
আয় সবাই মিলে দামালগুলোর
ভূত ভাগিয়ে দিই
এই আসছি।

নাটকের এই অংশ দ্বারকাপুরীর ঘটনার দৃশ্য নর-নারীর অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত ছন্দ সহযোগে অবশ্য সত্যভামা-সুভদ্রার পরোক্ষ মন্তব্যও যুক্ত হয় তার সাথে-ধ্রুবপদের মতো –

সত্যভামা
ছী-ছী-ছী!
ওরা বলছে কী!

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, *মহাভারতে* যাদবদের সুরাপান ও কামমত্ততার দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয় 'প্রভাসতীর্থে'। এ নাটকে বাস্তবসম্মত প্রতিবেশ সৃষ্টির জন্য বুদ্ধদেব বসু তা ঘটিয়েছেন নগরের রাজপথে। আর এই ঘটনায় রূপকান্বিত হয় সমকালীন কলকাতার ও মধ্যবিত্ত সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বাস্তবতা। সমালোচকের মন্তব্যে – 'পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে ১৯শতকে যে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল, বিশ শতকের ৫০/৬০ দশকে তা' আবার উগ্র হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসু মধ্যবিত্তের সেই ধিকার দেখছেন। আরো দেখছেন, বিলাসের মত্ততা আপামর জনগনের মধ্যে।'[২২] পরবর্তী দৃশ্যে জনতার উল্লাস ও ক্ষোভে রাজপথ কলমুখর। এ অংশ রাজনৈতিক আবহযুক্ত এবং সংলাপ শ্লোগানধর্মী। চিরকালের সুবিধাভোগী ক্ষত্রিয় ও রাজণ্যশ্রেণী – বসুন্ধরা এবং নারী একভাবে যাদের ভোগ্য, যাদের অন্যায় ও প্রতিষ্ঠার যূপে বলি হয় শূদ্র, বৈশ্য আর যত নিম্নজাত মানুষ, এই মহাদুর্যোগের দিনে, যখন উচ্চ-নীচ ভেদ লুপ্ত, ন্যায়-অন্যায় নির্ভেদ, তখন চিরকালের বঞ্চিত মানুষগুলো প্রতিবাদে হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ, বাধাহীন

দলপতি

আমরা ! –

যত বৈশ্য	আর শূদ্র	আর ব্রাত্য,
যত কর্ণ	একলব্য	আর শম্বুক,
যত অন্যায়	যত অবিচার	যত লজ্জা–
চাই প্রতিশোধ!	আজ প্রতিশোধ!	চাই প্রতিশোধ!

যুগ যুগ ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রতিশোধ স্পৃহায় - এরাই হয়ে ওঠে দুস্য, লুণ্ঠনকারী। পুরাণে এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কোনো উল্লেখ নেই। বুদ্ধদেব বসু দ্বারকাপুরীর অবক্ষয়ের কার্যকারণসূত্রে এই বিষয়গুলো কল্পনা করে নেন। এই বিলাস ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেই যাদবদের মধ্যে তৈরি হয় ভ্রান্তি, আধ্যাস, দুঃস্বপ্ন। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেখা যায় নানা অসঙ্গতি। যাদব নারীদের আশঙ্কা-বিহ্বল আর্তিতে –

তৃতীয় স্ত্রীলোক
আমাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রি ভ'রে ইঁদুর
খুঁটে খায় চুল, নখ, গায়ের চামড়া।

চতুর্থ স্ত্রীলোক
স্বপ্নে দেখি, আমাদের বুকের দুধ শুষে নিচ্ছে
বিকট জোঁক, রক্তমুখী বাদুড়;

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণে যে দুর্লক্ষণগুলো অলৌকিক রূপে বিধৃত, বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যায়* সেগুলোকে চিত্রিত করেন মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি রূপে – স্বপ্ন, ভ্রান্ত বা অলীক প্রত্যক্ষণ ও শ্রুতির বিভ্রান্তি (*halucination*) হিসেবে। বুদ্ধদেব বসুর নাটকে সম্পূর্ণ বিষয়টি একটি স্নায়ুবিক বিপর্যয়। এইসব অসঙ্গতি, অজাচার, বিশৃঙ্খলা ভুলে থাকতে সত্যভামা ও সুভদ্রা অতীতের স্মৃতিচারণ করে। কিন্তু, তার ফলে জেগে ওঠে পুরনো ক্ষত। সত্যভামার স্মৃতিতে জাগে তার পিতা ভূরিশ্রবার হত্যার নৃশংস অতীত, সুভদ্রার মাতৃহৃদয়কে করুণায় উদ্বেলিত করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত পুত্র অভিমুন্যর স্মৃতি। সত্যভামা ও সুভদ্রা বীভৎস অতীত ভুলে ভুক্তাবশিষ্ট বর্তমানে স্থিতি চায়। প্রকৃতপক্ষে, এ নাটকে সত্যভামা-সুভদ্রা কেবল ঘটনার সূত্রধর কিংবা মন্তব্যকারীই নয়, তাদের দু'জনের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অতীতকে বারবার স্পর্শ করতে চান। কারণ, বুদ্ধদেব বসুর নিকট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও দ্বারকাপুরী ধ্বংস অবিচ্ছেদ্য ঘটনা-পরম্পরা এবং একমাত্র স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়েই সেই যুদ্ধ ধ্বস্ত অতীতকে বর্তমানে জাগ্রত করা সম্ভব।

কালসন্ধ্যার প্রথম অঙ্কের পরবর্তী অংশে যদুবংশের ধ্বংসের প্রত্যক্ষ পটকে স্থগিত রেখে নাট্যকার আবার পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কৃষ্ণের আর্বিভাব ঘটে মঞ্চে। সত্যভামা ও সুভদ্রাকে তিনিই অবগত করেন সাত্যকি ও কৃতবর্মার পরস্পর হত্যার ঘটনা ও যাদবদের জ্ঞাতি-ধ্বংসের বিবরণ। যাদবদের আত্ম-ধ্বংসের চূড়ান্ত ঘটনাটি বুদ্ধদেব বসু উপস্থাপন করেন কৃষ্ণের নিরাসক্ত প্রেক্ষণবিন্দু থেকে –

কৃষ্ণ

মাটি থেকে একমুষ্ঠি এরকা নিলাম তুলে;
স্পর্শ মাত্রে প্রতি তৃণ পরিণত হ'লো
বজ্রতুল্য কঠিন মুষলে:
হ'লো তারা ধাবমান অবিরাম আপন আবেগে,
তুলি তৃণ – যাদবেরা প'ড়ে যায়
কৃষকের উৎকলিত ধানের গুচ্ছের মতো,
অথবা ব্যাধের
বাণবিদ্ধ যেন হংসশ্রেণী।

যাদবদের সংহরণ-চিত্র বর্ণিত হয় কৃষ্ণের কবিত্বময় দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে, যাকে বলে ঘটনার শীর্ষবিন্দু (*Climex*), তা এ নাটকে তেমন গুরুতরভাবে অনুভূত নয়। এমনকি রাজপথে যাদবদের মত্ততায় নাটকে যে গতি সঞ্চারিত হতে দেখা যায়, তাও এখানে রহিত। এর কারণ, প্রলয়রূপী মহাকাল নিরাসক্ত। তার নিকট সৃষ্টি ও ধ্বংস সমার্থক। আর কৃষ্ণই যেহেতু মূর্তিমান কাল এবং স্বহস্তে সংহার করেন তার জ্ঞাতিবর্গকে, সুতরাং, তাঁর চরিত্রের নিরাসক্তি ও দর্শন স্বভাবতই প্রতিফলিত হয় তার সংলাপে – 'দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব;/ যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন-/ সব দ্বন্দ্ব:' এমনকি অর্জুনের প্রতি প্রেরিত তাঁর বার্তাও তেমনি নিরাসক্তিময় – 'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো/ ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মুষ্টিকেরা তাও আর রাখলো না বাকি।' এ নাটকে বুদ্ধদেব বসু কৃষ্ণকে সৃষ্টি করেন দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের সমন্বয়ে। কারণ, 'আদর্শ মানুষের আঁটোসাঁটো ফ্রেমের মধ্যে তিনি ছোট হ'য়ে যান, শতকরা একশো পরিমাণে ঈশ্বর বললেও হ'য়ে পড়েন অবাস্তব ও ভূমিস্পর্শহীন।'[২৩] কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব লক্ষ করা যায় তাঁর মরত্বে, সংহারক সত্তায়, অপরদিকে মুনষ্যত্ব লক্ষ করা যায় তাঁর ক্লান্তি, নিস্পৃহা ও উদাসীনতায়, – যেন সমস্ত জীবন ক্লান্তিহীন কর্মের পর কর্ম বিরতিতে উপনীত কৃষ্ণ। দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাই অর্জুনের সাথে কথোপকথনরত। দ্বারকাবাসী নির্বংশ হবার ঘটনায় বিচলিত অর্জুনকে কৃষ্ণ তাঁর মহাকাল-স্বরূপ ও দার্শনিক উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন – চেতনার গভীরতল থেকে উঠে আসে তাঁর শব্দাবলি –

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ

অর্জুন, তুমি ও আমি -
আর যারা আমাদের সঙ্গে ছিলো, শত্রু বা সুহৃদ,
ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দ্রোণ, দুর্যোধন
ভীষ্ম, ভীম, যুধিষ্ঠির, শকুনি, বিদুর,
গান্ধারী, দ্রৌপদী, কুন্তী :
আমরাও ধূসর কাহিনী মাত্র
বিশ্বের বাতাসে ভাসমান
আর তাই অশেষ, আবহমান।

কৃষ্ণ ও অর্জুনের এই কথোপকথন দৃশ্য *মহাভারতে* নেই। *মহাভারতের* কাহিনী অনুযায়ী বাসুদেবের মুখে কৃষ্ণের বার্তা পেয়ে অর্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হবার পূর্বেই জরা নামক ব্যাধের তীরে ভূতলশায়িত কৃষ্ণ তাঁর মৃত্যু ঘটান এবং আকাশমন্ডল উদ্ভাসিত করে স্বর্গগমণ করেন।[২৪] ফলে, এই দৃশ্যটি বুদ্ধদেব বসুর কল্পিত। এ নাটকে কৃষ্ণের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয় আরো পরে 'উত্তরকথনে' ব্যাসদেবের মুখে। দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ অর্জুনকে তার করণীয় বুঝিয়ে দিয়ে মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়। গমনরত কৃষ্ণকে দেখায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ এক বৃদ্ধের মতো এবং কৃষ্ণ তিরোহিত হবার সাথে সাথে অর্জুনকেও অনুরূপ এক ন্যুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধের মতো দেখায়। নাটকের এই বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, প্রতীকী। এখানে কৃষ্ণ তার সমস্ত কর্মের অবসানে ক্লান্ত, জরাক্রান্ত প্রাণ। জরা নামক ব্যাধের বাণে মৃত্যুর পরিবর্তে জরাগ্রস্ত কৃষ্ণের বার্ধক্যজনিত স্বাভাবিক মৃত্যকে ইঙ্গিত করতে চান বুদ্ধদেব বসু। কারণ, মহাভারতের হিসাব অনুযায়ী যদুকূল ধ্বংসের সময় বয়স ছিল তাঁর বয়স ছিল শতোত্তর। আর অর্জুনকে হঠাৎ জরাজীর্ণ, লোলচর্ম বৃদ্ধ দেখাবার যে কারণ প্রতীকান্বিত তা হলো – অর্জুনের সমস্ত বীরত্ব ও কীর্তির নেপথ্য শক্তি ছিলেন কৃষ্ণ। সেই কেশব যখন তাকে ত্যাগ করেন, তখনই অর্জুন হয়ে পড়েন নিঃশক্তি, বীর্যশূণ্য। ফলে, তাকেও জরাগ্রস্ত মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু মনে করেন কৃষ্ণ বা অর্জুনের এ বার্ধক্য বহিস্থ নয়, হৃদয়গত। কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অসংখ্য অপরাধের ভারে তাঁরা অবনত, ভগ্নদেহ, জরাগ্রস্ত। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় – 'যে বার্ধক্যে তাঁরা দষ্ট হয়েছেন, সেটা কালানুক্রমিক নয়, চারিত্রিক, ইন্দ্রিয়ের নয়, আত্মার। কেউ নিস্তার পাননি, পেতে পারেন না;।'[২৫] বুদ্ধদেব বসু বাস্তবোচিতভাবে চরিত্রদ্'টির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়কে প্রতীকান্বিত করেন। কৃষ্ণ অর্ন্তর্হিত হবার পরের দৃশ্যেই আমরা লক্ষ করি দুস্যদের আক্রমণের সামনে অর্জুন এক নিরুপায় দর্শক, তাদের উপহাসের পাত্র। তাঁর গাণ্ডীব হয়ে ওঠে গুরুভার, শর হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট, তূণ হয় নিঃশেষ। সমস্ত দিব্যাস্ত্রের আহবানমন্ত্র তিনি বিস্মৃত হন। তাঁর চোখের সামনে লুণ্ঠিত হয় সব সম্পদ, অপহৃত হয় যাদব নারীরা। কৃষ্ণবিহীন অর্জুন যেন পরিত্যক্ত, জড়সর্বস্ব, জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ –

অর্জুন

একী!
আমি একা – কৃষ্ণ নেই!
অন্তহীন মহাশূন্যে
আমি যেন মজ্জমান–শরীরসর্বস্ব জড়।
শ্রুতি নেই শ্রবণে, দ্যাখেনা চক্ষু, ত্বকে আর নেই স্পর্শবোধ,
ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে না –
নির্বাপিত, নষ্টবল, নিঃশেষ অর্জুন,
ধিক তোকে, ধিক তোকে, ধিক শতবার !

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন ব্যতীত, দুস্যদের আক্রমন-লুণ্ঠন-উল্লাস এবং অর্জুনের পরাজয়ের অংশটি প্রত্যক্ষভাবে ছন্দ-সহযোগে চিত্রিত। এভাবে সমস্ত নাটকেই কখনো প্রত্যক্ষ সংঘটন, কখনো পরোক্ষ সংলাপ নিয়ন্ত্রণ করে নাটকের গতি ও উত্থান-পতন।

'উত্তর কথনে' সম্মুখে দণ্ডায়মান হৃতসর্বস্ব অজুনের উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব উচ্চারণ করেন মহাকালের সেই আদিসত্য, যার ইঙ্গিত দ্বারকাপুরীর ধ্বংসকে ছাড়িয়ে আরো বহুদূর পর্যন্ত প্রসারী। *মহাভারতে* ব্যাসদেবের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল ক্ষয়হীন, আকারহীন, ধ্বংস ও সৃষ্টিকারী এই মহাকালের নিরাসক্ত চরিত্রের কথা – 'ফলতঃ কালই জগতের বীজস্বরূপ। কাল প্রভাবেই সমুদায় সমুৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে। কালই বলবান্ হইয়া আবার দুর্ব্বল এবং ঈশ্বর হইয়াও অন্যের আজ্ঞাবহ হয়।'[২৬] *মহাভারতে* আদিকবির উপলব্ধি থেকে যে সত্য উচ্চারিত হয়, একালে আধুনিক নাট্যকারের জীবনোপলব্ধির সাথে একীভূত সূত্রে তাই উচ্চারিত হয় *কালসন্ধ্যায়* বেদব্যাসের মুখে –

ব্যাসদেব

কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী ও শ্মশান,
যা ঘটায়, নিরন্তর আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি, অবক্ষয়, অবলুপ্তি,
আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস,
আনে যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু, যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য-ঘাতকের স্থান-বিনিময়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় *কালসন্ধ্যায়* অর্জুন ও কৃষ্ণের পরিণাম এবং নাটকের এই পরিণামী দর্শনকে নিয়তির কাছে নাট্যকারের আত্মসমর্পণ ও ব্যর্থতাবোধের রূপায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বুসর *মহাভারত* বা ইতিহাস পাঠের আংশিকতাকে দায়ী করেন – সর্বোপরি *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র সাথে তুলনাসূত্রে *কালসন্ধ্যাকে* নাট্যকারের দুর্বলতর নির্মাণ বলে মন্তব্য করেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে – *কালসন্ধ্যায় সেই* অর্থে সভ্যতার বর্তমান চেহারা প্রতিফলিত। আদর্শ এবং আদর্শঋদ্ধ অথরিটির সঙ্গে জনতা ও জননায়কের বিচ্ছেদ, অথারিটির বিবর্ণ প্রস্থান ও নায়কের পতন এ নাটকের প্রধান ঘটনা। ছন্দোবদ্ধ কবিতার সার্বিক ব্যবহারে এর কবিত্ব অধিকতর স্বাবলম্বী। কিন্তু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র তুলনায় গাঠণিক কবিত্বের বিচারে এ দীন। ঋষ্যশৃঙ্গ যেমন এক শ্রেয়োতর বেলাভূমি পেয়ে গেল, তরঙ্গিণীর সঙ্গে তার সমান্তরতাও যেমন হয়ে উঠল অন্তর্বন্ধনে যুক্ত – কৃষ্ণ-অর্জুনের বিচ্ছেদে সেরকম কোনো উত্তরণের ইঙ্গিত নেই। এক মহাভাবিতব্যকে মেনে নেওয়াই বুঝি বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত ও ইতিহাস পাঠের ফল। এক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাস পাঠ একাংশিক।'[২৭]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কক্‌তোর *ইনফার্নাল মেসিনের* সাথে তুলনা করে *কালসন্ধ্যা* সমকালীন আধুনিক বাস্তবতারও অভাব বোধ করেন – 'কিন্তু ককতো যেমন পর্দা সরিয়ে পুরাণের আলো ফেলে পৌঁছে যান আধুনিক বিপন্ন সভ্যতারই মর্মান্তিক প্রতিরূপে – বুদ্ধদেব সেখানে বহির্দ্বারেই থাকলেন স্তব্ধীভূত। তাঁর অর্জুন হতে পারলনা আধুনিক কোনো রাজনৈতিক নায়ক, কৃষ্ণ হতে পারল না আধুনিক অর্থে কোনো তত্ত্ববিশ্বপ্রণেতা।'[২৮] কয়েকটি বিষয় লক্ষ করলে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ মন্তব্য যথার্থ বলে গ্রাহ্য হয় না। প্রথমত, নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, বরং বুদ্ধদেব বুস *কালসন্ধ্যায়* মহাকালের এক চিরন্তন সত্যকে অবলম্বন করেন, যা বাস্তবাধিক বাস্তব, সত্য অপেক্ষা সত্য, অমোঘ, অলঙ্ঘণীয়। মহাকালের এই ভাঙাগড়াকে বুদ্ধদেব বসু 'নিয়তি' বলেই মনে করেন না, বরং এক অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক বাস্তবতা বলেই গণ্য করেন এবং ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে, পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে এই ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন। প্রথম অঙ্কে কৃষ্ণের মুখে সেই কথাই উচ্চারিত হয় –

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণ
জেনো এই ধ্বংস – এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এল বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।

ফলে, যেহেতু এই কালগ্রাস প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও কার্যকারণেরই নামান্তর, সেহেতু কৃষ্ণের অন্তর্ধান 'অথরিটির বিবর্ণ প্রস্থান' নয়, বরং সত্যোপলব্ধিজাত নিরাসক্তি থেকে স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রান্তি। আর অর্জুনের যুদ্ধ ও পরাভব নিয়তির বিরুদ্ধে নয়, এই প্রবল পরাক্রম কালের বিরুদ্ধে তা মূঢ় অর্জুনের আস্ফালন মাত্র। অর্জুন মূঢ়, পরাজিত, কারণ কালবিপর্যয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ – কালপ্রবাহে সকলেই যে একদিন স্মৃতি হতে বাধ্য, বীরত্ব-মহত্ত্ব সমস্ত কিছুই যে সেখানে আপেক্ষিক – এ সম্পর্কে তিনি অজ্ঞান। প্রজ্ঞাবান ব্যাসদেবের তিরস্কারে – ' কিন্তু এতে তুমি কেন হতাশ্বাস?/এ-ই কি যথেষ্ট নয়, তুমি আজ অন্যদের স্মৃতি,/ভূর্জপত্রে অবিরল নবজাত/ভবিষ্যতে উত্তীর্ণ অতীত এক চিরবর্তমান?/তুমি পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো/অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ/শেখো:/অনাচার, সদাচার ধর্মাধর্ম, সব আপতিক/যা-কিছু সময়োচিত,তা-ই যথাযথ।' সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সূত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়,তা হলো '*কালসন্ধ্যা*'য় অর্জুন কিন্তু নায়ক নন, বরং এটি তাঁর নায়কত্বের নির্মোক উন্মোচনের পর্ব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং অসংখ্য বীরোচিত কর্মের জন্য নন্দিত অর্জুন আসলে ছিলেন কৃষ্ণের হাতের ক্রীড়াণক মাত্র, কৃষ্ণ তাঁকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হবার পূর্বে সে সত্য অবহিত করে যান অর্জুনকে –

কৃষ্ণ
মনে হয় কয়েক মুহূর্ত শুধু,
কিংবা বহুকাল
চিরকাল ধ'রে আমি
ছিলাম তোমার সঙ্গে – লক্ষ্য বা অলক্ষণীয়:
পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে, খাণ্ডবদাহনে
কুরুক্ষেত্রে, স্বর্গে, মর্ত্যে, বনবাসে, সংহারে, বিজয়ে
এমনকি পানে, স্নানে, ভোজনে, বিশ্রম্ভালাপে,
এমনকি বাসরশয্যায়।
মনে হয় তোমার জন্য আমি
বলি দিয়েছিলাম কর্ণকে; আর একলব্যের ঘাতক,
তাও আমি – দ্রোণ নন, অন্য কেউ নন।

যেহেতু মহাকাল ক্ষমাহীন এবং কালের বিচারে 'অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়', ফলে কালের নিয়মে প্রকৃত সত্যের উন্মোচনের প্রয়োজনেই 'অথরিটি'র সঙ্গে 'জননায়কে'র বিচ্ছেদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেজন্যই কৃষ্ণ তিরোহিত হবার সাথে সাথে অর্জুন হন হতবীর্য ও নিঃসম্বল, প্রতীকী অর্থে। সুতরাং, অর্জুনকে নায়কোচিত মর্যাদা দান কিংবা নিয়তির বিরুদ্ধে তাঁকে পরাজিত প্রতিপন্ন করা – কোনোটিই বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশ্য নয়। আর অর্জুনকে আধুনিক কোনো 'রাজনৈতিক নায়ক' কিংবা কৃষ্ণকে 'আধুনিক তত্ত্ববিশ্বপ্রণেতা' হিসেবে সৃষ্টি করতে বুদ্ধদেব বসু ব্যর্থ নন, বরং তা তাঁর অভিপ্রায়ই নয়। পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, আধুনিক শিল্পীদের সাথে বুদ্ধদেব বসুর মিথ-চেতনা ও মিথ-নির্মাণে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ককতো যেখানে সমকালীন বাস্তবতাকে রূপকান্বিত করার জন্য পুরাণের প্রচ্ছদমাত্র ব্যবহার করেন, সেখানে বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে কেবল আধুনিকতা সৃষ্টি কিংবা সমকালীনতাকে পুরাণের প্রতিরূপকে উপস্থাপনই একমাত্র নয়। পূর্বেই আলোচিত যে, বুদ্ধদেব বসু বর্তমান অপেক্ষা চিরত্বে অধিকতর বিশ্বাসী,

Dhaka University Institutional Repository

কারণ তা ত্রিকাল-সঞ্চারী, তাতে সমকালীনতাকেও আশ্রয় করা হয়। ভবিষ্যতেরও নির্দেশনা পাওয়া যায়। কোনো প্রকট আরোপিত আধুনিকতা নয়, বরং বুদ্ধদেব বসু তাঁর *কালসন্ধ্যায়* সেই চিরায়ত মহাকাল-বাস্তবতাকেই অঙ্গীকার করেন। এই মহাকালই *কালসন্ধ্যা* নাটকে যুগপৎ 'নায়ক' এবং 'তত্ত্ববিশ্বপ্রণেতা' – কোনো বিশেষ কালের নয়, চিরকালীনরূপে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাল-সম্পর্কিত দর্শনকে *মহাভারতের* 'মৌষলপর্বে'র আশ্রয়ে শিল্পিত করেন *কালসন্ধ্যা* নাটকে। 'পূবরঙ্গ' ও 'উত্তরকথন'সহ দুই অঙ্কের নাটকটি কাঠামো বিন্যাসে প্রচলিত ধারার অনুসারী নয়, আধুনিক ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এ নাটকে বুদ্ধদেব বসু 'মৌষলপর্ব'কে নিজের অভিজ্ঞান ও কল্পনা দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেন, সত্যভামা-সুভদ্রার মতো নতুন চরিত্রের সংযোজন করেন, চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক অবয়র নির্মাণ করেন এবং পুরাণের অলৌকিকতা বর্জন করে বাস্তবনুগ প্রতিবেশ ও আবহ তৈরি করেন। দ্বন্দ্ব-সংকট-উত্তরণের প্রচলিত নাট্য কাঠামোয় *কালসন্ধ্যা* নির্মিত নয়, বরং খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যের সংযোজনে এর অন্তর্বয়ন অনেকটা কোলাজধর্মী, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়, বরং মহাকালের নিরাসক্ত চরিত্রধর্মে নাটকটি অন্তর্স্বভাবে কখনো কখনো ঈষৎ ক্লান্তিকর, বিশেষত কৃষ্ণের উপস্থিতি রয়েছে যেসব অংশে। বুদ্ধদেব বসুর *সংক্রান্তি* নাটকের মতো এ নাটকটি সম্পূর্ণ পরোক্ষভাবে নির্মিত নয়। এখানে যেমন চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে পরোক্ষভাবে ঘটনা বর্ণিত হয়, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাকে দৃশ্যমান করে তোলা হয়। যেমন সত্যভামা, সুভদ্রা কিংবা কৃষ্ণের সংলাপে পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয় যদুকুল ধ্বংসের বৃত্তান্ত, আবার অর্জুন ও অবশিষ্ট দ্বারকাবাসীর প্রতি দুস্যদের আক্রমণের ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত হয়। এভাবে কখনো দর্শন, কখনো নাটকীয়তা, কখনো উপলব্ধি, কখনো সংঘটন, কখনো ছন্দ, কখনো বৈতালিক নিরাসক্তিতে *কালসন্ধ্যা* এক বহুবর্ণিল, স্বাতন্ত্র্যধর্মী শিল্প।

অনাম্নী অঙ্গনা

কালসন্ধ্যা নাটকের অন্তর্গঠন যেখানে সুগভীর তাৎপর্যে নিরাসক্ত সেখানে *অনাম্নী অঙ্গনার* কাঠামো মহত্তর উদ্ভাসনের চেতনায় সূক্ষ্মভাবে উদ্দীপনাময়। *তপস্বী ও তরঙ্গীতে* প্রতিফলিত বুদ্ধদেব বসুর কামচেতনারই ভিন্নতর উত্তরণ নিয়ে রচিত *অনাম্নী অঙ্গনা*।

মহাভারতের 'আদিপর্বে'র 'সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়' থেকে *অনাম্নী অঙ্গনার* আখ্যানসূত্র আহৃত। মহাভারতের এই আখ্যান-অংশটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত – অম্বিকা ও অম্বালিকা- দুইপত্নীর সঙ্গে সাত বছর নিরন্তর বিহার করে যৌবনকালেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু ঘটলে সত্যবতী বংশরক্ষার নিমিত্তে ভীষ্মের শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁর কৌমার্যব্রতে অনড় থাকেন এবং ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের পরামর্শ দেন। সেই লক্ষ্যে সত্যবতী ব্যাসদেবকে আহ্বান করলে ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্রের জন্ম দান করেন। কিন্তু ব্যাসদেবের ভীষণ-দর্শন কায়া ও উৎকট গাত্রগন্ধে রাজবধূদ্বয় ভীত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বিকলাঙ্গরূপে জন্ম নেন। ফলে, রাজ্য পরিচালনায় তাঁদের আসমর্থ্য বিবেচনা করে সত্যবতী আবার অম্বিকাকে নির্দেশ দেন পূর্ব-প্রক্রিয়ায় পুত্রোৎপাদনের। অম্বিকা ভীত হয়ে তার স্থলে রাজপ্রাসাদের এক অপ্সরোপমা দাসীকে সজ্জিত করে ব্যাসদেবের শয্যায় প্রেরণ করেন। দাসীর শুশ্রূষায় ও তার সহযোগে প্রীত হয়ে ব্যাসদেব তাকে বর দেন এই বলে যে, তার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরম ধার্মিক হবে। সেই দাসী- গর্ভজাত পুত্রই পরবর্তীকালে বিদুর নামে খ্যাত হন।[২৯] পুরাণের এতো সংক্ষিপ্ত একটি আখ্যানকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কল্পনা দিয়ে বিস্তৃত করে একটি একাঙ্ক কাব্যনাটকরূপে নিমার্ণ করেন *অনাম্নী অঙ্গনার*। এ নাটকে প্রধান চরিত্র যে অঙ্গনা, *মহাভারতে* তার উপস্থিতি একটিবারের জন্য লক্ষ করা যায় – রাণী অম্বিকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত এক সামান্য শূদ্র দাসী। বুদ্ধদেব বসু পুরানের

Dhaka University Institutional Repository

এই উপেক্ষিত চরিত্রটিতে সংবেদনা ও সূক্ষ্মতাবোধ সঞ্চার করে তাকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন – রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দার্শনিক উপলব্ধিতে তাকে সৃষ্টি করেন স্বাধীন, আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বরূপে।

একাঙ্ক নাটক *অনাম্নী অঙ্গনা* সম্পূর্ণভাবে নারীচরিত্র কেন্দ্রিক নাটক – কখনো কখনো পুরুষ চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। যেমন সত্যবতীর মুখে পরাশর, অম্বিকার মুখে বিচিত্রবীর্য, অঙ্গনার মুখে ব্যাসদেব। এক অঙ্কের নাটক *অনাম্নী অঙ্গনায়* দৃশ্য বিভাজন না থাকলেও এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি দৃশ্য কল্পনা করা যায় – প্রথম দৃশ্যে অঙ্গনা তার সাথীদের সাথে কথোপকথনে রত, দ্বিতীয় দৃশ্যে সত্যবতী ও অম্বিকার বাদানুবাদ, তৃতীয় দৃশ্যে অম্বিকাও অঙ্গনার সংলাপ-বিনিময়, চতুর্থ দৃশ্যে আবার অম্বিকার সাথে রূপান্তরিত অঙ্গনার উক্তি- বিনিময় এবং অঙ্গনার প্রতীকী গানের মধ্য দিয়ে নাটক সমাপ্ত হয়।

*তপস্বীও তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসু যেমন গাঁয়ের মেয়েদের বৃষ্টি বন্দনার মধ্য দিয়ে তাদের দুঃখ-চিত্র অঙ্কন করেন, *কালসন্ধ্যায়* যেমন দ্বারকাপুরীর নিম্নজাত মানুষের শোষণ বঞ্চণা ও ক্ষোভের দৃশ্যায়ন করেন, তেমনি *অনাম্নী অঙ্গনার* প্রথম দৃশ্যে অঙ্গনার সূত্রে নাট্যকার রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরের দাসীদের জীবনের বঞ্চণাও বন্দীত্বের প্রতিবেশ নির্মাণ করেন। তাদের অনার্য জীবনের স্বপ্ন, সাধ, ব্যর্থতা ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে সৃষ্ট এই অংশটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং নিঃসন্দেহে তা পুনর্নির্মাণ। নাটকের প্রচ্ছদ উম্মোচিত হয় অঙ্গনার গানে, যে গানে ধ্বনিত হয় তার নতুন জীবনের স্বপ্ন – ছোট্টকুটির, খড়ের চালে রোদের সোনা আর তেতুল তলার শিউরে ওঠা ছায়া নিয়ে। অন্তঃপুরে তার সাথীরা, যারা তারই মতো একই দুভাগ্যে বন্দিনী, তাদের অবদামিত অন্তরাত্মা যেন ক্ষণিক মুক্তি পায় অঙ্গনার স্বপ্নে। কিন্তু, যেহেতু তারা বক্ষার অধমাঙ্গ থেকে সৃষ্ট, তাই তাদের স্বপ্ন দেখা নিষেধ, অঙ্গনার ভাষায়-'কিন্তু আমরা উত্তম দাসী, তাই অর্ধেক মাত্র নারী।' দাসীপণ সত্ত্বেও রাণী অম্বিকা তার পরিচারিকা অঙ্গনাকে মুক্তি দিতে অসম্মত – এ কথা শুনে তার বেদনার সাথে সখীরাও একাত্ম হয়। কারণ, একই বঞ্চনায় তাদের বেদনা ও অঙ্গনার বেদনা একীকৃত –

অঙ্গনা

.. কিন্তু দেবী অম্বিকা
আমাকে মুক্তি দিতে সম্মত নন –
(ব্যঙ্গ ও বেদনামিশ্রিত সুরে)
তিনি আমাকে স্নেহ করেন।

তৃতীয় সখী

(তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে)
পক্ষিণীর প্রতি মাংসাশী যেমন স্নেহশীল।

দ্বিতীয় সখী

যেমন গাভীর প্রতি দুগ্ধজীবী ব্রাহ্মণ।

প্রথম সখী

যেমন মৃগের প্রতি মৃগায়াসক্ত ক্ষত্রিয়।

যত রুদ্ধ বেদনায় তারা এতদিন ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসেছে, এই উপলক্ষে তাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা ও ক্রোধ যেন ভাষা পায়। অঙ্গনা যেন সেই মুহূর্তে হয়ে ওঠে নিম্নজাত এইসব শ্রমশীল নারীদের প্রতিনিধি –

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গনা

... কেন, মেনে নিতে হবে।
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ–তাঁরা দেবতার প্রিয়।
ভূমি নয়, বিত্ত নয়, বেদমন্ত্র নয় –
তাঁদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ –স্বাধীনতা।
বেশ্যারমণ, পরদারগমন, পরপুরুষের সংস্রব,
বিধবার গর্ভে সন্তান, কুমারীর গর্ভে সন্তান –
সব শ্লাঘ্য তাঁদের পক্ষে। কেননা তাঁরা
তৃপ্তিহীনভাবে দোহন করেন বসুন্ধরা ও বৈকুণ্ঠ,
হরিৎ ও নীল বর্ণ দুই কামধেনুর মতো।
কেননা তাঁরা প্রবল।
আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন,
আমরা শুধু দেখে যাবো - মেনে নেবো - কথা বলবো না।

বুদ্ধদেব বসু শ্রেণীচেতনার আদর্শে বিশ্বাসী নাট্যকার নন। কিন্তু *অনাম্নী অঙ্গনায়* রাজ-অন্তঃপুরের অঙ্গনাদের এই অবদমিত ক্ষোভের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি জাগ্রত করেন শ্রেণীচেতনাকে। *মহাভারতের* আর্য-জীবনের শৌর্য-বীর্যের অন্তরালে চাপা পড়ে থাকা প্রাকৃত জনের বেদনাকে বুদ্ধদেব বসু রূপায়ণ করেন তাঁর স্বাভাবিক ধর্মে। *মহাভারতে* কর্ণ, একলব্য – এঁদের বঞ্চনাকে এখন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করা হয় কিন্তু, এদের চেয়েও যারা ভয়াবহভাবে উপেক্ষিত, যাদের গোপন বেদনা চিরদিন অবরুদ্ধই থেকে যায়, সেইসব নারীদের কথা বুদ্ধদেব বসু চিত্রিত করেন তাঁর নাটকের এই অংশে। দৃষ্টিভঙ্গিটি নিঃসন্দেহে আধুনিক। তবে, রাজপ্রাসাদের পুরোনারীদের সেবায় নিযুক্ত এইসব অঙ্গনাদের বেদনার উন্মোচনই এই নাটকের মূল লক্ষ্য নয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র অঙ্গনার জীবনের প্রেক্ষাপট নির্মাণের প্রয়োজনে এবং তার রূপান্তরের বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যেই বুদ্ধদেব বসুর এই প্রয়াস।

অনাম্নী অঙ্গনার দ্বিতীয় দৃশ্য সত্যবতী ও অম্বিকা কেন্দ্রিক। পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র জন্মের পর সত্যবতী কর্তৃক রাজবধূ অম্বিকার প্রতি পুনর্বার বেদব্যাসের সাথে মিলনের অনুরোধকে কেন্দ্র করে এ দৃশ্য নির্মিত। *মহাভারতে* এ বিষয়ে অম্বিকার কোনো অনুযোগ বা আপত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা নেই। বুদ্ধদেব বসু অম্বিকার চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে জাগ্রত করার প্রয়োজনে এ অংশ সৃষ্টি করেন। বংশরক্ষার তাগিদে অম্বিকা একবার মিলিত হয় ব্যাসদেবের সঙ্গে। সে অভিজ্ঞতা তার জন্য বিভীষিকাময়। তার ফল অন্ধ শিশুপুত্র 'ধৃতরাষ্ট্রে'র জন্ম। কোনো তরুণ সুদর্শন ব্রাহ্মণ কিংবা রতিউদ্দীপক কোনো দৃষ্টিনন্দন, পুরুষ নয়, 'রুচিরহিত গাভীর মতো' পুনর্বার সেই ভীষণদর্শন, উৎকট পুরুষের সাথে মিলিত হওয়া বিদগ্ধ রাজবধু অম্বিকার পক্ষে স্বভাবতই পীড়াদায়ক। তাই সত্যবতীর নিকট তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন –

সত্যবতী

সেই রুক্ষ জটাজুট–দুর্গন্ধ –রক্তিম, ঘূর্ণিত লোচন,
দগ্ধ কাষ্ঠের মতো গাত্রবর্ণ, যাতে রাত্রির স্বাভাবিক অন্ধকার
হয়ে ওঠে অভেদ্য, যেন রুদ্ধ ক'রে দেয় নিঃশ্বাস –
আবার সেই।
মাতা আমাকে দয়া করুন, আমি পারবো না।

অম্বিকার নারীত্বের এই সংকট, রাজনীতির স্বার্থে নারীত্বের অবমাননা আধুনিক নারীবাদী সমালোচকদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়িত হয়েছে কঠোরভাবে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ঘটনা ধর্ষণেরই নামান্তর –

> এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সত্যবতী তার দুই পুত্রবধূদের শুধুমাত্র বংশরক্ষার তাগিদে তাঁর কুমারী অবস্থার পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে (যা কিনা ক্ষেত্রজ নয়, বৈধ হিসেবে গণ্য নয় তৎকালীন সমাজের সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী) দিয়ে ঐ দুই নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই দেহ মিলনের ফরমান জারি করে দিলেন। কালের ক্রমবিকাশের পর্ব পেরিয়ে আজকের মিলিত মনের এবং বিবর্তনশীন মূল্যবোধের সামনে ঐ ফরমান শুধু একটি প্রশ্নচিহ্নিত নয় বরঞ্চ ধর্ষণ সংজ্ঞায় অভিযুক্ত একটি অতি ঘৃণিত স্বার্থচিন্তা। সঙ্গত কারণেই এই ঘটনা মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটের ধ্রুপদী ব্যাপ্তিকে যেমন খণ্ডিত করে, তেমনি দু'টি অসহায় নারীর স্বাধীন আকাশকে আড়ালও করে। সম্মতিবিহীন দেহমিলন শুধুমাত্র মানসিক ক্ষেত্রেই নয়, আইনত ধর্ষণই। মহাভারতের অন্যান্য বৈপরীত্যের মধ্যে এটিও একটি।[৩০]

যদিও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটক রচনা বুদ্ধদেব বসুর অভিপ্রায় নয় তবু, *অনাম্নী অঙ্গনা* যেহেতু নারীপ্রধান নাটক, ফলে স্বভাবতই কখনো কখনো নাট্যকারের নারীবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। আধুনিক সমালোচকদের, সত্যবতী তার পুত্রবধূদের 'স্বাধীনতা খোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন যন্ত্র ও ক্ষমতাহীন করে রাখার চক্রান্তে লিপ্ত' এক নারী।[৩১] কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে মহাভারতের প্রতিবেশ ও আবহ বজায় রেখে সত্যবতীকেও এক মানবিক নারীরূপে উপস্থাপন করেন, যাকে একদিন কুমারী অবস্থায় মধ্যযমুনায় ভাসমান তরণীর উপর কামার্ত পরাশর মুনির নিকট সমর্পিত হতে হয়েছিল। অম্বিকাকে নিজের প্রস্তাবে ইচ্ছুক করে তোলার জন্য সত্যবতীর মুখে সে ঘটনা বর্ণিত হয় অসাধারণ কবিত্বে –

সত্যবতী

কেন আমার চক্ষু বুজে এলো
সুখে না আশঙ্কায় – তাও জানিনা।
আমার লজ্জা, আমার ভীরুতার উপর
মুনি নামিয়ে আনলেন গাঢ় যবনিকা,
কুজঝটিকায় ঢেকে দিলেন দিগন্ত –
নদী লুপ্ত, আকাশ লুপ্ত – একটি তরণী শুধু ভাসমান।
এমনি ক'রে মুনির সঙ্গে ধীবরকন্যার মিলন হ'লো।

ক্ষত্রিয় নারীদের প্রণম্য, রাজমতা সত্যবতী কুশলী – তাঁর সংকট বংশরক্ষা। কিন্তু, অম্বিকা, যিনি রাজবধূ, তিনিও বিদগ্ধা, আধুনিক। ফলে, অম্বিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নারীবাদী আধুনিক চেতনাকে অনুপ্রবিষ্ট করেন। ঋষিদের মহত্ত্বের পেছনে তাঁদের স্বেচ্ছাচারী কামোন্মত্ততাকে ব্যঙ্গ করেন অম্বিকার সংলাপের মধ্য দিয়ে –

অম্বিকা

আশ্চর্য!
তাঁরাই পূজ্য হন জগতে
যাঁরা দায়িত্বহীন, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর।
যাঁদের পক্ষে নারী
শুধু এক রন্ধ্রপথ, যার মধ্য দিয়ে
ধমনীর আগুন তাঁরা নিবিয়ে দেন- প্রয়োজন মতো,
অথবা নিষ্ক্রান্ত হন ভূপৃষ্ঠে।
কেমন স্বচ্ছন্দে চ'লে যান তাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

আপন মনে, আপন পথে, একবার পিছন ফিরে না – তাকিয়ে,
হোন তিনি কৌমার্য হারক, বা গর্ভজাত সন্তান।

অম্বিকার এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে নির্বিচারী ও নির্বিকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ও তার যৌন-স্বাধীনতাহীন, পরাধীন, অমর্যাদাকর জীবনের স্বরূপ চিহ্নিত হয়; যদিও আত্মরক্ষা'র প্রয়োজনে সেও অংশগ্রহণ করে এই সামাজিক অন্যায়ে – বংশরক্ষার নামে পুরুষের লালসার শিকার হওয়ার জন্য নিজের স্থানে ছুঁড়ে দেয় তার অধীন অঙ্গনাকে। *মহাভারতের* অম্বিকা কৌশলী, কিন্তু, বুদ্ধদেব বসুর অম্বিকা চরিত্র একই সাথে প্রতিবাদী এবং কুশলী। পুরাণে অম্বিকা চরিত্রটির পূর্ণ অবয়ব বা তার মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ লক্ষ করা যায় না, কিন্তু 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় বুদ্ধদেব বসু তাকে সৃষ্টি করেন একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বরূপে – দোষে-গুণে মানবিক একজন নারীরূপে, যে রাণী হয়েও দাসীত্বের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ, মাতা হয়েও অন্ধ সন্তান জন্মদানের জন্য সংকুচিত, আবার আভিজাত্য, বৈদগ্ধ্য রুচি ও কর্তৃত্ব নিয়ে অহঙ্কারী। সর্বোপরি, অম্বিকা নিরুপায়। তাই সত্যবতী–অর্পিত দায়িত্বে থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অঙ্গনাকে সে প্রলুব্ধ করে একরাত্রির জন্য তার স্থলাভিষিক্ত হতে।

অনাম্নী অঙ্গনার পরবর্তী দৃশ্য অম্বিকা ও অঙ্গনার কথোপকথনকে কেন্দ্র করে। এখানে দু'জন নারী – যার একজন দাসী, অপরজন কর্ত্রী, তারা সমভাবে বিপন্ন যেন, তাদের অবস্থান ও পদমর্যাদার পার্থক্য বিলুপ্ত। দু'জন নারী পরস্পরের করুণাপ্রার্থী – অম্বিকা চায় তার উপর অর্পিত দায়িত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, অঙ্গনা চায় তার দাসীত্বের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি। উভয়েই তারা শৃঙ্খলিত। বুদ্ধদেব বসু এখানে চরিত্র দুটিতে মৃদু ও সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত করেন মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন) সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে *অনাম্নী অঙ্গনা* নাটকের সরল অঙ্গনা চরিত্রের উত্তরণের পশ্চাতে কোনো বিবর্তন নেই, চরিত্রটি সরল ধরনের – 'তাকে (অঙ্গনাকে) তরঙ্গিণীর মতো কোনো যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের সোপান পেরিয়ে যেতে হলো না, ... সে সহজে পরিহার করেছে তার অতীত, গ্রহণ করেছে বিনা দ্বন্দ্বে তার ভবিতব্যকে।'[৩২] একটু অভিনিবেশ সহযোগে লক্ষ করলে অঙ্গনা চরিত্রের বিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়, তা তরঙ্গিণীর মতো জটিল ও ব্যাপক না হলেও একেবারে সরলরৈখিক নয়। অম্বিকার সাথে কথোকপকথনের দৃশ্যে রাণীর মুখে অঙ্গনা যখন প্রথম তার করণীয় সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে রীতিমত প্রতিবাদী –

অঙ্গনা

আমি চিরকাল জেনেছি
সেই বিবাহ কলঙ্কিত, বধূ যেখানে পূর্বব্যবহৃতা।
আর আমার কাম্য
দাসীত্ব থেকে মুক্তি, আর মন্ত্রপূত বিবাহের বন্ধন
ভাগ্যে যদি স্বামীলাভ ঘটে কখনো।
ক্ষাত্রধর্ম ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র – এই নিয়মের
বশবর্তী।

অঙ্গনার প্রবল অসম্মত চিত্তকে আগ্রহী করে তুলতে অম্বিকা একটির পর একটি অস্ত্র ব্যবহার করে – বিনা পণে মুক্তি, বিবাহে মূল্যবান যৌতুক, কলঙ্করহিত ঋষিসংসর্গের তথ্য, পুণ্যলোভ, পরজন্মের সুফল, দেবতার দয়া ইত্যাদি লোভনীয় প্রস্তাবে অঙ্গনাকে বিচলিত করতে চায় তার অবস্থান থেকে। কিন্তু, অম্বিকার প্রলুব্ধকর বচনের সাথে একাত্ম না হয়ে অঙ্গনা বারংবার তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে রাণীকে –

অঙ্গনা

দেবী, আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি –
এই কর্মে এতই যদি শ্লাঘণীয়,
আপনি কেন বিমুখ?

Dhaka University Institutional Repository

এরপর অম্বিকা বর্ণনা করে ঋষির বরে শূদ্রাণী সতবতীর রাজমহিষী হবার ইতিহাস। অঙ্গনা বিস্মিত হয়, কিন্তু, লুব্ধ হয় না। এ পর্যন্ত অঙ্গনা এক দাসীমাত্র এবং তার স্বপ্ন তখনো সেই তন্তুবায় যুবকেই স্থির। কিন্তু, নাটকের এই অংশ থেকে অঙ্গনার মধ্যে লক্ষ করা যায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন – কোনো প্রলোভনে নয়, অম্বিকার প্রভাবেও নয়, অন্য কোনো অদৃশ্য প্রেরণায় পরিবর্তন ঘটে অঙ্গনার। অম্বিকা সোৎসাহে অঙ্গনার উদ্দেশ্যে প্রলোভন-মন্ত্র আউড়িয়ে যায়, কিন্তু অঙ্গনা যেন উন্মনা, বর্তমান-বিস্মৃত, রাণীর কণ্ঠ তার কর্ণে গোচরীভূত হয় না। যেন কোনো দূরাগত আহ্বান শুনতে পায় সে, কোনো নিশ্চিতির অগ্রদূত এসে তার কানে কানে বলে যায় – একরাত্রি নয়, তার সমস্ত জীবন জড়িত এই ঘটনায়। অঙ্গনার অবচেতনের শব্দভাষ্যে –

অঙ্গনা

আমার জীবন
যা এতদিন আমারই সীমায় বদ্ধ ছিলো
মৃৎপাত্রের মধ্যে যেমন তণ্ডুল,
এখন তা আমাকে অতিক্রম ক'রে যেত চাইছে,
রন্ধনকালীন অন্নকে ছেড়ে বাষ্প যেমন উর্ধ্বে উঠে যায়।

সেই দূরাগত অদৃশ্য সম্মোহনমন্ত্রে আবেশিত অঙ্গনা যেন উপলব্ধি করে, সে দণ্ডায়মান 'এক যবনিকার সামনে – যার অন্য দিকে বিস্তীর্ণ এক নাটক/ রচিত হচ্ছে ধীরে-ধীরে, অগোচরে।' অম্বিকা ভাবে তার প্রলোভনে ধরাশায়ী অঙ্গনা; ভেবে চরিতার্থ হয়। কিন্তু, কোনো প্রলোভনে নয়, এক অলৌকিক আহ্বান যেন অধিকার করে নেয় অঙ্গনাকে – এক অন্ধকার আগন্তুকের পদধ্বনি শুনতে পায় সে – তার গানে সেই উপলব্ধি ইঙ্গিতায়িত –

অঙ্গনা

সে আসে কঠিন, আঁধার আগন্তুক?
এক মুহূর্ত – না কি তা-ই চিরকাল?
নাকি সেই হত জন্তুই নবজন্মে
হবে বিশুদ্ধ নারী?

অঙ্গনা যেন এখান থেকেই তার ভবিতব্যের ইঙ্গিত পায়। পরবর্তী দৃশ্যে ব্যাসদেবের সাথে মিলনের পূর্বেই অঙ্গনার মানস-বিবর্তন সাধিত হতে থাকে, যেন অতি মৃদু লয়ে। তা তরঙ্গিণীর যন্ত্রণাময় উপলব্ধির মতো নয়। কারণ, তরঙ্গিণী কামের মধ্য দিয়ে প্রেমের পথ অতিক্রম করে পুণ্যে উত্তীর্ণ হয়, আর, অঙ্গনাকে উত্তীর্ণ হতে হবে মহত্তর মাতৃত্বের বোধে – পৌঁছতে হবে আত্মত্যাগী, কল্যাণময়ী, বিশুদ্ধ সত্তায়। তরঙ্গিণী সংসারত্যাগী, অঙ্গনা সংসারের কল্যাণে সংকল্পবদ্ধ। এ অংশে বুদ্ধদেব বসু নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন কাবিত্ব দিয়ে। তাই তা অন্তর্গত তাৎপর্যে উপলব্ধিযোগ্য। লক্ষণীয় যে, অঙ্গনার পূর্ব-জীবন ও স্বপ্ন এখান থেকেই লুপ্ত। ব্যাসদেবের সাথে মিলিত হওয়ার ক্লেদ থেকে সে মুক্ত এ সময় থেকেই এবং একারণেই অম্বিকা ও অম্বালিকার মতো ব্যাসদেবসংসর্গ তার কাছে ভীতিকর হবে না। সুতরাং, এ নাটকে অঙ্গনা চরিত্র সম্পূর্ণভাবে বিবর্তনহীন নয়, কিংবা কেবল 'একটি স্বগতোক্তি'র মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।'[৩৩] অম্বিকা ও অঙ্গনা-কেন্দ্রিক এই সম্পূর্ণ দৃশ্যটিই ব্যয়িত হয়েছে অঙ্গনার বিবর্তনের, তার মহৎ চেতনায় উদ্ভাসনের পূর্বক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে।

অনাম্নী অঙ্গনার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। যে ঘটনাটি নাটকের তুঙ্গে অবস্থান করে, যাকে নাটকের শীর্ষসংকট বলা হয়ে থাকে, যা অঙ্গনার উদ্ভাসনের নিয়ামক, ব্যাসদেবের সাথে অঙ্গনার সেই মিলন-মুহূর্ত নাটকে থাকে উহ্য, সংকেতায়িত। এই সময়ে মঞ্চে উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে একটি সিঁড়ি, ধীরে ধীরে সেই সোপান-পঙক্তি বেয়ে অঙ্গনার উর্ধ্বারোহণ ও একই সাথে ক্রমবিলীন সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে মঞ্চে নেমে আসা গাঢ় অন্ধকার সংকেতায়িত

Dhaka University Institutional Repository

করে তাদের মিলনকে। আর অন্ধকার তো কামেরই যথার্থ প্রতিবেশ। আবার অন্ধকারের অবসানে ধীরে ধীরে মঞ্চে বিকশিত হয় আলো এবং অঙ্গনাকে লক্ষ করা যায় সিঁড়ির শেষ ধাপে চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবিষ্ট। আলো-অন্ধকার নিয়ন্ত্রিত এই গূঢ় অংশটিই নাটকের শীর্ষবিন্দু। 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় বুদ্ধদেব বসুর এই সাংকেতিক কৌশলটি সূক্ষ্ম, আধুনিক ও মঞ্চোপযোগী। পরবর্তী দৃশ্যে কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু অম্বিকাকে বিস্মিত করে অঙ্গনা ব্যক্ত করে তার অভাবিত মিলনাভিজ্ঞতার কথা – ঋষির অন্ধকার শিলাখণ্ডের মতো শরীর অঙ্গনার কাছে মনে হয় 'অন্তহীনভাবে নির্ভার' 'অনির্বচনীয়ভাবে কোমল'; তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মনে হয় এক প্রাগাঢ়, নিবিড় সত্তা; অসংযত শশ্রুদামকে মনে হয় তৃণ-দূর্বা-পল্লব আর তার উৎকট গাত্রগন্ধে অঙ্গনা হয় বিহ্বল। রাণীকে ঈর্ষান্বিত করে অঙ্গনার নারীত্বের আস্বাদন-উপলব্ধি–

অঙ্গনা

দেবী, তাঁর গন্ধে আমি বিবশ হয়েছিলাম –
এক মিশ্রিত গন্ধ –
যেন তৃণময় প্রান্তর থেকে উত্থিত,
মুঞ্জা, ইষিকা, বন্য পশুর অরণ্যের,
কোনো দূর সমুদ্রের লবণাক্ত গন্ধ যেন,
সেই মাটির ঘ্রাণ, যা এইমাত্র হলকর্ষণে দীর্ণ হ'লো।
যত ফুল ছিলো আমার মালায়,
যত চন্দন আননে ও বক্ষে
সেই বিশাল গন্ধে ডুবে গেলো সব – নদীর জলে লোষ্ট্রের মতো।
আর সব অলংকার
নিক্কণ ভুলে, আমাকে না-ব'লে আমারই অঙ্গ থেকে স্খলিত হ'লে
গাছের গা থেকে শুকনো ডালপালার মতো – অজান্তে।
আর যেমন তীরে এসে যাত্রী
নৌকা ছেড়ে চ'লে যায় দূরে, তেমনি আমার দেহ
বেশবাস থেকে বিচ্যুত হ'য়ে রইলো প'ড়ে
যেন তারার আলোয় পরিত্যক্ত এক স্রোতস্বিনী,
যার উপর দিয়ে, সেতুর মতোর আনত হলেন সেই তিমিরবর্ণ পুরুষ।

মহাভারতে ব্যাসদেবের সাথে অঙ্গনার মিলন-বর্ণনা নিতান্ত সরল, শুষ্ক ও কবিত্ব-বর্জিত – যেন প্রভু ও সেবিকার সম্পর্কে তারা মিলিত – 'দাসী ঋষির নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তদীয় আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরম প্রীত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক কহিলেন, 'হে শুভে! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরম ধার্মিক হইবে।'[৩৪] বুদ্ধদেব বসু তাঁর অসাধারণ কবিত্ববোধ ও কল্পনায় *মহাভারতের* এই তৃণশূন্য, শ্রীহীন ক্ষেত্রটুকুকে পল্লবিত করে তোলেন– আবেগ-বর্জিত স্থূল ঘটনাটিতে আরোপ করেন রোমান্টিক (প্রেমের) আবহ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন – *অনাম্নী অঙ্গনায়* অঙ্গনার এ উপলব্ধি নাট্যরহিত এবং একই কারণে যথার্থভাবে কাব্যগুণসিদ্ধ নয় – 'অঙ্গনার সমস্ত অভিজ্ঞতাই মন্ময়তাধর্মী। কিন্তু তার সেই জীবনান্তরবোধ আধৃত হতে পারেনি নাটকে। নাট্যবন্ধন শিথিল বলে কাব্য-প্রাণও আলগা-পাঁপড়ি ফুলের গন্ধের মতো স্থায়ী হতে পারেনি।'[৩৫] *অনাম্নী অঙ্গনার* 'নাট্যবন্ধন শিথিল', 'কাব্যপ্রাণ আলগা' – এই মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কাব্যনাটকের ধর্ম অনুযায়ী কবিত্ব ও নাটকীয়তা এই নাটকে নিবিষ্ট সম্পর্কে সহযোগী। এখানে কবিত্ব যেমন অনির্বচনীয়, (আধুনিক নাটকের লক্ষণ অনুযায়ী) নাট্যবন্ধনও তেমিন সূক্ষ্মভাবে সন্নিবিষ্ট। কারণ, 'কবিতা ও কবিতার মতো মিথলজি'ই বুদ্ধদেব বসুর আদর্শ। আর

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত নাটকের প্রকট বা তীব্র নাটকীয়তা বুদ্ধদেব বসু শুধু *অনাম্নী অঙ্গনা*তেই নয়, তাঁর সব কাব্যনাটকেই পরিহার করেন। ভাব অনুযায়ী নাটকের 'মুড' বজায় রাখার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু সর্বদাই সচেতন। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে নাটকের 'মুড' যেন কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ দেন (সারা নাটকাটিতেই কোনো উচ্চহাসির অবকাশ নেই, অন্তত আমার অভিপ্রায়ের তা সম্পূর্ণ বহির্ভূত)। বুদ্ধদেব বসু *অনাম্নী অঙ্গনা*তেও নাটকীয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সিরিয়াসধর্মী। তাছাড়া কাব্যনাটক সবসময় 'ধনুকের ছিলার মতো টান্টান্' থাকতে নাও পারে। কারণ, তাকে নেমে আসতে হয় প্রাত্যহিকের স্থূলতায়, জীবনের সমভূমিতে।'[৩৬] আর *অনাম্নী অঙ্গনায়* যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব, তা মনস্তাত্ত্বিক – সত্যবতীর সাথে অম্বিকার কিংবা আম্বিকার সাথে অঙ্গনার অন্তঃসূক্ষ্ম দ্বন্দ্বে নাটকটি গতিপ্রাপ্ত। মূলত, কাব্যনাটকে কবিত্বের মধ্য দিয়ে একটি মাত্র সংকটকে ঘনীভূত করে কোনো একটি দার্শনিক উদ্বোধন বা নাটকীয় উদ্ভাসন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি থাকে নাট্যকারের। *অনাম্নী অঙ্গনা* নাটকে অঙ্গনার মহৎ উত্তরণ সেই লক্ষ্যেই সাধিত। কামের মধ্য দিয়ে অঙ্গনা উন্নীত হয় এক আদর্শিক সংকল্পে – লুপ্ত হয় তার পূর্ব-স্বপ্ন – সেই অভীষ্ট পুরুষ, শান্তকুটির, তেঁতুল তলার শিউরে ওঠা ছায়া। বরং দাসীত্ব বন্দ্যনীয় হয়ে ওঠে তার কাছে। কারণ, নিজের মধ্যেই আপন মুক্তি রচনা করে নেয় সে। তার গর্ভে সে লালন করতে চায় সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবনের ভ্রূণ, যিনি একদিন যুদ্ধমত্ত পৃথিবীতে শান্তির দূত বলে প্রণম্য হবেন। অঙ্গনা চরিত্রটি তখন আর সাধারণ দাসীরূপে গণ্য হয় না, রাজপুরীতে থেকেও চেতনায় মহৎ উপলব্ধি নিয়ে তার অবস্থান হয় সংসার সীমার বাইরে কোনো উর্ধ্বলোকে, অসীমে। কামের মধ্য দিয়ে অঙ্গনার রূপান্তরটি প্রতীকান্বিত হয় তার গানে। এক মহাবিহঙ্গের কঠিন, তীক্ষ্ণ আঘাতে তার চেতনা হয় ছোট নতুন পাখির মতো উর্ধ্বগামী –

> **অঙ্গনা**
> কোন দূরে উড়ে অদৃশ্য হ'লে তুমি
> মহাবিহঙ্গ, সুন্দর!
> উন্মূল তরু মূর্ছায় অবসন্ন।
> কিন্তু তোমারই চলার বাতাসে
> ক্ষুদ্র নতুন পাখি
> মৃত্তিকা ছেড়ে ধীরে উঠে গেলো উর্ধ্বে,
> উষার আলোয় – নীলিমায় – নিঃশব্দে।

কাম-সম্পর্কিত দর্শনকে রূপান্বিত করতে বুদ্ধদেব বসু *মহাভারত* থেকে খুঁজে নিয়েছিলেন ক্ষুদ্র একটি ঘটনার বীজ। তাকে অসাধারণ কল্পনায় সৃষ্টিশীল করে তিনি নির্মাণ করেন *অনাম্নী অঙ্গনা*। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য যে কোনো কাব্যনাটক অপেক্ষা *অনাম্নী অঙ্গনা* অনেক বেশি কল্পনাত্মক। ফলে, মৌলিকতার মাত্রা অধিক। অঙ্গনা চরিত্রটিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে, কাল্পনিক অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে নির্মাণ করেন এবং তার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি নতুন বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত করেন। দার্শনিক প্রত্যয়ে, কবিত্বের ব্যঞ্জনায়, নাটকীয় সূক্ষ্মতায়, সাংকেতিক কৌশলে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় *অনাম্নী অঙ্গনা* বুদ্ধদেব বসুর ক্ষুদ্র অথচ দ্যুতিময়, অনবদ্য একটি সৃষ্টি।

প্রথম পার্থ

সংকটময় আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তি-চৈতন্যের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা ও আত্মসংকল্পের মিথিক রূপায়ণ বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থ*। *প্রথম পার্থ* নাটকের আখ্যান-উৎস *মহাভারতের* 'উদ্‌যোগপর্ব', সময় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বদিন, স্থান গঙ্গাতীরের এক বনভূমি। *মহাভারতে*র ঘটনাপ্রধান এই আখ্যানকে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-মানসতার সঞ্চারে একটি চরিত্র প্রধান সংলাপধর্মী কাব্যনাটকরূপে পুনর্নির্মাণ করেন। অনাম্নী অঙ্গনায় *মহাভারতের* একটি

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত ঘটনাংশকে রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু যেখানে কল্পনাশ্রয়ী, সেখানে *প্রথম পার্থে মহাভারতের* একটি বিস্তৃত আখ্যানকে অনুপুঙ্খ রূপ দানে তিনি সংশ্লেষণ-প্রবণ।

*মহাভারতে*র 'উদ্যোগপর্বের' একশত আটত্রিশতম অধ্যায় থেকে একশত চুয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত কাহিনী *প্রথম পার্থ* নাটকের পৌরাণিক উৎস-সীমা। এর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকের প্রয়োজনে সংগ্রহ করেন একশ আটত্রিশ, একশ উনচল্লিশ ও একশ চল্লিশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও কর্ণের কথোপকথন অংশ এবং একশ তেতাল্লিশ ও চুয়াল্লিশ অধ্যায়ে কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথন অংশ। বুদ্ধদেব বসু পরিহার করেছেন এই দুই ঘটনাংশের মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলো এবং একশত চুয়াল্লিশ অধ্যায়ে কর্ণের প্রতি সূর্যের অনুরোধের অংশটি। তৎপরিবর্তে বুদ্ধদেব বসু সংযোজন করেন দ্রৌপদীর সাথে কর্ণের কথোপকথনের একটি দৃশ্য, *মহাভারতে* যার অস্তিত্ব নেই এবং এ নাটকে দুই বৃদ্ধের সংলাপ ও উপস্থিতিও বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক নতুনভাবে সংযোজিত। লক্ষণীয় যে, বুদ্ধদেব বসু *মহাভারতের* এই অংশের ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতাকেও নাটকের প্রয়োজনে লঙ্ঘন করেন - *মহাভারতে* কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর পূর্বেই কৃষ্ণের কথোপকথন ঘটে এবং কৃষ্ণ কর্তৃকই কর্ণ প্রথম অবহিত হয় তার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত। সর্বোপরি *মহাভারতে*র আখ্যানের উদ্দেশ্য যেখানে যুদ্ধ নিবারণ, সেখানে *প্রথম পার্থে* বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশ্য কর্ণের আমিত্ববোধ, আত্মোপলব্ধি এবং তার স্ববশ সংকল্প-চালিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে তার চরিত্রের দৃঢ়তা প্রমাণ। *মহাভারতে* যা কর্ণের আত্মশ্লাঘা ও অধিকার ত্যাগের মহত্ত্বরূপে বিবেচিত, এ নাটকে তা আধুনিক মানুষের সংকট ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামরূপে চিহ্নিত।

প্রথম পার্থ নাটকে দৃশ্য সংখ্যা তিনটি, যদিও নাট্যকার দৃশ্য বিভাজন করেননি এবং এই তিনটি দৃশ্যকে সংগ্রথিত করার ক্ষেত্রে নাটকের পূর্বাপর বজায় রাখতে তিনি ব্যবহার করেন হস্তিনাপুরের দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথোপকথন। দ্বিরালাপ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত নাটকটির প্রথম দৃশ্য কর্ণ ও কুন্তী, দ্বিতীয় দৃশ্য কর্ণ ও দ্রৌপদী এবং তৃতীয় দৃশ্য কৃষ্ণ ও কর্ণের কথোপকথনের সূত্রে পরিকল্পিত। সমস্ত নাটকে সূত্রধারের ভূমিকা পালন করে ঐ বৃদ্ধ চরিত্রদ্বয়।

কালসন্ধ্যা নাটকের দৃশ্যপট যেমন উন্মোচিত হয় 'পূর্বকথনে'র দুই যাদব বৃদ্ধের কথোপকথনসূত্রে, তেমনি *প্রথম পার্থ* নাটকও আরম্ভ হয় হস্তিনাপুরের দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সংলাপের মাধ্যমে। *কালসন্ধ্যা* দ্বারকাপুরী ধ্বংসের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় দুই বৃদ্ধের সংলাপ ছিল যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি *প্রথমপার্থ* নাটকের শুরুতে আসন্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ, তা নিয়ে জনগণের মনস্তাত্ত্বিক উদ্বেগ, পূর্ব ইতিহাসের স্মৃতিচারণ, কর্ণ-প্রসঙ্গ উল্লেখে, নাটকীয় পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে এবং নাটকের আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বয়ের প্রয়োজনে এই বৃদ্ধের সংলাপ অত্যন্ত জরুরি। *কালসন্ধ্যায়* যাদব বৃদ্ধদ্বয় ঘটনার ভিত্তি তৈরি করে দিয়ে মঞ্চ থেকে তিরোহিত হয়, পুনর্বার নাটকে তাদের দেখা যায় না। তাদের সংলাপ শেষ হলে ঘটনায় সূত্রধারের ভূমিকা পালন করে সত্যভামা ও সুভদ্রা। কিন্তু, *প্রথম পার্থ* নাটকের ব্রাহ্মণ বৃদ্ধদ্বয় নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে অবস্থান করেন, কখনো আলোকিত অংশে, অধিকাংশ সময় অনালোকিত অংশে। নাটকের কোনো কোনো চরিত্রের সঙ্গে তাদের সংলাপ বিনিময় হয়, কখনো কখনো চরিত্রগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাও করে তারা এবং প্রতি দৃশ্যান্তে তারা পরস্পর মন্তব্যে রত থাকে। ফলে, নাটকে দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজন হয় না, দৃশ্যান্তর অনুভূত হয়। তবে, তারা দূর থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ অথবা শ্রবণ করে, মন্তব্য করে, কিন্তু নাটকীয় সংঘটনে অংশগ্রহণ করে না। সাধারণ দর্শকের মতো কর্ণের জীবনের নাটকীয় ঘটনার তারা সাক্ষী,তারা জনগণেরও প্রতিনিধি। *প্রথম পার্থ* নাটকে বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপের এই বৈশিষ্ট্যটিতে গ্রিক নাটকের 'কোরাসের' প্রচ্ছায়া লক্ষ করেন সমালোচকদের কেউ কেউ – *কালসন্ধ্যার* মতো *প্রথম পার্থ* ও শুরু করেছেন দুই বৃদ্ধ, তবে তাঁদের বাচন ইষৎ ভিন্ন তালের। তাঁরা চলে যাবেন না, থাকবেন শেষ পর্যন্ত, কেবল অন্যদের কথার সময় প্রচ্ছন্ন হবেন। যেমন নাটক শুরু করেছেন, তেমনি শেষও করবেন তাঁরা। আদলটা অনেকটা গ্রিক ট্রাজেডির।'[৩৭] তবে, এ ক্ষেত্রে কমলেশ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখিত কৌশলটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য – 'মহাভারত-কাহিনী অবলম্বিত বুদ্ধদেবের কাব্যনাটকের

Dhaka University Institutional Repository

একটি পরম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে গ্রিক ট্র্যাজেডির মহান নাট্যকারদের মতো ঘটনাগুলি যে আগেই ঘটে গেছে–তিনি পাঠকদের কাছে তা গোপন করার চেষ্টা করেন না – অথচ নাট্যদর্শকদের মনে তিনি এই সম্মোহনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন যে ঘটনাগুলি পুরাকালের পরিবর্তে যেন এইমাত্র দর্শকদের চোখের সামনেই ঘটছে। ঘটনাকে প্রত্যক্ষতা দেবার এই কৌশল *প্রথম পার্থ* নাটকে লক্ষ করা যায় প্রথম বৃদ্ধের মুখে কর্ণের জন্ম সম্পর্কে জনশ্রুতির উল্লেখে ও সে সম্পর্কে মন্তব্যে:

প্রথমবৃদ্ধ

... পাণ্ডব নন, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ।
সারথি অধিরথের পুত্র। আশ্চর্য, ঐ বিরাট পুরুষ, দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু,
রূপে গুণে, আচরণে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ: তিনি সূতপুত্র?
তাঁর জন্ম নিয়ে নানা লোকে নানা কথা বলে,
তিনি নাকি পালিত পুত্র অধিরথের, তাঁর প্রকৃত পিতা এক
রাজরাজেশ্বর।
আমি কর্ণপাত করিনা ও-সবে। দেবতার দয়া হ'লে
কেন জন্ম নেবে না দীনের কুটিরে বীরত্ব,
যশস্বীর উৎস হবে না অখ্যাত বীজ?
যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত। আমি এই বুঝি।

লক্ষনীয়, উপর্যুক্ত সংলাপে কর্ণ চরিত্রের সাধারণ পরিচয় উল্লেখিত, যা নাটকের ভিত্তি নির্মাণে প্রয়োজন, অনতিকাল পরে ঘটিতব্য বাস্তবতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়, আবার কী ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কেও অনিশ্চয়তায় এক ধরনের নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টি হয়, একই সাথে জনশ্রুতির উল্লেখ ও তাতে বৃদ্ধের অনাস্থার মধ্য দিয়ে সাধারণ জনতার দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই নাটকে কর্ণের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে কুন্তীর উৎকণ্ঠা, ব্রাহ্মণদের প্রতি গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ এবং মাতৃ-পরিচয় জেনে কর্ণের সংবেদনা এতো বেশি নাটকীয় ও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। ফলে বুদ্ধদেব বসুর আধুনিক নাটকে নাটকীয়তা রক্ষায় গ্রিক নাটকের এই বৈশিষ্ট্যের যথার্থ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

প্রথম পার্থ নাটকের প্রথম দৃশ্যটি কর্ণের সাথে কুন্তীর দ্বিরালাপে নির্মিত। *মহাভারতে* কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত পূর্বেই প্রকাশিত হওয়ায় কুন্তীর মুখে কর্ণের প্রকৃত জন্ম-ইতিহাসের বর্ণনায় তেমন নাটকীয়তার আস্বাদ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সেখানে কুন্তীর মুখে তার কানীন পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত নিতান্ত যান্ত্রিক, উদ্দেশ্যচালিত – 'কুন্তী কহিলেন, বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন, রাধাগর্ভ-সম্ভূত নও; অধিরথও তোমার পিতা নন, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার কানীন পুত্র; আমি কন্যাবস্থায় সব্ধার্গে কুন্তি-রাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি; ভুবন প্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি সহজাত কবচকুণ্ডলধারী দেবপুত্রসদৃশ ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বৎস! তুমি আমার পিতার গৃহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ-পূর্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্দ না করিয়া এক্ষনে যে দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য।'[৩৮] *প্রথম পার্থ* নাটকে কর্ণ ও কুন্তী দু'জনেই আধুনিক জগতের বাসিন্দা। এখানে কুন্তী সরলভাবে তার লুক্কায়িত সত্যকে প্রকাশ করে না; আটঘাট বেঁধে, কর্ণের মানসিকতাকে প্রস্তুত করে নিয়ে তবেই তার গুপ্ত কথা প্রকাশ করে – কারণ, কর্ণের ছায়ার নিচেই তাকে খুঁজে নিতে হবে আশ্রয় – কর্ণের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে তার মাতৃ-অস্তিত্বের ভবিতব্য, এবং রাজনৈতিক জয়পরাজয়। তাই, সে সচেতন, সন্তর্পণে জাগিয়ে তুলতে চায় কর্ণের সংবেদনা – কারণ, আধুনিক বিশ্বে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের হৃদয়গত টানাপোড়ন সহজ নয়, জটিল ও দ্বান্দ্বিক – এ কথা জেনেই দুরধিগম্য কর্ণকে জয়ের লক্ষ্যে কুন্তীর সংলাপ হয়ে *ওঠে* কৌশলী –

Dhaka University Institutional Repository

কুন্তী

তোমার সঙ্গে অচিরে তার দেখা হবে, কর্ণ,
দেখবে কেমনে অবিকল সে প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার:
তোমারই মতো দীর্ঘকায়, আয়তাক্ষ,
তোমারই মতো শক্তিমান, হৃদয়বান,
মহত্তম বন্ধু, শত্রুর পক্ষে অসহন –
ভারতবংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম –
(হঠাৎ থেমে, উচ্ছ্বসিত স্বরে)
কর্ণ, পুত্র আমার।

কিন্তু, কর্ণ অনম্য। কুন্তীর মুখে জন্মপরিচয় শুনে শুধু এক মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে কর্ণের বুভুক্ষু হৃদয়ের আবেগ- 'মা! আমার মা!/আমার ঘুমের মধ্যে লুকানো এক স্বপ্ন, আমার স্বপ্নের মধ্যে গোপন এক সঞ্চার–/আজ মূর্ত আমার চোখের সামনে!' কিন্তু, পরক্ষণেই কর্ণ সংবরণ করে তার আবেগ, হয়ে ওঠে তীক্ষ্নভাবে আত্মসচেতন। কুন্তীর আবেগ, প্রলোভন, কৌশল সব যেন কর্ণের ধাতব-কঠিন অহম ও অস্মিতার দেয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একে একে ফিরে যায় ব্যর্থ হয়ে। মন্ত্রণাসভা থেকে উঠে আসা কুন্তীও তার আত্মজকে জয় করতে মরিয়া। কারণ, তার প্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিষ্ঠিত – উভয় মাতৃত্বই আজ সংকটাপন্ন। কুন্তী যখন কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করে কবিত্ব দিয়ে, হৃদয়গ্রাহী করে – 'কর্ণ,/আমি তখন অনূঢ়া, তাই লজ্জায়, কলঙ্কের ভয়ে,/ তোমাকে মূল্যবান বসনে ঢেকে; একটি ভাসমান মঙ্গলপাত্রে/গঙ্গার বুকে অর্পণ করেছিলাম।' তখন কর্ণের মন্তব্যে বাজে তীব্র, উপহাস – 'আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।' কুন্তী আবারো ব্যঞ্জনা দিয়ে তার সংলাপ সাজায় – 'কালস্রোতে, কর্ণ আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়াছিলাম'। কর্ণ তার যথাযথ প্রত্যুত্তর করে – 'বেদনা-মনস্তাপ-প্রায়শ্চিত্তঃ সব অর্থহীন এখন।/ কালস্রোত আমাকে অনেক দূরে টেনে এনেছে।' এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈরথ, সংবেদনার অন্তরালে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র *প্রথমপার্থ* নাটকে সঞ্চার করে তীব্র নাটকীয়তা, একই সাথে আধুনিক জীবনের তীব্র, জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের আস্বাদও অনুভূত হয়। কর্ম ও অর্জনে বিশ্বাসী কর্ণ জন্মসূত্রে প্রাপণীয় সমস্ত উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে যখন নিস্তাপ স্বরে বলে – 'ক্ষমা করবেন।/ আমি কারোরই নই/ কাউকে আমি আমার ব'লে ভাবি না।/ আমি বিশুদ্ধভাবে আমি।/তাছাড়া আর কিছু নয়।', তখন নিঃসন্দেহে জটিল বিচ্ছিন্ন বিশ্বে আধুনিক ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায় কর্ণ। পুরানের বঞ্চিত কর্ণের সঙ্গে তার ব্যবধান দুস্তর হয়ে ওঠে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কর্ণের সঙ্গেও তার পার্থক্য সূচিত হয়। *কর্ণকুন্তী সংবাদে* কর্ণের জন্ম পরিচয় উদ্ঘাটনের মুহূর্তে কর্ণ ও কুন্তী দু'জনেই তাদের সঞ্চিত আবেগের মুক্তিতে প্রগল্‌ভ, দ্রবীভূত, যেন মাতা-পুত্রের এই হৃদয়বেদনা নির্মল – তার সাথে যোগাযোগ নেই কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কিংবা গূঢ় অভিসন্ধির। রোম্যান্টিক আবেগে পরস্পরের নিকট উন্মোচিত হওয়াই সেখানে মুখ্য। কর্ণ ও কুন্তী - উভয়ের সংলাপই সেখানে সমভাবে আবেগপ্রবণ –

'কর্ণ। .. অর্জুন জননী কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর। মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া-চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপান্ডবের পানে 'ভাই' ব'লে ধায়।
কুন্তী। তবে চলে আয়, বৎস, তবে চলে আয়।
কর্ণ। যাব, মাতঃ চলে যাব, কিছু শুধাব না-
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা। তোমার আহবানে

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরাত্মা জাগিয়াছে- নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ-মিথ্যা মনে হয়
রনহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।'[৩৯]

মহাভারতে যা স্বাভাবিক, তাকেই রবীন্দ্রনাথ মানবিক আবেদনে আবেগসঞ্চারী করে রূপদান করেন। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসুর নাটকে তা দ্বান্দ্বিক, ট্রাজিক ও রাজনৈতিক আবহে অন্তর্সংঘাতময়। তাই, *প্রথমপার্থে* কর্ণের সঙ্কল্প ও প্রতিরোধের পথে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয় কুন্তীর সমস্ত কৌশল। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক মনস্তত্ত্বে এখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে সমকাল ও তার স্বভাব। কারণ, এই হার-জিতের যুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক মানুষের অস্তিত্ব; পরাজয়ে লুপ্ত হয় তার অস্তিত্ব। জীবন এখানে ক্ষমাহীনভাবে সংঘাতময়, স্নায়ুবিক টানাপোড়েনে দ্বান্দ্বিক, অভিসন্ধির শীতলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতি মুহূর্ত, সংবেদনা অপেক্ষা জয়পরাজয় এখানে মুখ্য। তাই, কুন্তীর মাতৃস্নেহের মধ্য থেকে উঁকি দেয় স্বার্থান্বেষী ষড়যন্ত্র, কূটকুশলতা - আর সচেতন ও সর্তক কর্ণ তাই প্রতিহত করে তার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ফলে, স্বভাবতই যুগধর্মে রবীন্দ্রনাথের *কর্ণকুন্তীসংবাদের* সঙ্গে *প্রথম পার্থের* দূরত্ব সূচিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হিন্দোল ভট্টাচার্যের ব্যাখাটি প্রশংসনীয় – 'তুলনামুলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *কর্ণকুন্তীসংবাদ* - এ যা পাইনা, তা আমরা পেয়ে যাই এই নাটকে। দ্রৌপদী, কৃষ্ণের ধূর্ত চরিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়, রাজনৈতিক খেলার বেদনাদায়ক হিংস্র মূর্তিটি আমাদের চোখর সামনে ভেসে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু চরিত্রগুলির মনঃসমীক্ষণ করেন প্রায়। ফলে আধুনিক মনোজগতের সাবকনসাসনেসের প্রবল আলোড়ন পাওয়া যায় কর্ণ, কুন্তী, কৃষ্ণ এবং দ্রৌপদী চরিত্রে। এপিকের চরিত্রগুলো নিয়ে কাজ করলেও কোনও চরিত্রই এখানে সম্পূর্ণ সাদা বা সম্পূর্ণ কালো থাকে না, হয়ে থাকে ধূসর, রহস্যময়।[৪০] পৌরাণিক চরিত্রগুলোর মধ্যে আধুনিক মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব মানসতা সঞ্চারের যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাটক রচনা করেন, তার তুঙ্গস্পর্শী রূপটি লক্ষ করা যায় *প্রথম পার্থে* ।

মহাভারতে উল্লেখ না থাকলেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর *প্রথম পার্থ* - নাটকে কর্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর কথোপকথনের দৃশ্যটি সংযুক্ত করেন। কারণ, আধুনিক কর্ণের যৌন-জীবনের অবদমনের বেদনা ও সংকটটিকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চান নাটকে। কর্ণের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীর বন্ধুত্বের প্রস্তাব, তাদের মধ্যকার পরস্পর ক্ষোভ, প্রতিবাদ, কৈফিয়ত, উদ্দেশ্য সমস্ত কিছুই বুদ্ধদেব বসুর কল্পিত। *মহাভারতের* মনস্বিণী দ্রৌপদীর মধ্যে তিনি সঞ্চার করেন প্রখর, শাণিত বাগ্মিতাগুণ। তেজস্বিণী দ্রৌপদীকে তিনি তৈরি করেন রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন কূটনৈতিক এক নারীরূপে, যে রাষ্ট্রের কল্যাণ, দ্বন্দ্বের সমাধান এবং সবকিছুর উর্ধ্বে আত্মস্বার্থসিদ্ধির সমস্ত উপায় সম্পর্কে সচেতন কৌশলী। কর্ণকে নমনীয় করার লক্ষ্যে সে প্রীতিবিনিময়ের আহবান জানায় প্রথমেই –

দ্রৌপদী

এখানে এই আকাশের তলে, নির্জনতায়
মুহূর্তের জন্য,কয়েক মুহূর্তের জন্য
তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বৈরীপত্নী,
আমি ভুলে যাবো তোমার উপর আমার আক্রোশ;
সম্ভব কি নয়, সম্ভব কি নয়,
মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য
তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতিবিনিময়?

কর্ণকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক করে তোলার জন্য দ্রৌপদী ব্যবহার করে চাটুবাক্য – 'কিন্তু হয়তো কিছু আছে, যা বংশ দিয়ে বিচার্য নয়-/ স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক কোনো কৌলিন্য?/ আমি আজ তা-ই দেখছি তোমার মধ্যে।' তাতেও

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হলে কর্ণকে 'দুর্যোধনের যন্ত্র' বলে তার অহমকে উচ্চকিত করতে চায় সে, যুদ্ধে কর্ণের লাভক্ষতি খতিয়ে দেখায় এবং অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে তার উদ্দেশ্যে ছোঁড়ে বন্ধুত্বের প্রস্তাব – যেন কর্ণের অবচেতন মনের কোথাও যদি বিন্দুমাত্র আসক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাকে জাগিয়ে তুলে রণস্পৃহা থেকে কর্ণকে নিবৃত করা যায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এ সবই – অর্থাৎ কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর বন্ধুত্বের আহবান, কুন্তীর স্নেহের আহবান সবকিছুই 'ব্যবহারিক সাফল্যের প্রলোভনের হাতছানি' – 'মার্কিনী প্রাগ্‌মাটিজম'।'[৪১] কিন্তু, বারবার বঞ্চিত কর্ণ ভালোভাবেই চেনে এই ঔপনিবেশিক চরিত্র; তাই ধরা দেয় না তাদের সহজ প্রলোভনের ফাঁদে। ফলে, বাগ্মিতা দিয়ে, করুণা দিয়ে, তিরস্কার করে, বন্ধুত্বের প্রলোভন দেখিয়ে, ভবিতব্যের কথা বলে ভয় দেখিয়ে কোনোভাবেই কর্ণের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না দ্রৌপদী। *প্রথমপার্থে* সবচেয়ে নাটকীয় এবং সংবেদনশীল অংশ দ্রৌপদীর সাথে কর্ণের এই সংলাপ-বিনিময়। কর্ণের যৌবনের প্রথম আকাঙ্ক্ষিত নারী, যাকে সে অর্জন করতে চেয়েছিল একান্তভাবে নিজের জন্য – অথচ, অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হয় তা থেকে, সেই দ্রৌপদী-দর্শনে মুহূর্তকালের জন্য কর্ণের অবদমিত প্রেমিক সত্তার মুক্তি নাটকে সৃষ্টি করে অভূতপূর্ব রোম্যান্টিক আবেদন –

কর্ণ

– যেয়ো না, পাঞ্চালী।
আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো:
আমি দেখি তোমাকে আরো একবার –
ক্ষমতার সংঘর্ষ থেকে দূরে, ছলনার সন্ধান থেকে দূরে –
তোমার চূর্ণালক কাঁপছে যখন বাতাসে,
তোমার বসনে যখন বৃক্ষছায়া চঞ্চল,
তোমার অধর যখন রৌদ্ররেখায় স্পৃষ্ট –
যুদ্ধের আগে, গঙ্গার তীরে, শান্ত, নীল বনভূমির নির্জনতায়

আবেগের ওঠানামায়, কবিত্ব ও নাট্যকীয়তা এখানে একীভূত, অঙ্গাঙ্গী। *প্রথমপার্থ* নাটকে কর্ণের অবরুদ্ধ আত্মরতির এই রূপায়ণ নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিক ও আধুনিক। বুদ্ধদেব বসুর পূর্বে কর্ণের বঞ্চিত হৃদয়ের এই অনালোকিত অংশটি কেউ এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেননি।

প্রথম পার্থ নাটকে কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের দ্বিরালাপটি নির্মিত গঙ্গাতীরের নির্জন বনভূমিতে, যেখানে পূর্বের দৃশ্যগুলিও অনুষ্ঠিত। এখানে, কৃষ্ণ স্বয়ং কর্ণের নিকট আগত। কিন্তু, *মহাভারতে* সঞ্জয়ের মুখে এ অংশ বিবৃত এবং সে বিবরণ অনুযায়ী কৃষ্ণ কর্ণকে তাঁর রথে উঠিয়ে নিয়ে নগর বাইরে গিয়ে তার প্রতি 'মৃদু বা তীক্ষ্ণ সান্ত্বনা বাক্য' উচ্চারণ করেছিলেন।[৪২] বুদ্ধদেব বসুর নাটকীয় সংগঠনও মঞ্চায়নের প্রয়োজনে এই বিষয়টি পরিহার করে কৃষ্ণকে কর্ণের সমীপে আগত করেন এবং এক্ষেত্রে *মহাভারতে*র কালক্ষেপকে বর্জন করে একটি দিনের পটে তার সম্পূর্ণ নাটকের ঘটনাকে বিন্যস্ত করেন। যুদ্ধের পূর্ব দিন কর্ণের জীবনের নাটকীয় গ্রন্থিমোচনকে ঘনীভূত করে তোলার লক্ষ্যেই নাট্যকার সচেতনভাবে পরিহার করেন এই পৌরাণিক কালক্ষেপ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি *মহাভারতে* কর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথন ঘটে কুন্তীর পূর্বে। কিন্তু, এখানে কৃষ্ণ যেহেতু কর্ণের নিকট শেষ অভ্যাগত, ফলে তার পূর্বে কুন্তী ও দ্রৌপদীর আগমন সম্পর্কে তিনি অবহিত হন কর্ণের নিকট থেকে।)কৃষ্ণের নিকটই কর্ণ ব্যক্ত করে তার সংগুপ্ত অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষার কথা, যা সে সচেতনভাবে দমিত করে রাখে নিজের অহম ও সংকল্পের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে –

কর্ণ

মাঝে-মাঝে এক ভ্রান্তি নামে আমার মনে,
এক সুস্বাদু সম্মোহন,
পতঙ্গের গুঞ্জনের সঙ্গে মিশে:

Dhaka University Institutional Repository

তখন মনে হয় আমিও পারতাম –
হয়তো আমিও সুখী হতে পারতাম –
অন্য কোথাও – যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে দূরে।

কর্ণের পর্বত-কঠিন অনমনীয় চেতনার অন্তরালে এই কোমল, কোমলতর আর্তি, তার আত্মক্ষয়ী পণের অন্তরালে এই জীজিবিষা তাকে করে তোলে মানবিক। তার বঞ্চনা ও স্বার্থত্যাগের মধ্যবর্তী এই একান্ত নির্জন মর্মানুভূতি নিয়ে কর্ণ হয়ে ওঠে ট্র্যাজিক নায়ক। তার সংবেদনা নিয়ে *মহাভারতের* প্রান্তদেশ ছেড়ে কর্ণ যেন আমাদের সন্নিকট হয়। কিন্তু, কর্ণের সংবেদনা মৌহূর্তিক। কুন্তীর আবেদন, পাঞ্চালীর প্ররোচনা মুহূর্তের জন্য তার 'গরল পাত্রকে মধুর' করে দিলেও তার সংকল্প থেকে তাকে স্খলিত করতে পারে না। কৃষ্ণের ভাষায় – 'তোমার চরিত্র থেকে স্খলিত হওনি তুমি,/ আছো নিজত্ব নিয়ে অবিকল।' কর্ণের এই চূড়াস্পর্শী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আমিত্বচেতনা তাকে চালিত করে জীবনত্যাগী মৃত্যুস্পর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণে। এমনকি কৃষ্ণের সৌভ্রাত্রের আহ্বান, ভবিতব্য বর্ণনা কিছুই তাকে যুদ্ধ সঙ্কল্পচ্যুত করেনা। কারণ, এ যুদ্ধ তাকে দেবে ব্যক্তিগত তৃপ্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, প্রতিশোধ ও অর্জন – দেবে মৃত্যুর মূল্যে মহত্তর কিংবদন্তী হবার স্বীকৃতি –

কর্ণ

কৃষ্ণঃ আমাকে একটি প্রিয় কথা শোনালে তুমিঃ
সম্ভব নয় অর্জুনের হাতে আমার পরাভব।
আর সেই সঙ্গে
এক আশাতীত সম্মান দিলে আমাকে।
আমার জন্য তুমিও হবে কুচক্রী;
নেপথ্য ছেড়ে নেমে আসবে মঞ্চে,
হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী–তুমি!–অর্জুনের প্রচ্ছদে।
আমার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্ত,
আমার সব বাসনার তৃপ্তি,
আমার সব স্বপ্নের সফলতা –
তা আমাকে উপহার দেবে অর্জুন নয় – তুমি –
তুমি কৃষ্ণ, যাকে কেউ-কেউ বলে নরশ্রেষ্ঠ–বিশ্বম্ভর!
আমি সম্মত, আমি আনন্দিত, আমার পরাজয়ে আমি ধন্য।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর *মহাভারতের কথা-য়* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণকে যেভাবে কুচক্রী, কূটকুশলী, সত্যভঙ্গকারী, বক্রস্বভাবীরূপে চিহ্নিত করেছেন, *প্রথম পার্থ* নাটকে প্রাসঙ্গিকভাবে কৃষ্ণ চরিত্রের সেই রূপই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু, কৃষ্ণের কূটকৌশল ব্যর্থ হয় – কর্ণ অঙ্গীকার করে তার জাগতিক মৃত্যুকে, চিরদিন মানুষের মনে মৃত্যুহীন হয়ে বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষায়।

পৌরাণিক আখ্যানের সংশ্লেষণের অপূর্বতায়, চরিত্রের আধুনিকায়নে, নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও ট্র্যাজিক আস্বাদে, সংলাপের ওজস্বিতা ও অন্তর্ময়তার ভারসাম্যে, মঞ্চকৌশলের অভিনবত্বে *প্রথম পার্থ* নাটকটি বুদ্ধদেব বসুর একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্তি

বুদ্ধদেব বসুর সবগুলি কাব্যনাটক মিথাশ্রয়ী হলেও প্রত্যেকটি নাটকে তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে নিরীক্ষাপ্রবণ। *সংক্রান্তি* সেই শৈলী-সাধনার উৎকর্ষবিন্দুতে অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসকে কেন্দ্র করে বর্ণিত *মহাভারতের* 'শল্যপর্ব' থেকে *সংক্রান্তির* আখ্যান সংগৃহীত। 'শল্যপর্ব' থেকে বুদ্ধদেব বসু গ্রহণ করেন শল্যবধ, দুর্যোধনের দ্বৈপায়ণ হ্রদে প্রবেশ এবং ভীমও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং দুর্যোধনের উরুভঙ্গের কাহিনী; বর্জন করেন বলদেবের তীর্থযাত্রা-বৃত্তান্ত। *মহাভারতের* বিস্তীর্ণ একটি পর্বকে সংহত করে নিয়ে মাত্র তিনটি চরিত্রের সমবায়ে বুদ্ধদেব বসু রচনা করেন একাঙ্ক নাটক *সংক্রান্তি*।

সংক্রান্তির কাঠামো বিন্যাস ও নাটকীয় কৌশল নিরীক্ষাধর্মী। *মহাভারতের* কথা গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু আদি কবির রচনায় এক অসাধারণ নাটকীয় কৌশলের কথা উল্লেখ করেন। *মহাভারতের* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বর্ণনায় বেদব্যাস যে শিল্পকৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা বুদ্ধদেব বসুকে বিস্মিত করে। বেদব্যাসের কাব্যে তিনি লক্ষ করেন – অসংখ্য ঘটনাবর্তের পর সবাই যখন উৎসাহিত রণভূমির মঞ্চ উন্মোচনের অপেক্ষায়, ঠিক তখনই সেই মঞ্চে হাজির হয় মাত্র দুটি চরিত্র – সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র এবং দৃশ্যপট অন্ধকার হয়ে জেগে ওঠে শ্রুতি – যুদ্ধের ঘটনা, পরোক্ষভাবে বিবৃত হতে থাকে সঞ্জয়ের মুখে, শ্রোতা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। 'সরল ও আত্মচেতন' অতিকথনপ্রিয় আদিককবির এই পরোক্ষ নাটকীয়তার রীতি 'শিল্পচেতন চাতুরী', নাট্যকার শোভন কৌশল বুদ্ধদেবকে মুগ্ধ করে – 'আর এমনি ক'রে, সূত সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে ব্যাসদেব রচনা করলেন কুরুক্ষেত্র-কথা – তখনকার মতো ধৃতরাষ্ট্রকে এবং চিরকালের মতো জগৎবাসীকে শোনবার জন্য। অর্থাৎ, যুদ্ধ ও আমাদের মধ্যে একটি ব্যবধান রচিত হ'লো, এমন একটি ভান করা হ'লো যেন যুদ্ধ আমরা দেখছিনা, শুধু শুনছি'; যেন গ্রিক নাটকের ধরনেই ভীষণ ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত হ'লে নেপথ্যে, আমরা দূতের মুখে তার বিবরণ শুনলাম।'[৪৩] *মহাভারতের* এই অন্তরালসৃষ্টিকারী ঘটনাবর্ণন পদ্ধতি বুদ্ধদেব বসুকে প্রাণিত করে *সংক্রান্তি* নাটকের আঙ্গিক নির্মাণে। *শল্যপর্বকে* কেন্দ্র করে রচিত *সংক্রান্তিতে* বুদ্ধদেব বসু সঞ্জয়ের – ধারাবিবরণীর মধ্য দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চলমান নাটকীয়তাকে দৃশ্যমান করে তোলেন এবং আখ্যান শুরু হয় যুদ্ধাবসানের দিন, অর্থাৎ অষ্টাদশ দিবসকে কেন্দ্র করে। মঞ্চোপবিষ্ট সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বর্ণন-শ্রবণ-মন্তব্য-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নেপথ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-ঘটনার সাথে সংযোগ সাধিত হয়। ফলে, নাটকে সর্বদাই দু'টি তল অনুভূত হয় – একটি পরোক্ষ, অদৃশ্য যুদ্ধ-ঘটনাকেন্দ্রিক, আরেকটি দৃশ্যমান – বিবৃতিকার ও শ্রোতাদের সমন্বয়ে।

সংক্রান্তি নাটকটি শুরু হয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ দিয়ে। মূল ঘটনায় প্রবেশ করার পূর্বেই বুদ্ধদেব বসু ধৃতরাষ্ট্রের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে পাঠককে অবগত করেন পূববর্তী যুদ্ধ কাহিনীর চুম্বক – আর, তার স্মৃতিসূত্রে আমরা একে একে অতিক্রম করে যাই 'ভীষ্মপর্ব', 'দ্রোণপর্ব', 'কর্ণপর্ব'। 'শল্যপর্ব' থেকে শুরু হয় *সংক্রান্তির* মূল আখ্যান। বুদ্ধদেব বসু এভাবেই তাঁর নাটকে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের ঘটনার পূর্বাপর সংরক্ষণ করেন – যেন মহাভারতের মূল ঘটনার সাথে আখ্যানের বিশ্লিষ্টতা তৈরি না হয়, একই সাথে নাটকীয় আবহের আনুপূর্বিকতাও বজায় থাকে। *মহাভারতে* শল্য ও দুর্যোধন যুদ্ধে হত হবার পর যখন গান্ধারী ও কুরু-রমণীরা বিলাপ-কাতর, শোক-সমাচ্ছন্ন, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সঞ্জয় ঘটে যাওয়া যুদ্ধের বিবরণ দেয়। কিন্তু *সংক্রান্তিতে* ঘটনাটি পূর্বঘটিত নয়, বরং অনুষ্ঠিতব্য। সঞ্জয় চলমান যুদ্ধের বিবৃতি দান করেন। ধৃতরাষ্ট্র উত্তেজিত হন, ব্যথিত হন; গান্ধারী ক্ষুব্ধ হন, শোকবিহ্বল হন – মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হয় চরিত্রগুলোর মানসপট। যুদ্ধের জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের দ্বন্দ্বমুখর নাটকীয় আততি সঞ্চারিত হয় নাটকে। পাঠক বা দর্শকের নাটকীয় কৌতূহল সক্রিয় রাখার স্বার্থে বুদ্ধদেব বসু আদিকবির এই শৈথিল্যকে পরিহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকে যুদ্ধারম্ভের সংকেত ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে সঞ্জয় তার যুদ্ধ বিবরণ শুরু করে এবং ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্ধত্ব নিয়ে পাঠক উৎকর্ণ হয়ে সেই বিবরণ শোনে তার মুখে। সঞ্জয় তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধকে করে তোলেন দৃশ্যগ্রাহ্য –

সঞ্জয়

ওড়ে ধাতুখণ্ড, ছিন্ন অঙ্গ, প'ড়ে যায়,
জড়িয়ে যায় অশ্বরজ্জু ও অন্ত্রতন্ত্র,
লোষ্ট্র আর নরমুণ্ড যেন নির্ভেদ।
পশু আর মানুষ, উচ্চ আর নীচ বংশ
শত্রু, মিত্র রক্তের স্রোতে নির্ভেদ।
ঘোর যুদ্ধ। তুমুল সংগ্রাম। পঞ্চপাণ্ডব
একসঙ্গে আক্রমণ করলেন শল্যকে।

*মহাভারতে*র 'শল্যপর্ব্বাধ্যায়'কে বুদ্ধদেব বসু সংক্ষিপ্তরূপে চিত্রিত করেন এ নাটকে এবং শল্য প্রাসঙ্গিক বিষয় অপেক্ষা শল্য-যুধিষ্ঠির যুদ্ধের বিষয়টি অধিক ব্যবহৃত। যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্য বধের ঘটনার সূত্রে নাট্যকার মূলত ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুধিষ্ঠির চরিত্রের অন্তর্ময় সত্তার পরিচয় তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে *সংক্রান্তি* নাটকে শল্যবধের বৃত্তান্তটি বুদ্ধদেব বসু চিত্রণ করে যুদ্ধের ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে। দুর্যোধন প্রসঙ্গই এ নাটকে মুখ্য। *মহাভারতে*র একটি অসাধারণ কাব্যিক ও নাটকীয় অংশ 'হ্রদপ্রবেশ', 'পর্ব্বাধ্যায়', ও 'গদাযুদ্ধ', 'পর্ব্বাধ্যায়' এ নাটকের মূল অবলম্বন, যা দুর্যোধন-কেন্দ্রিক। *মহাভারতে* দুর্যোধন মায়াপ্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করে এবং তার সলিলকে স্তম্ভিত করে রাখে। এছাড়া, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে বিলাপরত এই তিন বীরের সঙ্গেও হ্রদস্থিত দুর্যোধনের কথোপকথন চলে।[৪৪] কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু সচেতনভাবে পরিহার করেন মায়াপ্রভাবের অলৌকিক প্রসঙ্গ এবং আনুষাঙ্গিক অতিকথন। *সংক্রান্তি* নাটকে দুর্যোধনের হ্রদাশ্রয়ের চিত্রটি বুদ্ধদেব বসু অঙ্কন করেন অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনা দিয়ে – যেন প্রকৃতি তার সমস্ত মমত্ব দিয়ে যুদ্ধাহত, ক্লান্ত, নির্জীব সন্তানটিকে শুশ্রূষা করে। সঞ্জয়ের বর্ণনায় –

সঞ্জয়

নামলেন তিনি জলে, মন্থর পায়ে
যেন পুষ্করবাসী দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত। তাঁর মাথায় –
ঝ'রে পড়লো তীরবর্তী দেবদারু থেকে পল্লব
দূর্বার মতো, যেন আশীর্বাদে। আর জল
তাঁকে ঘিরে-ঘিরে ক'রে দিলো, সস্নেহে।
আমার মনে হয় জলদেবী আর বনদেবতারা
যুক্ত হয়েছেন শরণার্থীর পরিচর্যায়।
আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি
তাঁদের হাতের স্পর্শ – কল্যাণময়, কোমল,
যা ধুয়ে দেয় গ্লানি, হরণ করে গ্লানিমা;
যেন প্রায় শুনতে পাচ্ছি
তাঁদের তরল অথবা মর্মরস্বরে সান্ত্বনা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনার নাটকীয়তায় প্রবেশ করার পূর্বে এই কবিত্বময় প্রশমন বুদ্ধদেব বসুর একটি নাটকীয় কৌশল, – আমাদের চৈতন্যকে এমনিভাবে শিথিল করে দিয়ে হঠাৎ সচকিত করে তুলেন পাণ্ডব পক্ষের অতর্কিত আক্রমণের প্রতি – দ্বৈপায়ন হ্রদের শান্ত, কোমল নিস্তব্ধতা থেকে যেন দর্শক হতচকিত হয়ে জেগে ওঠে অট্টরোল আর ঢক্কানিনাদ শুনে। নাটকীয় গতিকে তুঙ্গস্পর্শী করে তোলার জন্যই এ পরিকল্পনা –

সঞ্জয়

বনভূমি মর্দন ক'রে
ছুটে এলো একদল সৈন্য, ঘিরে ফেলল দ্বৈপায়ন হ্রদ;
যেমন মৃগয়াচারী পুরুষবৃন্দ
পরিবৃত করে সিংহকে, কোনো শান্ত বনপথে, অকস্মাৎ
তোলে চিৎকার, ঢক্কানাদ, ঘন্টাধ্বনি, যাতে শার্দূলশ্রেষ্ঠ
গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত, উত্তেজিত, ঝাঁপিয়ে পড়ে
উদ্যত অস্ত্রধারীদের মধ্যে – মৃত্যুর মুখে -
তেমনি এরা উৎসাহিত, উন্মুখর, কর্কশ,
তেমনি এদের অট্টরোল প্রতিধ্বনিত -
পেয়েছি! সন্ধান পেয়েছি দুরাত্মার! ঐ লুকিয়ে আছে
জলের মধ্যে!

*সংক্রান্তি*তে এ অংশে নাট্যকার নাটকের উভয়তলকে সমান্তরালভাবে দ্বান্দ্বিক করে তোলেন। কারণ যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা সঞ্চারিত হয় নাটকের প্রত্যক্ষ চরিত্রগুলোর মধ্যে – বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মধ্যে। একদিকে, সঞ্জয়ের বিবরণে এই চলমান যুদ্ধ-ঘটনা ও জয়-পরাজয়ের নাটকীয়তা, অপরদিকে ধৃতরাষ্ট্রের উত্তেজনা, আহত সিংহের ন্যায় ক্রুদ্ধ গর্জন, ব্যর্থ আক্রোশ এবং তার প্রতি গান্ধারীর অভিযোগ ও আদর্শিক দ্বন্দ্বে *সংক্রান্তি*র উভয়তলে সৃষ্টি হয় চূড়ান্ত নাটকীয়তা। যেমন –

সঞ্জয়

ঋজু আঘাত করলেন দুর্যোধন,
ভীমের গদা স্খলিত হ'লো ভূমিতে

ধৃতরাষ্ট্র

পুত্র, এই তোমার সুযোগ!
এইবার পিষ্ট করো পাষণ্ডকে।

গান্ধারী

না, দুর্যোধন!
নিরস্ত্রকে আঘাত কোরো না,
তোমার একটিমাত্র সত্যকে অক্ষত রাখো!

ধৃতরাষ্ট্র

দূর হও উন্মাদিনী পুত্রহন্ত্রী!

এই দৃশ্যমানও অদৃশ্য দুই দ্বন্দ্ব প্রায় সম্পূর্ণ নাটকে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। অন্যায় যুদ্ধে ভীমের গদাঘাতে ভগ্ন-উরু দুর্যোধন যখন 'কোনো উৎপাটিত অশ্বত্থে'র মতো ভূপাতিত হয়, তখনও গান্ধারীর বেদনা ও ধৃতরাষ্ট্রের নিঃসহায়তার কারুণ্যে অনুরূপ ট্র্যাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এইভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘটনার সমান্তরাল প্রবাহে

Dhaka University Institutional Repository

নাটকীয়তা ও কবিত্ব, ওজস্বিতা ও ট্র্যাজিক কারুণ্যের পরম্পরায় নিয়ন্ত্রিত হয় নাটকের গতি ও দ্বন্দ্ব। চরিত্রগুলোর আবেগ ও প্রতিক্রিয়াও নিয়ন্ত্রিত হয় এই সূত্রে।

দুর্যোধন চরিত্রটি পুরাণের বিচারে এক অমঙ্গলমূর্তি দুরাত্মা, 'ক্রোধময় মহাবৃক্ষ' এবং সর্বোপরি এক পাপাত্মা, যার কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভীষণ রক্তপাত। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছুর পরও দুর্যোধন অন্তত কৃষ্ণের মতো বক্রস্বভাবী নন, যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের মতো কোনো বক্র উপায় অবলম্বন করেননি। ভীম ন্যায়যুদ্ধে তাকে পরাজিত করতে পারবেনা বলেই যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে অন্যায়যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও বধ করে পাণ্ডবপক্ষ। বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যে – 'ক্ষাত্রধর্মের আক্ষরিক আদর্শ অনুসারে তাঁকে একজন বীর বলে মানতে আমরা বাধ্য।'[৪৫] পাণ্ডব-পক্ষের ক্রুরতা ও নিয়মলঙ্ঘনের কারণেই এ নাটকে দুর্যোধনের প্রতি আমাদের সহানুভূতি তৈরি হয় – তাকে দুঃশীল বলে মনে হয় না, তার মৃত্যু নাটকে সৃষ্টি করে ট্র্যাজিক আবেদন। সঞ্জয়ের বর্ণনায় –

সঞ্জয়

বিন্দু-বিন্দু সদ্য শিশিরে ধৌত,
সান্ধ্য আলোর চন্দনরাগে লিপ্ত,
আরো একবার অর্ধোত্থিত, চেষ্টাপরায়ণ,
তিনি হানলেন দৃষ্টি থেকে স্ফুলিঙ্গ
বাহু দিলেন বাড়িয়ে, যেন অস্ত্রধারণের জন্য,
আরো একবার গর্জন করে বললেন – কিন্তু কোনো বাক্য
গঠিত হ'লো না,
শুধু আদিম কোনো কণ্ঠনাদ মিলিয়ে গেলো
ক্ষীণতর হ'য়ে শূন্যে।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকে তা হয়ে ওঠে আবেদনবহ। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটিকে নাটকে বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত মানবিক ও বাস্তবসম্মতভাবে রূপায়ণ করেন। নাটকের শুরুতেই সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রণত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তার বেদনা ও অসহায়ত্ব উন্মোচন করেন –

ধৃতরাষ্ট্র

দ্যাখো: আমার শতপুত্র ছিলো অর্ধমাস আগেও,
আজ একজনমাত্র অবশিষ্ট।
ছিলো অগণ্য জ্ঞাতি, বন্ধু, সামন্ত,
অক্ষৌহিণী সেনানী –
আজ সিংহভুক্ত মহিষের মতো কঙ্কালসার।
আমি ছিলাম ভারতবংশীয় রাজা, রাজপিতা,
জঠরাগ্নিতে অন্নের মতো জীর্ণ সেই রাজস্ব আজ,
এমনকি আমার পিতৃত্ব একটিমাত্র ক্ষীণ সূত্রে
একটি মাত্র ক্ষীণ সূত্রে কম্পমান।

পক্ষপাতহীন, নির্দ্বন্দ্ব, আদর্শিক চরিত্ররূপে ধৃতরাষ্ট্রকে সৃষ্টি করা বুদ্ধদেব বসুর উদ্দেশ্য নয়। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেও ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত তার ধমনীতে। তার অসহিষ্ণুতার কারণ, সে মেনে নিতে পারেনা পাণ্ডবদের উপর্যুপরি অন্যায়-যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধের নামে নীতিবোধহীন হিংস্রতাকে –

Dhaka University Institutional Repository

ধৃতরাষ্ট্র

কে না বোঝে সঞ্জয়,
উত্তরকালে কুরুবংশের কাহিনী শুনে
ভূ-মণ্ডলে কে না বলবে –

শৌর্যে নয়, বিক্রমে নয়, পৌরুষে নয়–
পাণ্ডবেরা ছলনায় ছিলো দক্ষতর,
নৃশংসতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।'
ছলনা – প্রবঞ্চনা – মিথ্যাচার –
পদে-পদে বিশ্বাসভঙ্গ,
পদে-পদে নিয়মভঙ্গন,
শরণার্থীকে হত্যা, মৃতকল্পকে হত্যা,
শত্রুর ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে নৃত্য,
মৃতের গাত্রে পদাঘাত, তরক্ষুর মতো রক্তপান –

তাই, ধৃতরাষ্ট্র তার অন্ধত্ব ও অক্ষমতা নিয়েও প্রাণপণে উৎসাহ দিয়ে যায়, কুরুযোদ্ধাদের এবং অবশিষ্ট দুর্যোধনকে। তাদের পরাজয়ে তিনি ব্যথিত হন, ক্রুদ্ধ হন বিপরীত পক্ষের প্রতি, সঞ্জয়কে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করেন পাণ্ডবদের পক্ষপাতী ভেবে। কিন্তু, ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের এই পক্ষপাতও সম্পূর্ণ নির্বিবেকী নয় – সঞ্জয়ের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি, অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা শুনে তার নীরব অশ্রুপাতের কথা, যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাকে আমরা দেখি স্নেহশীল হতে। পৌরাণিক ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রকে বুদ্ধদেব বসু দোষ-গুণসহ একটি মানবিক চরিত্ররূপে উপস্থাপন করেন *সংক্রান্তিতে*। পুত্রস্নেহও তার জন্য অত্যন্ত সহজাত। রবীন্দ্রনাথের *গান্ধারীর আবেদনে* ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহান্ধ হলেও দুর্যোধনের প্রতি সে মুহূর্মুহূ উচ্চারণ করে ধিক্কার বাক্য এবং এরূপ কু-সন্তানের প্রতি তার স্নেহপরায়ণতার জন্য নিজেও অপরাধবোধে পীড়িত হন কখনো কখনো –

অধমে দিয়েছি, যোগ হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কামনল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ– মহারণ্যতলে –
তবু, পুত্র,দোষ দিস। স্নেহ নাই ব'লে,
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি। ...[৪৬]

449602

কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু অঙ্কিত ধৃতরাষ্ট্র একটিবারও তার পুত্রস্নেহের অন্ধত্বকে স্বীকার করে না, দুর্যোধনকে ধিক্কার দেয় না। কারণ, পুত্রস্নেহ তার কাছে কোনো অপরাধ নয়, *আদিপিতার বিধান*। আর যেহেতু যুদ্ধে কেউ অপরাধহীন নয়, এমনকি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও নন, যেহেতু অন্যায় যুদ্ধে সত্য ও ধর্ম আজ ভুলুণ্ঠিত, শাঠ্য ও কুচক্রের জয় চারিদিকে, তাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রস্নেহেও কোনো পাপবোধ নেই –

ধৃতরাষ্ট্র

গান্ধারী, তুমি আমারই মতো অন্ধ ছিলে এতদিন !
একবার দুই চুক্ষ মেলে তাকিয়ে
দ্যাখো

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈপায়নহ্রদের তীরে, দুর্যোধনের সঙ্গে এক শয্যায়
তোমার সত্যের নিপাতন, তোমার ধর্মের অপমৃত্যু!

*সংক্রান্তি*তে ধৃতরাষ্ট্র ধর্মাধর্মের উর্ধ্বে রক্তমাংসের এক স্নেহশীল পিতা – যে জানে তার সন্তানের কেশের স্পর্শ, গাত্র-সৌগন্ধ, পায়ের শব্দ, কণ্ঠস্বর, দিনে দিনে তার বৃদ্ধির ইতিহাস। তাই, গান্ধারীকে হৃদয়হীন, পুত্রহন্ত্রী বলে তিরস্কার করে সে। গান্ধারীর তবু আদর্শ বেঁচে রয়, কিন্তু অন্ধ, অক্ষম ধৃতরাষ্ট্রের উচ্ছিষ্ট জীবনের একমাত্র অবলম্বন দুর্যোধনের মৃত্যুতে অর্থহীন হয়ে যায় তার কাছে বিশ্বচরাচর – ক্ষোভে, দুঃখে তার দৃষ্টির তমিস্রাকে ছড়িয়ে দিতে চায় বিশ্বসংসারে–

ধৃতরাষ্ট্র

রুদ্ধ হোক সূর্যোদয়! নির্বাসিত হোক জ্যোতিষ্কেরা!
বিধ্বস্ত হোক দিন, রাত্রি, বৎসর!
আমারই চক্ষুর মতো চরাচর হোক অন্ধকার,
সব হৃদয় প্রস্তর হ'য়ে যাক,
সব বেদনা লুপ্ত,
লুপ্ত আশা, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন, ক্রন্দন।
হায় পুত্র! হায় সংসার! হায় মরত্ব!

এ নাটকে দুর্যোধন ট্র্যাজিক নায়ক হলেও মূল ট্র্যাজেডি ধৃতরাষ্ট্রের। *মেঘনাদবধকাব্যে* ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের যে ট্র্যাজেডি, তার সাথে তুলনীয় ধৃতরাষ্ট্রের শোক, যদিও নাট্যকার মাইকেলের এ কাব্যকে যথাযথ শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃতি দেননি।

পুরাণের গান্ধারী চরিত্রটিকে তার ক্ষোভ অভিযোগ, আদর্শ নীতিবোধ দিয়ে একজন শক্তিমত্তাসম্পন্ন নারীরূপে রবীন্দ্রনাথই প্রথম নির্মাণ করেন তাঁর *গান্ধারীর আবেদন* কাব্যনাট্যে, যার কাছে পুত্রস্নেহ অপেক্ষা আদর্শ বড়, মাতৃত্ব অপেক্ষা ন্যায়বিচার সত্য – 'প্রভু, দণ্ডিতের সাথে/দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার'।[৪৭] *সংক্রান্তি-তে* বুদ্ধদেব বসুর গান্ধারীও আদর্শবাদী – ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রস্নেহের অন্ধত্বকে সেও ধিক্কার দিয়েছে – 'মহারাজ তোমার চক্ষু দৃষ্টিহীন বলে অন্ধ নও তুমি/তুমি প্রজ্ঞাহীন বলেই দৃষ্টিহীন'। এই দুই গান্ধারীর চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য এখানে যে, রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তার অভিযোগ নিয়ে একমাত্রিক – পুত্রশোকে তাকে কখনো বিহ্বল কিংবা অশ্রুসিক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর গান্ধারী অন্তত পুত্রের মৃত্যু-মুহূর্তে যেন এক চিরপরিচিত করুনার্দ্র মাতা। সঞ্জয়ের মুখে পুত্রের মৃত্যুর বর্ণনা শুনতে শুনতে তার দৃষ্টি হয় বাষ্পাকুল, কণ্ঠ ক্রন্দনজড়িত – সঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে তার অধীর জিজ্ঞাসা – 'কেউ তার কাছে নেই সঞ্জয়?/ কেউ তার মুখে জল দেবেনা?' কিংবা, 'সঞ্জয়, কেউ কি তার ক্ষতস্থানে চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে?'। যে নারী তার শবাচ্ছন্ন শ্মশান-হৃদয়ের কোণে অবশিষ্ট রাখে একটি স্থান তার পুত্রের জন্য, সেই শক্তিময়ী তেজস্বিনী নারীই সন্তানের মৃত্যুতে বেদনাভারাক্রান্ত এক মাতা –

গান্ধারী

(রুদ্ধ স্বরে)

এখন আর বলিষ্ঠ নয়। মা-কে তার প্রয়োজন।
সঞ্জয়, আমাকে নিয়ে চলো। আমি তাকে নিয়ে থাকতে চাই
একান্তে –
এই রাত্রির অন্ধকারে গুণ্ঠিত –
যতক্ষণ না সূর্যের আলোয় আবার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ঘাটিত হয় জীবন – মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর।

গান্ধারী চরিত্রের দার্ঢ্যের অন্তরালে এই অকৃত্রিম মাতৃহৃদয়ের আর্তি তাকে মানবিক করে তোলে, যদিও গান্ধারী শেষ পর্যন্ত দার্শনিক আত্মসান্ত্বনায় স্থিরতা অর্জন করতে সক্ষম হয় –

গান্ধারী

পুত্র, তুমি অনেক যুদ্ধ করেছো, এখন নিদ্রা যাও,
অনেক অশান্তির পর শান্তি হোক তোমার।
জীবিতেরা সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে অস্থির,
তুমি সেই ভয় থেকে নিষ্ক্রান্ত। বিশ্রাম করো।

সংক্রান্তি নাটকের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে গান্ধারী চরিত্রের এই বাস্তবোচিত বিবর্তনটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যে লক্ষ করা যায় না। সমালোচক উত্তম দাশের মন্তব্যে – 'রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর কোনো বিবর্তন নেই, একমুখী সত্যনিষ্ঠ এক তত্ত্বগ্রাহী চরিত্র তিনি। বুদ্ধদেবই এই চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়ে তাঁর মধ্যে রক্তমাংসের স্পন্দন সৃষ্টি করলেন।'[৪৮] মূলত, রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর সাথে বুদ্ধদেবের গান্ধারীর এই পার্থক্যের একটি কারণ বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের *গান্ধারীর আবেদন* কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে রচিত এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর আবেদন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-নিবৃত্তি ও যুদ্ধে দুর্যোধনকে সমর্থন না করার প্রতি। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু তার গান্ধারীকে প্রতিস্থাপন করেছেন যুদ্ধ সমকালে, যুদ্ধের শেষদিনে – বিশেষত দুর্যোধন-নিধনের কালে। *মহাভারতে* সঞ্জয়ের বিবরণের শ্রোতা একা ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু গান্ধারীকে সচেতনভাবে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করেন। নিজ কর্ণে পুত্রের ঘটমান মৃত্যুর বর্ণনা শ্রবনই গান্ধারী চরিত্রের এই রূপান্তরের মূল কারণ। এই নাটকীয় কৌশলটির কারণেই বুদ্ধদেব বসুর গান্ধারী আদর্শে ও মাতৃত্বে এক মানবিক চরিত্র। বুদ্ধদেব বসুর গান্ধারী বাস্তবসম্মত চরিত্র, তাই অনাবৃতচক্ষু।

সংক্রান্তি নাটকে সঞ্জয় চরিত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জয় ব্যাসদেবের বরে দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত; উপলক্ষ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিবৃতকরন। ফলে, সঞ্জয় নিরাসক্ত কথক, নিরাবেগ বার্তাবহমাত্র। কিন্তু, সঞ্জয়ের এ বিবরণ সাধারণ নয়, যুদ্ধঘটনাকে প্রত্যক্ষ ও প্রায় দৃশ্যমান করে তোলার জন্য কখনো তা ক্ষিপ্র, নাটকীয়; কখনো মন্থর, কবিত্বপূর্ণ; কখনো করুণ, নম্র। সে যুদ্ধের ঘটনার সাথে মঞ্চের চরিত্রগুলোর সংযোগ সাধন করে – তার বর্ণনার সাথে সাথে ঘটে চরিত্রগুলোর আবেগের উত্থান-পতন। কখনো কখনো তিনি ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। যেমন, পক্ষপাত-আক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেন কুরুপক্ষের সামরিক অন্যায়ের কথা – '*যজ্ঞাগ্নিও নির্ধূম নয়, প্রভু/* তাতেও আছে অনিবার্য কালিমা'। সঞ্জয় চরিত্রের অতিসূক্ষ্ম বিশেষত্ব হলো, কখনো কখনো তিনিও ক্লান্ত হন যুদ্ধ-ঘটনার বর্ণনায় – যা 'একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি' – 'বৈচিত্র্যহীন'। কখনো কখনো উত্তুঙ্গ যুদ্ধ-মুহূর্তের বর্ণনায় তাকে আমরা দেখি হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠতে-

সঞ্জয়

মৃত্যু, অবশেষে জয়ী শুধু মৃত্যু,
মহাকালের খাদ্য আজ প্রচুর-
এই সুন্দর অগ্রহায়ণে
ক্ষেত্র থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ পরিপক্ব ধান্যের মতো
দেহ থেকে উৎপাটিত জীবাত্মা –
গণনার অতীত, বেদনার অতীত, বিমিশ্র-
তারা কথা বলতো ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায়, এখন একইভাবে স্তব্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

কখনো গান্ধারীকে তার পুত্রের সংবাদ বর্ণনা করতে তিনি ইতস্তত। সর্বোপরি সঞ্জয় নিরাসক্ত বলেই মহাকালের সংহারোদ্দীপক সত্তা ও তার ফলে মহৎ বংশ লুপ্ত হওয়ার সংক্রান্তিকে চিহ্নিত করতে পারেন। বুদ্ধদেব বসু এই সূতপুত্রকে সূত–বংশজাত বলে নয়, বরং 'বাহক' অর্থে পুরাণ-কথকের ভূমিকায় 'একের সঙ্গে অন্য বহুমনের সংযোগ-সাধক রূপে' সৃষ্টি করেন *সংক্রান্তি* নাটকে।[৪৯]

বিস্তারধর্মী পৌরাণিক কাহিনীর যথাযথ সংশ্লেষণে ঘটনা নির্মাণ, পরোক্ষভাবে ঘটনা বর্ণনার শৈল্পিক কৌশল, বাস্তবসম্মত চরিত্র নির্মাণ এবং কবিতা ও নাটকীয়তার কোমল-বন্ধুর ভারসাম্যে *সংক্রান্তি* অভিনব, অনবদ্য।

বুদ্ধদেব বসুর প্রত্যেকটি কাব্যনাটক ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-নিরীক্ষার সাক্ষর। প্রথম নাটক *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* থেকে শুরু করে *সংক্রান্তি* পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসু প্রতিনিয়ত নিরীক্ষা-প্রবণ, পরিশ্রমী নাট্যকার। *মহাভারতের* 'ঋষ্যশৃঙ্গের আখ্যানে'র আশ্রয়ে নির্মিত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও আধুনিক চেতনা রূপায়ণে অনবদ্য, 'মৌষলপর্ব' অবলম্বনে মহাকালের বৈনাশিক সত্তার প্রকাশে *কালসন্ধ্যার* আঙ্গিক অন্তঃশীল নিরাসক্তি ও ছন্দোগতিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, মহাভারতের বিদুর-জননীকে নিয়ে রচিত *অনাম্নী অঙ্গনা* কল্পনাশ্রয়িতা, চরিত্রের আধুনিক রূপান্তর, আলো-অন্ধকারের সাংকেতিক ব্যবহারে সূক্ষ্মতর; *মহাভারতের* কর্ণ চরিত্র অবলম্বনে রচিত- *প্রথম পার্থ* রাজনৈতিক আবহে, চরিত্রের আধুনিকায়নে ও দ্বন্দ্ব জটিল মনস্তত্ত্ব রূপায়ণে অন্তর্সূক্ষ্ম; ঘটনা বর্ণনায় অপ্রত্যক্ষতা ও নাটকীয় কৌশলের অভিনবত্বে *মহাভারতের* 'শল্যপর্বা'শ্রয়ী নাটক *সংক্রান্তি*ও পরিণত শিল্পভাষ্য। পুরাণের পুনর্নির্মাণের পথটি শিল্পীর জন্য কুসুমাস্তীর্ণ নয়; দুস্তর। বুদ্ধদেব বসু সারা জীবন অক্লান্তভাবে পর্যটন করেন *মহাভারতের* অন্তহীন অরণ্যে – সেখান থেকে নাটকের জন্য তিনি নির্বাচন করেন অভীষ্ট আখ্যানটি। তারপর সেই অতিদীর্ঘ, দুস্তরভাবে অসমান অথবা নাতিদীর্ঘ, সরলাতিসরল আখ্যানকে কখনো সংশ্লেষণ করে, কোনো অংশ বর্জন করে, কখনো কল্পনাধর্মিতা দিয়ে সংযোজন ঘটিয়ে বুদ্ধদেব বসু নির্মাণ করেন তাঁর নাটকের আখ্যান – ঠিক যেমন একজন ভাস্কর প্রায় অবয়বহীন একটি পাথর খোদাই করে ক্রমশ একটি বিশেষ কাঠামোকে প্রমূর্ত করে তোলেন। ঔচিত্য বজায় রেখে পৌরাণিক চরিত্রগুলোর মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করে আধুনিক মানস ও তার বিচিত্র দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন। এভাবে, চরিত্রগুলো অর্জন করে নতুন ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধদেব বসু প্রায়শই তাদের রূপান্তরিত করেন নিজস্ব দর্শন দ্বারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার দ্বন্দ্ব অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্সূক্ষ্ম মানস-দ্বন্দ্ব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় নাটক। কবিতা ও নাটকীয়তার সুসংহত ঐক্যে পরিচালিত হয় নাটকের গতি। এভাবে বুদ্ধদেব বসু প্রচলিত নাটকের কাঠামো বিন্যাস বা চরিত্র চিত্রণকে অনুসরণ না করে তাঁর সৃষ্টিশীল চৈতন্য ও পরিশ্রমী শিল্পীসত্তা থেকে নির্মাণ করেন নতুন 'টেকনিক'। কখনো কখনো এলিয়ট-ইয়েটস দ্বারা প্রভাবিত হন, এমনকি গ্রিক নাটক কিংবা আদিকবির শিল্পকৌশলকেও আত্মীকৃত করেন। কিন্তু, সর্বোতভাবে, তাঁর নিজত্ব ও নিষ্ঠা দ্বারা নির্মাণ করেন একেকটি অভিনব কাব্যনাটক। ফলে, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটগুলো তাদের স্বধর্মে হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

১ বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা', '*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*' নবম মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৫

২ বুদ্ধদেব বসু, 'মুখবন্ধ' 'মহাভারতের কথা' এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৮

৩ বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা ও আমার জীবন' 'কবিতার শত্রু ও মিত্র', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৬৭-৬৮

৪ বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা' 'মরচে পড়া পেরেকের গান' 'বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ' নবম খন্ড, ২ রা নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৫০

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পতিতা' 'বিচিত্রা' রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ-পূর্তি সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ৫৩২

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২

৭ ডক্টর কমলেশ চট্টোপাধ্যায়; 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার : বুদ্ধদেব বসুর '*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*'র ভূমিকা' মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০৭৩, আগস্ট, ১৯৮০, পৃ. ১১৩

৮ বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা' 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' আষাঢ় ১৪০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৬

৯ বুদ্ধদেব বসু, 'প্রয়োজনার জন্য পরামর্শ' '*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*', আষাঢ় ১৪০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৮৪

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১২ W.B. Yeats 'Before the world was made' ' A Women Young and Old', 'Selected Poetry of W.B. Yeats', Edited by A. Noman Jeffares, 1996 Radha Pubilicshing Houses 4 Sibu Biswas Lane, Calcutta, 70006, page. 67

১৩ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান', 'বনপর্ব', 'মহাভারত', আশ্বিন ১৪১৩, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ৪৯২-৪৯৩

১৪ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়; 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার : বুদ্ধদেব বসুর '*তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* ভূমিকা', মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০৭৩, আগস্ট, ১৯৮০, পৃ.১৪৩

১৫ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মৌষলপর্ব' 'মহাভারতে'র (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরী, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১৪১০

১৬ বুদ্ধদেব বসু, 'ভূমিকা', 'কালসন্ধ্যা', মাঘ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫

১৭ অমিয় দেব; 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য' উদ্ধৃত, 'পুনর্মুদ্রণ', 'উত্তরাধিকার', বাংলা একাডেমী সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১৮ বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকাণ্ডারী', 'মহাভারতের কথা' এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩,পৃ. ২৩২

১৯ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মৌষলপর্ব' 'মহাভারত (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরি ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১৪১০

২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিশুতীর্থ' 'পুনশ্চ', পৌষ, ১৪০৬, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৬৯

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

২২ তরুণ মুখোপাধ্যায়, ' যে জীবন মৃত্যুর অধিক ঃ কাব্যনাটক', বুদ্ধদেব বসুঃ মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৯৯

২৩ বুদ্ধদেব বসু, 'বৃদ্ধকাণ্ডারী', 'মহাভারতের কথা', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২২৫

২৪ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মৌষলপর্ব' 'মহাভারত' (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১৪১৪

২৫ বুদ্ধদেব বসু, 'নীলচক্ষু নকুল' 'মহাভারতের কথা', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৯৪

২৬ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মৌষলপর্ব' 'মহাভারত (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১৪১৯

২৭ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ ছায়া' উদ্ধৃত, বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১২২

২৮ প্রাগুক্ত, প্র. ১২২

২৯ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'আদিপর্ব' 'মহাভারত' (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১৩২-১৩৩

৩০ উত্তমকুমার চক্রবর্তী, 'মহাভারতে যৌনতা ও নারীর অবস্থান', উদ্ধৃত, 'বোধ' অক্টোবর ২০০১, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাণী আর্ট প্রেস, ৫০ এ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩০৭

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৩২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ-ছায়া' উদ্ধৃত, বুদ্ধদেব বসুঃ বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯,পৃ. ১২৩

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৩৪ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মৌষলপর্ব' 'মহাভারত (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১৩২

৩৫ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ ছায়া' উদ্ধৃত, বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১২৩

৩৬ রামবসু, 'কাব্যনাটক', 'নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা' তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নভেম্বর, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৩১২

Dhaka University Institutional Repository

৩৭ অমিয় দেব, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য, 'পূনর্মুদ্রণ', 'উত্তরাধিকার' বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৩৯৭

৩৮ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'উদ্‌যোগপর্ব' 'মহাভারত (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ৯৫৮

৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কর্ণকুন্তিসংবাদ', 'বিচিত্রা', বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ৬৯৫

৪০ হিন্দোল ভট্টাচার্য, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক ও আমার বর্ণপরিচয়সুলভ কিছু চিন্তা', 'বিপন্ন বিস্ময়', বুদ্ধদেব বসু: শতবর্ষের তর্পণ', শুভাশীষ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), অহর্নিশ প্রকাশনা, অশোকনগর, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৬৫

৪১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ-ছায়া' উদ্ধৃত, বুদ্ধদেব বসু: বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১২২

৪২ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'উদ্‌যোগপর্ব' 'মহাভারত (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ৯৫৩

৪৩ বুদ্ধদেব বসু, 'গীতার পটভূমি', 'মহাভারতের কথা', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১, পৌষ ১৩৯৭, পৃ. ১১০-১১১

৪৪ শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হ্রদপ্রবেশপর্ব্বাধ্যায়' 'মহাভারত (বঙ্গানুবাদ), আশ্বিন ১৪১৩, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরি, ১৬৭ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৃ. ১০১০

৪৫ বুদ্ধদেব বসু, 'কোন বীর কোন দেবতা', 'মহাভারতের কথা', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০০১, পৌষ ১৩৯৭, পৃ. ২০৩

৪৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গান্ধারীর আবেদন', 'রবীন্দ্র-বিচিত্রা', রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, বিশ্বভারতী ১৯৬১, পৃ. ৫৯৫

৪৭ প্রাগুক্ত

৪৮ উত্তম দাশ, 'বুদ্ধদেব বসুর সংক্রান্তি', 'বিপন্ন বিস্ময়', বুদ্ধদেব বসু: শতবর্ষের তর্পণ', শুভাশীষ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), অহর্নিশ প্রকাশনা, অশোকনগর, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৪০

৪৯ বুদ্ধদেব বসু, 'গীতার পটভূমি', 'মহাভারতের কথা', এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, পৌষ ১৩৯৭, পৃ. টীকা. ১১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কাব্যনাটকে সংলাপ ও ভাষাশৈলী

কাব্যনাটক মূলত কাব্যাশ্রয়ী নাটক। *Poetic drama* এবং *Dramatic verse* এর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও মাধ্যম দু'টি স্বতন্ত্র। *Dramatic verse* নাট্যাশ্রয়ী কাব্য বা নাট্যকাব্য এবং *Poetic drama* কাব্যাশ্রয়ী নাটক বা কাব্যনাট্য। ফলে, কাব্যনাটক মূলত নাটক, যার প্রকাশ মাধ্যম কাব্য-ভাষা। তবে, পদ্যবদ্ধ সংলাপে নাটক রচিত হলেই তা কাব্যনাটক নয়। কবিত্ব ও নাটকীয়তার সংহত ঐক্যে, দার্শনিক প্রত্যয়ে একটি 'টোটালিটির সন্ধান'-ই কাব্যনাটক।[১] কাব্যনাটক যেহেতু বিশেষভাবে ভাষাপ্রধান, তাই এর সংলাপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কাব্যনাটকের সংলাপকে একই সঙ্গে হতে হয় নাট্যগুণসম্পন্ন, কবিত্বের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ও অন্তঃরাশ্রয়ী।

বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* সংলাপের বৈচিত্র্যে ও শব্দ-ভাষার সৌকর্যে অনন্য। 'আপাতদৃষ্টিতে এর ভাষা গদ্য – কিন্তু এই গদ্যের মধ্যে কাব্যরস ও কাব্যিক সৌন্দর্য প্রতিমুহূর্তে সৌগন্ধ ছড়ায়'।[২] টি.এস.এলিয়ট *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল* এর 'কোরাস' সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে এটি একটি অগ্রসর পদক্ষেপ। *ক্যান্টারবেরি* গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে এলিয়ট এ 'কোরাস' রচনা করেন।[৩] এই কোরাসের অনুসরণের বুদ্ধদেব বসু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে রচনা করেন গাঁয়ের মেয়েদের বৃষ্টি-প্রার্থনার গান। এ গানের ভাষা ও শব্দ-ব্যবহার নাটকের অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা পৃথক। এখানে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে গাঁয়ের মেয়েদের জীবনানুষঙ্গে তিনি প্রয়োগ করেন লোকজ শব্দ –

গাঁয়ের মেয়েরা

বল তো, বোন কবে আবার মধুমতী গাভীর বাঁট হবে উচ্ছল?
ঢেঁকির গম্ভীর শব্দে দিয়ে তাল জাগবে হাতে-পায়ে ভঙ্গি?
ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে? ডাকবে উল্লাসে দর্দুর?
শিশির বিন্দুর আদরে ভরপুর ঝুলবে আঙিনায় কুমড়ো?

যেমন বেঁচে থাকে কেন্নো, কেঁচো, আর মাটিতে বুক টেনে পন্নগ,
যোজন পার হ'য়ে ক্লান্ত কূর্মেরা আবার ফিরে পায় সিন্ধু,
তেমনি ঋতু আর শ্রমের আশ্রয়ে চিন্তাহীন বাঁচি আমরা –
অথচ বিনা কাজে বিহান কাটে আজ, জানে না সন্ধ্যায় শান্তি।

সংস্কৃত শব্দ 'দর্দুর' এর সাথে লোকজ শব্দ 'কুমড়ো' বা 'ব্যাঙের ছাতা', 'কূর্ম' ও 'পন্নগের' পাশাপাশি 'কেঁচো' ও 'কেন্নো', 'সন্ধ্যার' সাথে 'বিহান' এর অপূর্ব সমন্বয়ে বুদ্ধদেব বসু একদিকে গ্রামীণ জীবন ও প্রতিবেশকে চিত্রিত করেন অপরদিকে পৌরাণিক আবহকেও সংরক্ষণ করেন। একই ধরনের লোকজ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায় *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* তৃতীয় অঙ্কে খরামুক্ত অঙ্গদেশের পরিতৃপ্ত গাঁয়ের মেয়েদের সংলাপে –

১ম মেয়ে । বলবো কী ভাই, আমার এই তিন যুগ বয়স হ'লো – এমন সুবৎসর আর দেখিনি।
২য় মেয়ে । গোলায় ধান ধরে না।
৩য় মেয়ে । পুকুর গুলোতে থৈ-থৈ জল।
১ম মেয়ে । জলে রুই কাৎলা কই।
২য় মেয়ে । পাড়ে-পাড়ে পুঁই পালং হিঞ্চে।
৩য় মেয়ে । আমার বুড়ি গাই সেদিন আবার বিয়োলো।
২য় মেয়ে । আমার নিষ্ফলা জামগাছটায় কী ফলন এবার!

Dhaka University Institutional Repository

১ম মেয়ে । কুমুদিনীর কথা জানিস – কত ওষুধ মন্ত্রতন্ত্র ওঝা বদ্যি – সব ভস্মে ঘি ঢালা। আর সেই মেয়ের কিনা যমজ হ'লো সেদিন।

গ্রামের মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনের অনুষঙ্গে এইসব সংলাপ অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। পুরাণের ঘটনাকে অবলম্বন করেও পরিচিত জীবন ও প্রতিবেশকে প্রত্যক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর এই সংলাপ ও শব্দ-ব্যবহার প্রসংশনীয়। তপস্বী ও তরঙ্গিণীর দুই দূতের সংলাপ অংশটি চরিত্রদ্বয়ের আদর্শগত দ্বন্দ্বে উপভোগ্য –

১ম দূত । তুমি কি তাহলে দৈবজ্ঞের কথায় আস্থাবান?

২য় দূত । দৈবজ্ঞ? (হেসে উঠে) শোনো নি সেই যবন দেশের কাহিনী? রাজা অগ্নিমাণিক্য দৈবজ্ঞের নির্দেশে আপন ঔরসজাত তরুণী কন্যা ফেনভঙ্গিণীকে পশুর মতো বলি দিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে যে মুহূর্তে তিনি স্বরাজ্যে ফিরলেন, সে-মুহূর্তে তাঁর অসতী ভার্যা অক্রুমশ্রী তাঁকে পাশবদ্ধ মহিষের মতো নিধন করলেন। এবং যুবক পুত্র অরিষ্টের হাতে মৃত্যু হলো পাপিষ্ঠা জননীর। কী ভীষণ হত্যা ও প্রতিহত্যা! দৈববাণীর কী বীভৎস ফলাফল!

১ম দূত । শুনেছি যবন দেশে দেবতারাও ধূর্ত ও হিংসাপরায়ণ। কিন্তু আর্যাবর্তে দেবতারা অসুরকেও বরদান করেন। আমি তাই মানতে পারি না যে অঙ্গদেশে সর্বনাশ অনিবার্য।

২য় দূত । কিন্তু এমন যদি হয় যে দেবতারা মানুষেরই কপোল-কল্পনা?

১ম দূত । ধিক্ পাপবাক্য!

২য় দূত । এমন যদি হয় যে ধর্ম নেই, শাস্ত্রসমূহ প্রহেলিকামাত্র, আর অন্ধকারে আমাদের আলো শুধু আলেয়া?

১ম দূত । তবু কর্ম আছে। দেবতা ও বেদ যদি মিথ্যা হয় কর্ম তবু সনাতন। আর কর্মফলেরই নামান্তর হ'লো দৈব। ... শুনেছি আমাদের রাজপুরোহিত অন্য এক দৈববাণী পেয়েছেন।

১ম দূত ও ২য় দূত – সুশ্রুত ও মাধব সেনের বিশ্বাসের বৈপরীত্য থেকে তাদের সংলাপে বাদী-বিবাদী একটি দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি দৈবজ্ঞ – প্রসঙ্গে দ্বিতীয় দূতের সংলাপে গ্রিক মিথের উল্লেখ ও চরিত্রগুলির নতুন নামকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গ্রিক নাটকের অ্যাগামেম্নন 'অগ্নিমাণিক্য' রূপে, ক্লুতেমিনেস্ত্রা 'অক্রুমশ্রী' নামে ইফিগেনিয়া 'ফেনভঙ্গিণী' রূপে এবং ওরেস্তেস 'অরিষ্ট' নামে চিহ্নিত। হয়তো অঙ্গদেশের দুই দূতের মুখে গ্রিক নাটকের চরিত্রের আঁকাড়া উদ্ধরণ অসঙ্গত বা মানানসই হবে না বলেই – বুদ্ধদেব বসু কাহিনীটিকে অক্ষুণ্ন রেখে চরিত্রগুলোর নাম পরিবর্তন করে দেন অথবা, হয়তো যবন দেশের এই কিংবদন্তি স্বাভাবিক নিয়মে ঈষৎ বিকৃতরূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে তাদের মুখে।

কাব্যনাটকে সাধারণত চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ নির্মিত হয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত, মর্যাদা, যোগ্যতা ও মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী সংলাপ রচনা করেন। যেমন *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের রাজপুরোহিতের সংলাপ সৌম্য, মন্ত্রোচিত ও শাস্ত্রবাক্যবহুল, যেন অঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষের আশ্বাস, নির্ভরতা ও প্রত্যয় জন্মে তার ভাষায় –

একদা বৃত্র বন্দী করেছিলো জলরাশিকে
যেমন সার্থবাহকে স্তম্ভিত করে দস্যুরা;
বন্ধ্যার স্তন ও কৃপণের ধন যেমন নিষ্ফল,
তেমনি ছিল জল, নিশ্চল, অন্ধকার কন্দরে

কিন্তু জলকে মুক্তি দিলেন ইন্দ্র, ধ্বংস হ'লো অসুর তাঁর ব্রজে,
দীর্ণ হলো পর্জ্জণ্য, সপ্তসিন্ধু প্রবহমান;
যেমন গোষ্ঠ থেকে গাভীরা, গুহা থেকে নিষ্পাত হ'লো বৃষ্টি,
বর্ধিত হলো স্রোতস্বিনী, যেমন দ্যূতজয়ীর বিত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজপুরোহিতের সংলাপ ঋজু, উদাত্ত, কাব্যবর্জিত এবং সংস্কৃতশব্দবহুল ।

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে রাজমন্ত্রীর সংলাপ রাজপুরুষোচিত। অঙ্গদেশের মঙ্গলের জন্য শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে রাজমন্ত্রীর সংলাপ কুশলী ও কূটনৈতিক অভিসন্ধিযুক্ত। রাজমন্ত্রীর একটি সংলাপ –

রাজমন্ত্রী । ... আমি দেখছি এ-মুহূর্তে সর্বাঙ্গীন সাবধানতার প্রয়োজন ঘটলো। শান্তা ও অংশুমানকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ওদের দৃষ্টি এখন নিতান্ত প্রাকৃত; ব্যক্তিগত তৃপ্তির জন্য শিশুর মতো লালায়িত ওরা; কে জানে আমাদের এই মহৎ ত্রাণকর্মে ওরাই যদি বিঘ্ন হ'য়ে ওঠে? যদি অংশুমান আমাদের সংকল্প বুঝে নিয়ে শান্তাকে হরণ ক'রে দেশান্তরে চ'লে যায়? ... পুরোস্ত্রীরা শান্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন, ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনকালে তাকে থাকতে হবে অনাহত ও প্রস্তুত।

রাজমন্ত্রীর এই স্বগত-সংলাপ যেমন আবেগশূন্য, তীক্ষ্ণ, সর্তকতাময়, তেমনি বারাঙ্গনাদের প্রলুব্ধ করার ক্ষেত্রেও তার সংলাপ, অভিজাত ক্ষিপ্র ও সূক্ষ্ম চাতুর্যপূর্ণ –

রাজমন্ত্রী । পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা

লোলাপাঙ্গী । ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গ। পর্বতের পতন। হিমানীতে – অগ্নিসংযোগ! – তরঙ্গিণী পারবিতো?

রাজমন্ত্রী । দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা – আর যান, শয্যা, আসন, বসন, স্বর্ণালঙ্কার! আর সিংহলের মুক্তা, বিন্ধ্যাচলের মরকতমনি!

লোলাপাঙ্গী । ধন্য আমরা, আপনি আমাদের ভবসাগরে তরণী!

রাজমন্ত্রী । আমি চরের মুখে বার্তা পেয়েছি, কাল প্রভাতে বিভাণ্ডক আশ্রমে থাকবেন না। কাল প্রভাতেই এই কর্ম সম্পন্ন হওয়া চাই।

তবে, কখনো কখনো রাজমন্ত্রীর সংলাপেও লক্ষ করা যায় তার স্বভাবোচিত উপমা ব্যবহার –'আর তরঙ্গিণী স্বভাবে মোহিনী, তার হিল্লোলে গলমান হবে ঋষ্যশৃঙ্গ, যেমন মলয়স্পর্শে দ্রব হয় হিমাদ্রি। মদস্রাবী হস্তীর মতো তার পতন হবে ব্যাধরচিত লুক্কায়িত গহ্বরে; কামনার রজ্জুতে বেঁধে তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবে বারাঙ্গনারা'।

লোলাপাঙ্গীর সংলাপ তার জীবিকার সাথে সংগতিপূর্ণ প্রথম অঙ্কে রাজমন্ত্রীর সাথে কথোপকথনের সময় তার সংলাপ গণিকাসুলভ, কখনো চাতুর্যময় কখনো প্রগলভতাপূর্ণ আবার কখনো চাটুকারী –

লোলাপাঙ্গী । প্রভু, গুণনিধি, দয়াসিন্ধু! আমাদের অবস্থাটা বিবেচনা করুন। উর্বশীকে রক্ষা করেন দেবরাজ, কুলস্ত্রীর আশ্রয় অন্তঃপুর। কিন্তু আমরা তো সর্বজনীন মানবী, তাই আমাদের দেখার কেউ নেই। কত শত্রু আমাদের ভেবে দেখুন। চোর, শঠ, কুচক্রী, দস্যু, দুবৃর্ত্ত; রোগ, জরা, দীর্ঘায়ু, অপমৃত্যু। কোন পুরুষকে যদি ব্যর্থ করি, তার আক্রোশ হয় স্বর্পতুল্য। কোন সখীর সহচরকে সঙ্গ দিলে তার ঈর্ষা দাবানলের মতো জ্ব'লে ওঠে। প্রতি মুহূর্তে বিপদ এড়িয়ে, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থেকে বাঁচতে হয় আমাদের; যেন ক্ষুরের মতো ধারালো একটি পথ বেয়ে চলছি, কখনো কোনো দুর্দৈব ঘটলে কোন পাতালে তলিয়ে যাবো কে জানে!

তপস্বী ও তরঙ্গিণীতে লোলাপাঙ্গীর এই সব সংলাপের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু উপস্থাপন করেন গণিকা জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ – তাদের জীবিকা, অস্তিত্বের সংকট, মনস্তত্ত্বের স্বরূপ – খদ্দেরকে প্রলুব্ধ করে তাদের ধনলাভের কৌশল, মারিগুটিকা আর যৌনব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার কথা, বিগত-যৌবনা গণিকার নিঃসহায় পরিণতির প্রসঙ্গ। লোলাপাঙ্গীর সংলাপের সূত্রে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে মন্ত্র-তন্ত্র, তুকতাক, অন্ধ বিশ্বাস আর ঈর্ষা-প্রতিহিংসায় ভরা তাদের জীবনের চিত্র –

Dhaka University Institutional Repository

লোলাপাঙ্গী । ... কোনো ব্যাধি নয়তো? নাকি ঐ ডাইনি রতিমঞ্জরীর কাণ্ড? তান্ত্রিক দিয়ে যাদু করালে আমার বাছাকে কিংবা,

লোলাপাঙ্গী । আমি বৈদ্য ডাকবো। আমি দৈবজ্ঞ ডাকবো। স্নায়ুরোগে হ্লাদিনী-বটিকা অব্যর্থ শুনেছি। ভূতেশ্বর ব্রতে পিশাচের দৃষ্টি কেটে যায়।

কাব্যনাটক যে কবিত্বপূর্ণ হয়েও বস্তুজগৎস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত লোলাপাঙ্গীর এইসব সংলাপের ব্যবহার। তার সংলাপে লক্ষ করা যায় বারাঙ্গনা-জীবনের নিষ্ঠা ও আদর্শের কথা, যেমন –'বারাঙ্গনারা স্মৃতি নিয়ে বিলাস করে না, তরু/স্বকর্মে যাদের নিষ্ঠা আছে, তারা অন্যসব ভুলে যায়।' কিংবা 'অনুরাগ, অভিমান, মনোবেদনা – এই পদার্থ-গুলো সারবান নয়, কর্পূরের মতো উবে যাওয়া ওদের স্বভাব' প্রভৃতি। 'সতীত্ব' সম্পর্কে লোলাপাঙ্গীর সংলাপটি রীতিমতো দার্শনিক বক্তব্য –

লোলাপাঙ্গী (প্রীত হয়ে)। সেই জন্যেই, তরু, সেই জন্যেই! – তোকে একটা গূঢ় কথা বলি শোন। সব নারী পত্নী হ'তে পারে, সতী হ'তে পারে না। বহুচারিণী হ'তে পারে, বারাঙ্গনা হ'তে পারে না। এক পুরুষে আসক্ত থাকলেই সতী হয় না; বহুচারিণীও সতী হ'তে পারে, কিন্তু বহুচারিণী মাত্রই যথার্থ বারবধূ নয়। সতী, বারাঙ্গনা দু'য়েরই জন্য হ'তে হয় গুণবতী, প্রাণপূর্ণা। দু'য়েরই জন্য অসামান্য প্রতিভা চাই।

এলিয়টের *Third voice* এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কাব্যনাটকে নাট্যকার বা কবি তাঁর বক্তব্য বা দর্শনকে প্রকাশ করেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর সংলাপের ভেতর দিয়ে।'[৪] লোলাপাঙ্গীর সংলাপের এ দর্শনও নিসন্দেহে বুদ্ধদেব বসুরই উপলব্ধি যা বিভিন্ন ফর্মে নানা সময়ে তিনি শিল্পিত করেছেন। তবে এ সংলাপ সঙ্গত কারণেই গণিকা বৃত্তিজীবী, অভিজ্ঞ লোলাপাঙ্গীর মুখে মানানসই। তার জীবনাভিজ্ঞতার উপলব্ধি হিসেবে তা আতিশয্যপূর্ণ নয়। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে বুদ্ধদেব বসু লোলাপাঙ্গী চরিত্রের যে দু'টি মাত্রা উপস্থাপন করতে চান, তা হলো – লোভ ও মাতৃস্নেহ, প্রগলভতা ও বাৎসল্য। তৃতীয় অঙ্কে বিস্রস্ত তরঙ্গিণীর উদ্দেশ্যে লোলাপাঙ্গীর সংলাপে সেই মমত্ব লক্ষ করা যায় –

লোলাপাঙ্গী । আমার কিছু নেই – সবই তোর। ... তরঙ্গিণী, আমি তোর মা, তোরই মুখ চেয়ে বেঁচে আছি আমি, তুই ছাড়া সংসারে আমার কেউ নেই। তুই আমার চোখের মণি, আমার বুকের পাঁজর, আমার সুখ শান্তি সাধ আশা সবই তুই। তুই যদি আমাকে হেলা করিস তবে তো আমার মরণই ভালো। (চোখের আঁচল চেপে ক্রন্দন)।

লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত দৈনন্দিন কথ্যশব্দের ব্যবহারে লোলাপাঙ্গীর সংলাপটি তার চরিত্রের সঙ্গে অনেক বেশি মানানসই। তৃতীয় অঙ্কে ভাবান্তরিত তরঙ্গিণীর প্রতি লোলাপাঙ্গীর সংলাপে রবীন্দ্রনাথের *চণ্ডালিকারর* (১৯৩৩) প্রকৃতি ও তার মায়ের সাথে সংলাপে সাদৃশ্য লক্ষ করেন ডঃ জগন্নাথ ঘোষ।[৫] সমালোচকের এ সাদৃশ্য-কল্পনা যথাযথ। প্রকৃতপক্ষেই, তরঙ্গিণী-লোলাপাঙ্গী এবং চণ্ডালিকা-চণ্ডালিনীর সংলাপের ভাবগত সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে যেমন তরঙ্গিণীর রূপান্তর ঘটে, বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের সাক্ষাতে কেবল – 'একটি গণ্ডুষ জলে'র সূত্রে তেমনি রূপান্তর ঘটে চণ্ডালিকার। তাদের দু'জনেরই এই নতুন চেতনা যন্ত্রণাময় এবং তাদের মায়েদের কাছে সমভাবে দুবোর্ধ্য। ফলে, লোলাপাঙ্গী ও চণ্ডালিনীর সংলাপের অন্তর্গত সাদৃশ্য অমূলক নয়।

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে লোলাপাঙ্গীর সংলাপ সর্বদাই সরল ও উপযোগিতাপূর্ণ নয়, কখনো কখনো তাতে লক্ষ করা যায় চিত্রকল্প ও উপমার অসাধারণ সব প্রয়োগ। যেমন, প্রথম অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গের উদ্দেশ্যে তরঙ্গিণীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য তার সংলাপ হয়ে ওঠে চিত্রকল্পময় –

লোলাপাঙ্গী । ... ভয় কী তোর? কাল প্রভাতে ঋষ্যশৃঙ্গকে মৃগয়া করবি তুই; ব্যাধের মতো চতুর হবে তোর পদাঘাত, অব্যর্থ হবে শরসন্ধান। যার বাণ উদ্যত, সেই ব্যাধের দিকে মৃগ-শিশু যেমন সরল চোখে

Dhaka University Institutional Repository

তাকিয়ে থাকে, তেমনি হবে এই কিশোরের দৃষ্টিপাত – তুই যখন সামনে গিয়ে দাঁড়াবি। অনাবৃষ্টির আকাশে যেমন মেঘ, তেমনি হবে তার হৃদয়ে তোর উদয়। একটি মাত্র আঙুলে যদি স্পর্শ করিস তা হবে তপ্ত পৃথিবীর বুকে প্রথম জলবিন্দুর মতো। ধীরে ধীরে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসবি, তাঁর ধ্যানের পাষাণ গ'লে যাবে, আর তখন – তিনি একদিন তপস্যা করে যা পাননি, তুই তাঁকে দিবি সেই ব্রহ্মানন্দস্বাদ।

রুদ্ধকক্ষ তরঙ্গিণীকে অঙ্গদেশের প্রাচুর্যের খবর জানাতে লোলাপাঙ্গীর সংলাপে ব্যবহৃত হয় উৎপ্রেক্ষা –

লোলাপাঙ্গী । আজ অঙ্গদেশে ধনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে – যেন ভাদ্রের নদী – তাতে কি শুধু তোরই কোন অংশ থাকবে না, যে-তুই এটা ঘটিয়েছিলি?

লোলাপাঙ্গীর সংলাপে এ ধরনের অলঙ্কার ব্যবহার আরো অনেক লক্ষ করা যায়, যেমন *তরঙ্গিণী*র উদ্দেশ্যে – 'তরুণ তোর জীবন, দেহ তোর আগুনের ভাণ্ড' কিংবা 'যেমন শরণাগতকে ত্যাগ করলে ক্ষত্রিয়ের ধর্মনাশ হয়, তেমনি প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিলে আমাদের।' প্রভৃতি। লোলাপাঙ্গীর সংলাপে কখনো সংগতভাবে উচ্চারিত হয় প্রচলিত প্রবাদ যেমন – প্রথম অঙ্কে রাজমন্ত্রীর প্রতি উচ্চারিত সংলাপ –'কোনো সুশ্রী যুবা নিঃস্ব হলে কোন উপায়ে তার সেবা করেও ধনলাভ ঘটতে পারে, তাও আমাদের না-জানলে চলে না। আমরা সময় বুঝে মধুকুণ্ড, সময় বুঝে বিষভাণ্ড।'

কিংবা, তৃতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত একাধিক সংলাপ – যেমন, 'কিন্তু ধন কি কখনো বেশি হয় কারো? আর – যেখানে শুধু ব্যয় আছে, উপার্জন নেই, সেখানে রাজকোষই বা শূন্য হতে ক-দিন।' অথবা, 'তরু সাবধান। দর্পহারী মধুসূদন অনিদ্র'। এই সব সংলাপ লোলাপাঙ্গী চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তোলে। সমালোচক যথার্থই বলেন যে, কাব্যনাটকের চরিত্র 'সঙ্গত ভাষার মধ্য দিয়ে নিজস্ব সত্তা অর্জন করে'।[৬]

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র বিভাণ্ডক যেহেতু কর্কশ- দর্শন, প্রবল প্রতাপ, আচারনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী, ফলে তার সংলাপ ওজস্বী, লালিত্যবর্জিত এবং সংস্কৃতশব্দবহুল। যেমন দ্বিতীয় অঙ্কে আশ্রমে প্রবেশ করেই বিভাণ্ডকের প্রথম সংলাপ –

বিভাণ্ডক । গন্ধ কিসের? এই কটু, তিক্ত, অশুচি গন্ধ? আশ্রম যেন বিস্রস্ত। অপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গন। প'ড়ে আছে, অর্ধভক্ত ফল, দলিত কুসুম, ঘটোৎক্ষিপ্ত সলিল। কে নির্জিত করলে এই ভূমিকে? মনে হয় কোনো কলুষের চিহ্ন, কোনো অনাচারের দুষ্ট লক্ষণ। বৎস! ঋষ্যশৃঙ্গ!

বিভাণ্ডকের এই সংলাপে সংস্কৃত-শব্দের আধিক্য চিহ্নিত করে তার চরিত্রের মেজাজ ও মানস-গঠনকে। তরঙ্গিণীর প্রভাবে বিচলিত ঋষ্যশৃঙ্গকে নারী সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করতে, নারী-পুরুষের মিলন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সংলাপটি উল্লেখযোগ্য – 'যেমন শমী ও অরণির ঘর্ষণ ভিন্ন অগ্নি জ্বলে না, এও তেমনি। যেমন পাত্র ও মন্থনদন্ড সংযোগে উৎপন্ন হয় নবনী, এও তেমনি। মৎস যেমন ধীবরের জালে ধরা পড়ে। পতঙ্গ যেমন দীপশিখায় ভস্মীভূত হয়, তেমনি পরস্পরে আত্মাহুতি দেয় অজ্ঞান নারী ও পুরুষ। এই চক্রান্ত সনাতন আবহমান।' নারী পুরুষের মিলনকে উপমিত করতে বিভাণ্ডকের সংলাপে যৌক্তিকভাবে ব্যবহৃত হয় আশ্রম-অনুষঙ্গসমূহ। এছাড়াও বিভাণ্ডকের সংলাপে প্রায়শই এই ধরনের উপমার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন-

নারী মাতা, তাই প্রয়োজনীয়; কিন্তু প্রাণীর পক্ষে সর্পাঘাত যেমন, তপস্বীর পক্ষে নারী তেমনি মারাত্মক।' কিংবা, 'এও কি সম্ভব যে এই রাজপুরী – নগর – এই যে বিস্তীর্ণ কামরশ্মি – এই উজ্জ্বল কালান্তক উর্ণাজাল – তুমি এরই মধ্যে মক্ষিকার মতো বন্দী হ'য়ে থাকবে – তুমি, ঋষ্যশৃঙ্গ?

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা, 'তারাই ধন্য যাঁদের অবয়ব বটবৃক্ষের মতো – বৃদ্ধ, বঙ্কিম বটবৃক্ষ, অঙ্গে অঙ্গে কুঞ্চিত ও কঠিন, যেন কালোত্তীর্ণ, ঋতুর অতীত নির্বিকার।' তবে প্রথমঅঙ্কে বিভাণ্ডকের সংলাপ যেমন অনমনীয়, চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্যঙ্গের মুখে তা অনেকটা নমনীয় ও আবেগঘন। এ অংশে বিভাণ্ডক চরিত্রের অসহায়ত্ব সঞ্চারিত হয় তার সংলাপে –

বিভাণ্ডক । পুত্র আত্মপীড়ন কোরো না, ফিরে চলো। শোনো, তুমি যেদিন আশ্রম ত্যাগ করলে, আমি সেদিন থেকে অধীর হ'য়ে আছি। হোমানল জ্বেলে মনে পড়ে, যোগাসনে ব'সে তোমাকে মনে পড়ে। আমার সাধনায় আনন্দ নেই, সংকল্পে নেই স্থৈর্য। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমার পতন হচ্ছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করো। তোমার শৈশবে আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়েছিলাম, আজ আমার বার্ধক্যে আমাকে নূতন ক'রে দীক্ষা দাও তুমি। তোমার আদর্শ হোক আমার অনুপ্রেরণা।

এভাবে সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে চরিত্রের বিভাণ্ডক চরিত্রের বিবর্তন।

কাব্যনাটকে কাব্যভাষা ও নাট্যমুহূর্ত মিলে যে একটি অন্তর্লীন সাংগীতিক আবহ এবং আবেগঘন সংবেদনময় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে তা লক্ষ করা যায় বিশেষভাবে দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে – যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী মুখোমুখি। কবিতা ও নাটক যেন এক অন্তরঙ্গ ঐক্যে, নিবিড় সহযোগে নাটকের এ অংশের সংলাপকে করে তোলে অনির্বচনীয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির তার একসঙ্গে রণিত হয় এর শব্দ, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও নাট্যিক আবেদনে।

মঞ্চে তরঙ্গিণীর আর্বিভাব এবং তার অভিসন্ধিকে ইঙ্গিতায়িত করতে এবং একই সাথে দর্শকদের ঔৎসুক্য উৎপাদন করতে মৃদু যন্ত্রসংগীতের আবহে নেপথ্য থেকে উচ্চারিত হয় নারী কণ্ঠের সংগীত, যার ভাষা ও ধ্বনিতে বাজে আদিচেতনার শিহরণ ও বিষ্ণু-ব্রহ্মা-শিবের কাম-চেতনাশ্রয়ী পুরাণের উল্লিখন –

জাগো, সৃষ্টির আদি শিহরন,
জাগো, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম!
করো ব্রহ্মার মতি চঞ্চল,
আনো দুর্বার মায়াদ্বন্দ্ব।
এলো শম্ভুর গিরিশৃঙ্গে
বধূ গৌরীর দেহসৌরভ!
বাজো, শূন্যের বুকে ওঙ্কার,
জাগো বিশ্বের বীজমন্ত্র।

এই নেপথ্য সংগীতটি বুদ্ধদেব বসু, গদ্যছন্দে রচনা করলেও ধ্বনিনির্মাণ মন্ত্র-সদৃশ। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* গদ্যছন্দে রচিত হলেও নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের এই অংশটিতে গদ্যের সঙ্গে কবিত্বের অসাধারণ সমন্বয় পরিলক্ষিত। নারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তরুণ-তাপস ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম নারী-দর্শনের বর্ণনায় বুদ্ধদেব বসুর কবি-সত্তার অপূর্ব প্রকাশ ঘটে –

ঋষ্যশৃঙ্গ । ... আমার মনে হচ্ছে আপনি চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি। যে মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে দেখেছিলেন, আপনি যেন তাঁদেরই একজন। সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ। আপনি মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আসি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষেই, ঋষ্যশৃঙ্গের এ সংলাপে গদ্য ও পদ্য অন্তরঙ্গ সহযোগী। ড. কণিকা সাহা যথার্থ বলেন, ' এখানে গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরনকে বজায় রেখেও বুদ্ধদেব গূঢ় উপলব্ধির জগৎকে কবিতার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর করে তুলেছেন।[৭] দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের নারী-দর্শনে নিষ্পাপ রোম্যান্টিক উপলব্ধির সাথে বুদ্ধদেব বসু তরঙ্গিণীর স্বগতকথনের ভাষা নির্মাণ করেন সাধারণ গদ্যে। তরঙ্গিণীর তীক্ষ্ণ, স্থূল, অভিসন্ধি-পরায়ণ আত্মকথনের ভাষা বরং ক্ষিপ্র, নাটকীয়, বাস্তবসম্মত –

তরঙ্গিণী । ভাবিনি এত সহজ হবে – কিন্তু এখনো নিশ্চয়তা নেই। আমার চাই নিজের উপর আস্থা, আর নিজের উপর শাসন। ... (ব্যঙ্গের সুরে) ' আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার ...' (হাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো)। কিন্তু আমার এই অগ্রিম উচ্ছ্বাস অসংগত আমাকে সতর্ক হ'তে হবে। মনে রাখতে হবে – দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, আর যান, শয্যা, আসন, বসন, অলঙ্কার। আর যদি না পারি – তা'হলে লজ্জা! চম্পানগরে পথে বেরোলে লোকেরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে – ' এই সেই আত্মাভিমানিনী বারাঙ্গনা, ঋষ্যশৃঙ্গ যার দর্প চূর্ণ করেছিলেন!' আমাকে অযোগ্য জেনে যুবকেরা খুঁজবে অন্য সহচরী। মা–কে নিয়ে আমার পতন হবে ঐশ্বর্য থেকে দারিদ্র্যে, যশ থেকে অন্ধকূপ অবজ্ঞায়। ছি! কী লজ্জা, কী কলঙ্ক!

তরঙ্গিণী অস্তিত্বের সংকটময় আত্মকথন যেমন সঙ্গত কারণেই কবিত্ব-বর্জিত ও প্রাঞ্জল গদ্যে উপস্থাপিত, তেমনি পরবর্তী দৃশ্যেই ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর অনঙ্গব্রত পালনের ভাষা কাব্যিক, সাংকেতিক এবং সূক্ষ্মভাবে শৈল্পিক –

তরঙ্গিণী । আমি অনঙ্গব্রতে অঙ্গীকৃত।

ঋষ্যশৃঙ্গ । অনঙ্গব্রত? তা কী-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়? তার পণ কি? পদ্ধতি কী? ক্রিয়াকর্ম কেমন? আমি অজ্ঞ; আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তরঙ্গিণী । আমার পণ আত্মদান।

ঋষ্যশৃঙ্গ । ঋষিরা ত্যাগের মহিমা কীর্তন ক'রে থাকেন।

তরঙ্গিণী । তপোধন আমি তত্ত্বকথা জানি না, আমি প্রেরণার বশবর্তী। ত্যাগই আমার ভোগ – আমার সার্থকতা। পশু, পক্ষী ও পতঙ্গকে বৃক্ষ যেমন ফলদান করে, তেমনি আমি জনে-জনে করি আত্মদান।

ঋষ্যশৃঙ্গ । তত্ত্বজ্ঞান আমারও যৎকিঞ্চিৎ। মাঝে-মাঝে আমার অনুভূতি হয়, যেন পশু, পক্ষী, বৃক্ষের সঙ্গে আমি একাত্ম। নিখিলের সঙ্গে একাত্ম।

তরঙ্গিণী । দেব, আমি দ্বৈতবাদী। কে আমাকে গ্রহণ-করবেন, আমি নিরন্তর তাঁরে খুঁজে বেড়াই। এই আমার পদ্ধতি। লজ্জাত্যাগ ও ঘৃণা বর্জন আমার ক্রিয়াকর্ম।

ঋষ্যশৃঙ্গ । আপনার ব্রতে কোন মন্ত্র আছে কি? কোনো অনুষ্ঠান?

তরঙ্গিণী । আমার মন্ত্রের নাম রতি, আমার যজ্ঞের নাম প্রীতি, আমার ধ্যানের বিষয় আনন্দযোগ। আমার সাধনমার্গে একাকীত্ব নিষিদ্ধ: দুই তপস্বী যৌথভাবে এই ব্রত পালন করে। তাই আমি আজ আপনার শরণাগত।

উদ্ধৃত সংলাপে লক্ষণীয় যে, ঋষ্যশৃঙ্গ জৈব-প্রেমে অভিজ্ঞ নয় বলে এ অংশে তার ভাষা সরল, অথচ তরঙ্গিণীর ভাষা ছদ্মবেশী এবং ব্যজস্তুতির ব্যবহারে তা দ্ব্যর্থক। যেমন তরঙ্গিণীর সংলাপে উচ্চারিত লজ্জা ও ঘৃণা বর্জিত দ্বৈতবাদ, আত্মদানের পণ, কিংবা তার রতিমন্ত্র, প্রীতিযজ্ঞ, যৌথব্রত এ সবই তার বারঙ্গনা-বৃত্তির উদ্দেশ্যকে ইঙ্গিতায়িত করে। তরঙ্গিণীর মুখে তার অনঙ্গব্রতের ভাষা মন্ত্রের মতো উচ্চারিত। নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত সহযোগে ঋষ্যশৃঙ্গকে ললিত ভঙ্গিতে প্রদক্ষিণ করতে করতে মৃদু থেকে ক্রমশ উচ্চস্বরে তরঙ্গিণী তার সংলাপে উচ্চারণ করে –

তরঙ্গিণী । ... জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত। গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ব্যপ্ত হোক গতি। পূর্ণ হোক বৃত্ত। জয়ী হোক প্রাণ, জয়ী হোক মৃত্যু। ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল, গর্ভ বীজ, গর্ভে

Dhaka University Institutional Repository

জল। বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষ। মৃত্যুকে দীর্ণ করে বীজ, প্রাণ তাই জয়ী। ফলকে উৎপাটন করে মৃত্যু, তাই মৃত্যু জয়ী। এসো সুপ্তি এসো জাগরণ, এসো পতন, এসো উদ্ধার।

তরঙ্গিণীর সংলাপে পুনঃ পুনঃ ছেদে এই মন্ত্রোচিত শব্দাবলি গূঢ় অর্থে প্রতীকান্বিত। 'ক্ষেত্র', 'বীজ', 'হল', 'গর্ভ' – এ সমস্ত শব্দ দিয়ে কামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'বীজ', 'বৃক্ষ', 'ফুল', 'ফুল' – এই শব্দগুলি দ্বারা নিখিল বিশ্বের 'বীজমন্ত্র' অর্থাৎ নর-নারী ও প্রকৃতির প্রজনন-রহস্যের ইঙ্গিত ব্যক্ত। আর মৃত্যুকে দীর্ণ করা, প্রাণের জয়ী হওয়া, ফলকে উৎপাটন, মৃত্যুর জয়ী হওয়ার প্রতীকী শব্দবন্ধে বিশ্বসৃষ্টির জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জীবনের চিরন্তন আবর্তনের কথা ইঙ্গিতায়িত। শুধু প্রতীকী ব্যঞ্জনা নয়, কাব্যনাটকে যে *Rythm* এবং অন্তর্নিহিত *Musicla Pattern* এর অঙ্গীকার থাকে, তা বুদ্ধদেব বসু অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুন্যে অন্তঃশীল করেন *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* এ অংশে।[৮]

বুদ্ধদেব বসু *তপস্বীও তরঙ্গিণীতে* কবিত্ব ও নাটকীয়তার এই ভারসাম্য রক্ষা করেন মঞ্চে আলো অথবা অন্ধকারের ইফেক্ট তৈরি করে, নেপথ্য যন্ত্রসংগীতের মূর্ছনায় ও সুরহীনতার পার্থক্যে, শব্দ ও ভাষা-ব্যবহারের বৈপরীত্যে, নাটকীয়তা ও কবিত্বের তীব্রতা ও মন্থরতার সমন্বয়ে, ধ্বনির উচ্চগ্রাম নিম্নগ্রামের নিয়ন্ত্রণে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন- বুদ্ধদেব বসু *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* ভাষায় কবিতার সূক্ষ্ম কারুকাজ বুনে তুলেছেন – একইসঙ্গে তিনি সচেতন- সংযমে কাব্যের রাশ টেনে ধরেছেন। ফলে কাব্যিক ভাষা প্রায় কখনো বিষয়ের নাট্যগুণকে অতিক্রম করেনি। এ কাব্যনাটকের ভাষা আলাদাভাবে দর্শক-শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না – এর নাট্যগুন ও অর্ন্তগত ভাববস্তুই তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।[৯] তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের অনঙ্গব্রত সমাপ্তির সাথে সাথে মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং সাথে সাথেই দুপুরবেলাকে নির্দেশ করার জন্য আলো ক্রমশ উজ্জ্বলিত হতে থাকে। বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গের কথোপকথনে নতুন দৃশ্য শুরু হয়। লক্ষণীয় যে, এতোক্ষন পাঠক বা দর্শক যে কবিত্বের উত্তুঙ্গতায় মগ্ন ছিলেন, তা নতুন দৃশ্যে আবারো ভূমিস্পর্শী হয়ে ওঠে। একটি রোমান্টিক স্বপ্নজগৎ থেকে ধীরে ধীরে অবতরণ করে আমরা বিভাণ্ডকের সংলাপে শুনতে পাই কাম ও প্রেমের উপযোগিতার কথা –

বিভাণ্ডক । রূপ নয়, উপযোগিতা মাত্র। মাতৃত্বের একটি যন্ত্র – সুগঠিত – তারই নামান্তর হ'লো নারীদেহ। প্রজাপতির এমনি বিধান যে সেই যান্ত্রিক সামঞ্জস্য পুরুষের চোখে মনোহর বলে প্রতিভাত হয়। নয়তো কালগ্রাস থেকে মানববংশ রক্ষা পাবে কেমন করে, কার অর্পিত যজ্ঞের ধুমে দেবতারা প্রীত হবেন, তাই বিশ্ববিধাতার এই কৌশল।

বিভাণ্ডক-ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপের পরই নাটক শীর্ষসংকটে উপনীত হয়। তরঙ্গিণী-ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ–পরস্পরায় নাটকীয়তা ও কবিত্ব একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ অংশে নাট্যকারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋষ্যশৃঙ্গ হয় কামস্পৃষ্ট এবং তরঙ্গিণী রোম্যান্টিক আবেগে দ্রবীভূত। ফলে, ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ হয় ক্ষিপ্র, প্রখর, অসহিষ্ণু আর তরঙ্গিণীর সংলাপ নম্র, নিবিড়, আবেগঘন –

ঋষ্যশৃঙ্গ । তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।
তরঙ্গিণী । আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।
ঋষ্যশৃঙ্গ । আমার শোণিতে তুমি অগ্নি।
তরঙ্গিণী । আমার সুন্দর তুমি।
ঋষ্যশৃঙ্গ । আমার লুণ্ঠন তুমি।
তরঙ্গিণী । বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!
ঋষ্যশৃঙ্গ । আমি তোমাকে চাই – তুমি প্রয়োজন!

Dhaka University Institutional Repository

তরঙ্গিণী । তবে চলো - চলো আমার সঙ্গে। চলো সেখানে, যেখানে আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারব।

ঋষ্যশৃঙ্গ । কোথায় যাই কী এসে যায়? কোথায় থামি কী এসে যায়? আমি চাই তোমাকে। আমি চাই তোমাকে (বাহু বিস্তার ক'রে এগিয়ে এলেন)।

তরঙ্গিণী । এসো প্রেমিক, এসো দেবতা – আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ । এসো দেহিনী, এসো মোহিনী আমাকে তৃপ্ত করো।

এ সংলাপ-পরম্পরায় ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর আপাত রূপান্তরটি স্পষ্ট। অন্ধকার মঞ্চে অস্পষ্ট আলোয় আলিঙ্গনাবদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীকে দেখানো হয় এবং মঞ্চকে সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দিয়ে তাদের মিলনকে সংকেতায়িত করা হয়। আবার মঞ্চালোকিত করে মেঘের গর্জন ও বৃষ্টির ধ্বনি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের মিলন সম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়। একই সাথে জনতার উল্লাসে অঙ্গদেশের বন্ধ্যাত্ব মোচনের সংবাদ জানা যায়। বৃষ্টি এখানে 'কাম' ও 'উর্বরতা' উভয় ভাবনাকে প্রতীকায়িত করে। এভাবে বুদ্ধদেব বসু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে কবিত্ব ও নাটকীয়তার ভারসাম্য রক্ষা করেন। তৃতীয় অঙ্কে অপ্রকৃতিস্থ তরঙ্গিণীর সংলাপে সেই দুর্বোধ্য বেদনার অনুরণন – হারানো মুখচ্ছবি সন্ধানের ব্যাকুলতা –

তরঙ্গিণী । ... আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি।

চতুর্থ অঙ্কে নাগরিক প্রতিবেশে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপের ধরণ পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর নির্দেশনায় – 'এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন, শিখেছেন রাজপুরুষোচিত বৈদগ্ধ ও কপটতা, বেঁকিয়ে ও ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন – অথচ তাঁর সহজাত শুদ্ধতা এখানো অস্পৃষ্ট। জ্বালা, বিক্ষোভ, চাতুরী, শ্লেষ এবং অপ্রকাশ্য বিশাল কামনা – এই বিভিন্ন ভাবগুলির সন্নিপাতে দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন।' ফলে দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপের সরলতা চতুর্থ অঙ্কে আর লক্ষ করা যায় না। বরং এখানে ঋষ্যশৃঙ্গের ভাষা কখনো শাণিত, তীব্র, কখনো তিক্ত, কখনো ছদ্মবেশী।

চতুর্থ অঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ আর আগের মতো সরল নয়, বরং তার জটিল সাংসারিক চরিত্রের মতোই বহুমাত্রিক – চতুর্থ অঙ্কে বিভাণ্ডকের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ আর নম্র নয়, বিদ্রূপ-প্রবণ, তীক্ষ্ণ, শাণিত –

বিভাণ্ডক । ... তুমি তপস্যার বলে ব্রহ্মলোকে লীন হতে চাও না?

ঋষ্যশৃঙ্গ । আপনার তপস্যার মূল্য পঞ্চদশ গ্রাম, সে-তুলনায় শ্লাঘনীয় এই রাজত্ব। পিতা, আপনারাই সুযোগ্য পুত্র আমি।

বিভাণ্ডক । (কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে – ভঙ্গুর স্বরে)। না, ঋষ্যশঙ্গ – পঞ্চদশ গ্রামের জন্য নয়, সে-সময়ে অঙ্গদেশের দুর্দশা দেখে আমি দয়াপরবশ হয়েছিলাম। তাই তোমাকে বলপূর্বক প্রত্যাহরণ করিনি।

ঋষ্যশৃঙ্গ । (নির্মমভাবে)। অর্থাৎ আপনি যাকে বলেন পাপ, আপনি তারই সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেছিলেন।

জীবনক্লান্ত ঋষ্যশৃঙ্গ যখন স্বগত-কথনে ব্যাপৃত থাকে, তখন তার সংলাপ তীব্র, খিন্ন, জ্বালাময় – আধুনিক, জটিল ও অন্তর্মুখ। তার সংলাপে ব্যবহৃত শব্দাবলি সংহত, সুচিন্তিত, বৈদগ্ধ্যচিহ্নিত –

ঋষ্যশৃঙ্গ (অলিন্দে)। বিস্বাদ-বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ। বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি। আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী। ওরা জানে না, কেউ জানে না – আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

শান্তার প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপের ভাষা ছদ্মবেশী, অলঙ্কারযুক্ত, মেকিত্বপূর্ণ, কৃত্রিম আবেদনবহ।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তা	।	উৎসব - জনতার। কিন্তু হয়ত বা আপনার পক্ষে ক্লেশকর। ওরা অবোধের মতো বার-বার দর্শন চায় যুবরাজের। ওরা চকোরের মতো যুবরাজের বদন-চন্দ্রমার পিয়াসী।
ঋষ্যশৃঙ্গ	।	(তাঁর অধরে হাসির রেখা ফুটে উঠলো) আমি ওদের নিরাশ করবো না, শান্তা। ওদের নয়নচকোরকে আহ্লাদিত করে হবো আমি চন্দ্রনমা। ওদের শ্রবণচাতক পান করবে আমার কথামৃত। আমি বিনা বক্তব্যে বয়ন ক'রে যাবো বাক্যজাল, বিতরণ করবো মোদকের মতো হাস্য। হবো অঙ্গদেশের যোগ্য যুবরাজ। আমি প্রস্তুত।

... ...

শান্তা	।	কিংবা যদি নিভৃতি আপনার ঈপ্সিত হয় –
ঋষ্যশৃঙ্গ	।	(অধৈর্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না- ক'রে)। যথাসময়ে তা জ্ঞাপন করতে ভুলবো না। (হঠাৎ – শান্তার দিকে তাকিয়ে) রাজপুত্রী, আমি দেখছি তোমার প্রসাধন সম্পূর্ন হয়নি। আজ সান্ধ্যভোজে কোন বেশ ধারণ করবে?
শান্তা	।	(ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে চোখ রেখে)। আপনার কী ইচ্ছা?
ঋষ্যশৃঙ্গ	।	(চোখ সরিয়ে নিয়ে)। তোমার যা ইচ্ছা আমারও তা-ই। (ক্ষণকাল পরে) তুমি রক্তবসনে শোভমানা, নীলাম্বরে দিব্যরূপিণী। হরিৎ বসনে বনদেবীর মতো। হোক চীনাংশুক, হোক কাঞ্চীদেশের ময়ূরকণ্ঠী বস্ত্র, হোক বারাণসীর –
শান্তা	।	(বাঁধা দিয়ে) যুবরাজ আপনার জিহ্বা মসৃণ।

ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার সংলাপ নির্মাণে নাট্যকার অত্যন্ত কুশলী। তিনি তাদের সংলাপের আপাত উচ্ছ্বাসের অন্তরালে দু'জনেরই দাম্পত্য জীবনের বেদনা, ক্লান্তি ও অতৃপ্তিকে প্রচ্ছন্ন করে, তাদের দ্বিধাভক্ত মনের উপরিতল ও অন্তঃর্তলের বহি প্রকাশ ঘটান একসাথে। পাঠক দর্শকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে হয়ে যায় যে, ঋষ্যশৃঙ্গের ভাষার এই ঐন্দ্রজালিকতা কিংবা শান্তার সংলাপের প্রেমময় আনুগত্য কৃত্রিমতাপূর্ণ। দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীকে দেখার পর ঋষ্যশৃঙ্গের ভাষা যেমন অকৃত্রিম আবেগে স্বতোৎসারী ছিল, এখানে ঠিক তার বিপরীত রূপটি লক্ষ করা যায়। কিংবা প্রথম অঙ্কে অংশুমান ও তার প্রেমের কথা ব্যক্ত করতে শান্তার সংলাপে যে রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ছিল, এখানে তা অবদমিত। শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের দাম্পত্যে ভালোবাসা নেই বলেই এখানে তাদের সংলাপ শব্দ-বিলাস মাত্র, কেবল নিভৃত কক্ষে শান্তার গানখানি কৃত্রিম নয় –

শান্তা (কক্ষে গান) । উজ্জ্বল তুমি, চক্ষু,
কেন ভুলে গেলে বার্তা?
রঙ্গিনী আজও কবরী,
অঙ্গুলি শুধু ক্লান্ত ।

নাটকে অংশুমানের সংলাপ ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি বিদ্বেষবশত তির্যক, ক্ষিপ্র, প্রতিবাদী, আক্রমণাত্মক, যেমন-

অংশুমান	।	(তাচ্ছিল্যের স্বরে) ... আমি পরাজিত, কিন্তু আপনার মতো লোলজিহ্ব কামার্ত নই। আপনি নাকি তপস্বী ছিলেন? নিজেকে আপনার ক্লেদাক্ত মনে হয় না?

কখনো শান্তার প্রতি অনুরাগে তার ভাষা গাঢ়, আবেগপ্রবণ, যেমন, 'কতকাল তাকে দেখিনা। চোখে আমার অনাবৃষ্টি।/দুর্ভিক্ষ আমার হৃদয়ে।' কিংবা 'শান্তা আমার রাজত্ব।/ শান্তা আমার সসাগরা পৃথিবী। সুতরাং অংশুমানের সংলাপে স্বভাবতই কখনো ব্যবহৃত হয় 'লম্পট' 'পাপিষ্ঠা' ইত্যাদি প্রচলিত শব্দ এবং প্রাত্যহিক বাক্য যেমন 'যদি ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম কখনো না- হতো! যদি এখনো ঋষ্যশৃঙ্গের অস্তিত্ব মুছে যায়।' আবার কখনো তার সংলাপে শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

সুনির্বাচিত, বাক্য সুগঠিত। যেমন, 'ঈর্ষা-নিশ্চয়ই, কিন্তু মনস্তাপ ততোধিক। ঋষ্যশৃঙ্গ, আমার রাজত্বের অন্য নাম, অন্য রূপ। তা অপহৃত হয়েছে', কিংবা, 'জানুক। আমার বেদনা রাষ্ট্র হোক। তোমার অঙ্গীকার রাষ্ট্র হোক'।

চন্দ্রকেতু যেহেতু এ নাটকে নিষ্ঠাবান, আদর্শ প্রেমিক চরিত্র, ফলে তার সংলাপে অংশুমানের মতো ঔদ্ধত্য নেই – তার সংলাপে প্রকাশ পায় ব্যাকুলতা, যেমন, তৃতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীর উদ্দেশ্যে – 'আমার প্রণয়, আমার শ্রদ্ধা। আমার স্বাস্থ্য, আমার বিত্ত - সব হবে তোমার।' কিংবা,

চন্দ্রকেতু । তবে তুমি তোমার স্বাভাবিকরূপে আবার দেখা দাও। হও বহুবল্লভা, কিন্তু আমাকে তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত কোরো না। যে-কোনভাবে, যে কোন রূপে, তুমি আমার কাঙ্ক্ষণীয়া। তোমার অদর্শনে আমার মৃত্যু, তোমার দৃষ্টিপাতে আমার জীবন।

তবে, কখনো কখনো অংশুমানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ সংলাপের বিপক্ষে, চন্দ্রকেতু পুরুষোচিতভাবে প্রতিবাদী। যেমন তৃতীয় অঙ্কে অংশুমান তরঙ্গিণীকে পাপিষ্ঠা বলে সম্বোধন করলে চন্দ্রকেতুর সংলাপের স্বর দৃঢ় হয় – 'চন্দ্রকেতু। তোমার শ্লথ জিহ্বা সংবরন করো, অংশুমান।' অথবা চতুর্থ অঙ্কে লোলাপাঙ্গীর উদ্দেশ্যে অংশুমান দুর্বাক্য উচ্চারণ করলে চন্দ্রকেতু প্রতিবাদ করে – 'অংশুমান, বিপন্না অবলার সঙ্গে রূঢ় আচরণ – একি পুরুষোচিত'?

তপস্বীও তরঙ্গিণীর চতুর্থ অঙ্কে নাটকের ক্রম-পরিনতির পথে ঘটনা চরিত্রসমূহ, তাদের সংলাপ ও ভাষা সমস্ত কিছু নাটকীয়তায় অনুবর্তী হয়ে উঠে। কাব্যনাটকের উদ্দেশ্যে থাকে এটিই, অর্থাৎ সেখানে শব্দ-ভাষাকে নাটকীয়তার অনুগামী হতে হয়। আর এই নাটকীয়তার অবলম্বন হলো সংলাপ। কাব্যনাটকে ঘটনার ক্রিয়া বা গতির সাথে নাট্য-ভাষার সম্মিলনে নাটককে ক্রমশ পরিণতি-মুখী করে তোলেন নাট্যকার। অশ্রুকুমার সিকদারের ভাষায় – 'একথা ঠিক যে কাব্যময় ভাষা যথেষ্ট নয়, নাটকে থাকতে হবে নাটকীয়তা। কিন্তু, নাটকের নাটকীয়তা বলতে যাই বুঝি না কেন, তারো অবলম্বন ভাষা। তাই কাব্যনাট্যকার যদি ভাষাকেই প্রাথমিক বলে মনে করেন, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ... আসলে নাটকে ঘটনাগতি ও ভাষার মধ্যে প্রথম কে তাই নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। নাটকে তো ভাষা অকারণে জায়গা জোড়ে না, শুণ্যে বিলম্বিতও নয়, ঘটনাগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই তার স্থান; আবার ভাষাই ঘটনার অগ্রগতি ও উন্মোচন ঘটায় – সেখানে ক্রিয়া ব্যতীত ভাষা নেই, ভাষা ব্যতীত ক্রিয়া নেই। এই প্রসঙ্গে *Feeling and Form* গ্রন্থে সুজান্ ল্যাঙ্গার যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাই স্বীকার্য মনে হয় – নাট্যকার ভাষার শব্দ বিন্যাসের দ্বারা নাটকের ঘটনাতরঙ্গে পরিনামী মুহুর্তের দীর্ঘপর্যায়কে বহুদুর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেন।'[১০] *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* চতুর্থ অঙ্কে ভাষা ও ক্রিয়া এই ভাবেই পরস্পর পরিপূরক সূত্রে নাটককে পরিণামসঞ্চারী করে তোলে –যেখানে-ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণী-শান্ত-অংশুমান-লোলাপঙ্গী-চন্দ্রকেতু-রাজমন্ত্রী-রাজপুরোহিত একে একে সমস্ত চরিত্র একত্রিত হয়, যার যার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং নাট্যকার তার দর্শনকে অর্থাৎ কামের মধ্য দিয়ে পুণ্যের পথে উদ্বর্তনের সত্যকে প্রকাশ করেন ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে –

ঋষ্যশৃঙ্গ । জানিনা আমার কোন তপস্যা। তপস্যা কিনা তাও জানিনা। আমার সামনে সব অন্ধকার। অন্ধকারেই নামতে হবে আমাকে। পিতা, আমাকে বিদায় দিন।

... ...

তরঙ্গিণী । (এগিয়ে এসে)। তুমি কি আশ্রমে ফিরে যাচ্ছো না?

ঋষ্যশৃঙ্গ । কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশেই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন ক'রে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানিনা, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার

Dhaka University Institutional Repository

> সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী।

এ পর্যায়ে ঋষ্যশৃঙ্গের জীবন-অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত হয় তার পূর্বের সেই মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতা। ফলে তার সংলাপ হয় ছদ্মবেশ-মুক্ত – অকপট, নিঃসংশয়ী এবং 'স্বপ্রকাশ মহত্ত্ব'মণ্ডিত, যা অন্যদের কাছে হয়ে ওঠে গ্রহণযোগ্য।'[১১]

চরিত্রানুগ সংলাপ নির্মাণে, গদ্যসংলাপের যথাস্থানে কবিত্ব ও নাটকীয়তা আরোপকরণে প্রতিবেশ অনুযায়ী সংস্কৃত, কথ্য ও লোকজ শব্দের ব্যবহারে, কোনো কোনো স্থানে শব্দের দ্বৈত ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে, সার্থক অলঙ্করণে, মঞ্চে আলো অন্ধকারের 'ইফেক্ট' সংযোজনে, সংগীতের ব্যবহারে, এবং প্রতীক-সংকেতের গূঢ়তায় *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র সংলাপ ও শব্দ-ভাষা অসাধারণ শিল্পোৎকর্ষের স্বাক্ষর। এ বিষয়ে ডঃ কণিকা সাহার অনুসন্ধান ও মন্তব্যটি চমৎকার। তিনি বলেন – 'গদ্যভাষায় কবিতার শব্দবন্ধ ও অলঙ্কার সৃজনে, পঙ্ক্তি বিন্যাসের অসমমাত্রিক পদ্ধতিতে, অত্যুক্তি ও বক্রোক্তির অলঙ্করণে তৎসম ও কথ্য শব্দের সচ্ছন্দ মিলন সাধনে শব্দের বিস্ময়কর শৃংখলা ও পারম্পর্য রক্ষায়, নাটকীয় দ্রুততা আনয়নের জন্য প্রয়োজনবোধে কথ্যভাষার ভাণ্ডার থেকে ক্রিয়াপদ ও নানা শব্দ আমদানি করে বুদ্ধদেব বসু এমনই কাব্যবিভা সঞ্চারিত করেছেন- যে তাতে – *reflects the speed of lif, the pressure of life it's very essence* সার্থক কাব্যনাট্যের যা বিশিষ্ট লক্ষণ পূর্বোদ্ধৃত সংলাপগুলিতে এর পরিচয় আমরা পেয়েছি।'[১২]

সর্বোতভাবে বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের সংলাপ আবেগ ও সংহতিতে সুনিয়ন্ত্রিত, শব্দ-ভাষার বৈভব ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ।

কালসন্ধ্যা

সংলাপ, শব্দ-ভাষা এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে *কালসন্ধ্যা* বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যনাটকের তুলনায় স্বতন্ত্র-স্বভাবী। গ্রিক নাটকের *Epilogue* এর অনুসরণে *কালসন্ধ্যার* 'উত্তর-কথনে'র সংলাপ নির্মিত। দুই যাদব বৃদ্ধের মুখে উচ্চারিত সংলাপে ইঙ্গিতায়িত হয় আসন্ন ধ্বংসের সজ্ঞা (*Intuition*) –

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

আমরা জেনেছি বিশ্বে ক্ষয়, বৃদ্ধ পরিবর্তমান,
মৃত্যু আনে নবজন্ম, বার্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব;
কিন্তু আজ মনে হয় কখনো বা ব্যত্যয় সম্ভব,
কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে ওঠে আরেক শ্মশান।

প্রথম বৃদ্ধ

আমরা ভেবেছিলাম কুরুক্ষেত্রে শোণিতক্ষরণ
এঁকে দেবে দুঃখের অক্ষরে এক মহত্তর শান্তির ইঙ্গিত,
উদ্ভাসিত ভবিষ্যতে অর্থ পাবে বীভৎস অতীত।
-কিন্তু আজ কেন শঙ্কা, দ্বারকায় কেন দুর্লক্ষণ।'

বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপের এই অন্তর্জ্ঞান (*intution*) একদিকে যেমন দ্বারকায় প্রলয়কে ইঙ্গিত করে, অপরদিকে তা বুদ্ধদেব বসুর 'সমকালের বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের রূপ এবং সংকট-লগ্নটিকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত করে।'[১৩] দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে ব্যবহৃত – 'চিতার নির্বাণ থেকে জ্ব'লে ওঠে আরেক শ্মশান' চিত্রকল্পটি দ্বারা কুরুক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ থেকে নতুন

মৃত্যু ও ধ্বংসের ধারাবাহিকতা চিত্রিত। বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপ ছন্দোবদ্ধ এবং অন্ত্যমিল যুক্ত। 'উত্তরকথনে'র সংলাপের শব্দ-ভাষা গুরু নয়, লঘু নয় – ভবিতব্যের ইঙ্গিতে ঈষৎ শঙ্কাতুর ও আতর্তি-প্রবণ। এ অংশে বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করার মতো- যেমন, 'সানন্দ নিশ্বাস,' 'সরল আশ্বাস' 'ঋদ্ধিময়ী দ্বারকা', 'মহত্তর শান্তি', 'উদ্ভাসিত ভবিষ্যত', 'বীভৎস অতীত' প্রভৃতি। তবে, প্রথম অঙ্কের শুরুতে দ্বারকাপুরীর প্রাকৃতিক দুর্যোগের শব্দ-ভাষ্য নির্মাণে সত্যভামা-সুভদ্রার সংলাপে বিশেষণ ব্যবহার আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও সাংকেতিক –

সুভদ্রা

অবিশ্বাস্য এই দৃশ্য!
নভোমন্ডলে বিশাল ধূম্রপুচ্ছ,
মধ্যদিনেই নামে সন্ধ্যা। কিংবা

সত্যভামা

গুরুগুরু মন্দ্র, যেন ভূমিকম্পে
বিদীর্ণ মন্দির, নাগরিক হর্ম্য,
দানবের ধর্ষণে বিহ্বল দিঙনাগ,
উন্মূল যেন অশ্বত্থ। অথবা,

সুভদ্রা

আকাশে জ্বলছে এক ধিকিধিকি পিঙ্গল পিণ্ড,
করাল দংষ্ট্রা কোন অসুরের মুণ্ড;
জ্বলে নেভে রক্তিম চক্ষু,
মলময় তির্যক অনলে,
উদ্দাম জটা থেকে ছুটে যায় অস্থির উল্কা
জিহ্বা বিলোল, যেন হিংস্র তরক্ষু।

'জায়মান ঝঞ্ঝা', 'অগ্রিম গর্জন', 'বিশাল ধূমপুচ্ছ', বিদীর্ণ মন্দির', 'বিহ্বল দিঙনাগ' 'পিঙ্গল-পিণ্ড', 'করালদংষ্ট্রা', 'রক্তিমচক্ষু', 'মলময় তির্যক অনল', 'উদ্দাম জটা', 'অস্থির উল্কা', 'বিলোল জিহ্বা', 'হিংস্র তরক্ষু' প্রভৃতি বিশেষণ-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু দ্বারকাপুরীর দুর্যোগের অস্বাভাবিক চিত্র অঙ্কন করেন। 'গুরুগুরু', 'ধিকিধিকি' প্রভৃতি ধনাত্মক শব্দ দ্বারা মেঘের গর্জন, সমুদ্রের তর্জন, ভূমিকম্পের কম্পন ও অগ্নিময় আকাশের ধ্বনি ও চিত্র নির্মাণ করেন – চিত্রকল্প-উৎপেক্ষা-উপমায় প্রকৃতির এই রহস্যময় দানবিক চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন। লক্ষ্যণীয় যে, উপর্যুক্ত তিনটি দৃষ্টান্তের মধ্যে তৃতীয়টি সংস্কৃত শব্দবহুল এবং অন্ত্যমিলযুক্ত। *কালসন্ধ্যার* সংলাপ কখনো অন্ত্যমিলযুক্ত কখনো অন্ত্যমিলহীন। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য কাব্যনাটকগুলো থেকে *কালসন্ধ্যার* একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বা ভিন্নতা হলো এর ছন্দ-ব্যবহার। বুদ্ধদেব বসু এখানে পাশ্চাত্য ছন্দের অনুকরণে *ফ্রি ভার্স*, বা মিশ্রছন্দের প্রয়োগ ঘটান। মিশ্রছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন – '... তা মিশ্রছন্দ, যাতে একই কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়, কিংবা গদ্য-পদ্য মেশানো থাকে। ছন্দ ব্যবহারের কি অপব্যবহারের স্বাধীনতা আছে ব'লেই এর নাম ফ্রী ভার্স বাংলায় এর অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ দিতে গেলে শুধু অস্পষ্টতার ক্ষেত্র বাড়ানো হবে, তাছাড়া কিছু লাভ হবে না।'[১৪] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একেই বলেন – 'স্বয়ংবহ ছন্দ'।[১৫] স্বরাঘাত প্রদান, হলন্তাক্ষরবহুল, 'স্প্রাং রিদম্' এর এই ছন্দ – তাঁর ভাষায়, 'ধাতুসঙ্কর'।[১৬] গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে 'অর্ধনারীশ্বর মূর্তি' এই মুক্তছন্দের জন্মদাতা হুইটম্যান – যাকে সুধীন্দ্রনাথ বলেন – 'মুমূর্ষু কাব্যের ত্রাণকর্তা'।[১৭] *কালসন্ধ্যা* নাটকে বুদ্ধদেব বসু গদ্যছন্দের সাথে এই মিশ্রছন্দের সংযোজন ঘটান। সুভদ্রা-সত্যভামা-কৃষ্ণ-অর্জুন – এইসব প্রধান চরিত্রের সংলাপ থেকে সাধারণ জনতার মুখের ভাষাকে পৃথক করতে এবং নাটকের ভাব অনুযায়ী নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজনে বুদ্ধদেব বসু এই মিশ্রছন্দের ব্যবহার করেন। যেমন সত্যভামা-সুভদ্রা যখন গদ্যছন্দে কথোপকথনরত, তখন সুরা- বিহ্বল যাদব নরনারীর মত্ততার

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্যটি চিত্রিত করতে বুদ্ধদেব বসু কখনো স্বরবৃত্তে, কখনো মাত্রাবৃত্তে, কখনো একই অংশে স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটান। যেমন-

পুরুষেরা
ডাকছি
তোদের ডাকছি-
যত যাদব কুলস্ত্রী।
... ...

রমণীরা
আসছি,
আমরা আসছি-
বোনঝি মাসি ধুমসো রোগা
বৌদি ঠাকুরঝি।

এখানে রমণীদের সংলাপে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই ছন্দে বাঁধা, কিন্তু প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দের সাথে পরের দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দের মিল নেই। একইভাবে-

পুরুষেরা
চলছে
খেলা চলছে
পা টলছে
গা দুলছে
চোখ জ্বলছে
মদ লাস্যে। -
আর ফুলছে
ক্ষণে-ক্ষণে এক পাগল সাগর ফুলছে
হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!

এখানে উপরের পঙ্‌ক্তিগুলো স্বরবৃত্তে রচিত, আবার শেষ পঙ্‌ক্তি 'ক্ষণে-ক্ষণে এক পাগল সাগর ফুলছে' – মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সৃষ্ট। মূলত সুরাসক্ত যাদব নরনারীদের উশৃঙ্খলাকে শব্দায়িত করতে বুদ্ধদেব বসু এই মিশ্রছন্দের ব্যবহার করেন। সত্যভামার সংলাপেই নাট্যকার পুরুষ ও রমণীদের তালমানহীন ছন্দের ইঙ্গিত করেন-

সত্যভামা
শুনছো? ... গান শুনছো?
নেই তাল, নেই মান, মদিরায় উদ্দাম
পুরুষের, রমণীর কণ্ঠ।

শঙ্খ ঘোষ বুদ্ধদেব বসুর অন্তিম পর্বের রচনায়, অর্থাৎ কাব্যনাটকে এই মিশ্রছন্দ ব্যবহারের ইঙ্গিত করেন তাঁর 'ছন্দের বারান্দায়' – 'শেষ পর্যায়ে তারও পর আরেকটি নতুন মাত্রা লাগলো প্রকরণে। কেবল শ্লোকবন্ধ নয়, কবিতার সূচনায় নিয়মিত ছন্দের ধ্বনি ভরে উঠেছে, যদিও অল্পপরেই আবার খুলে নেওয়া হচ্ছে তার জাল। ... বাঁধন এবং খোলার মধ্যপথটুকু আরো কতদূর মসৃণ হতে পারে, হয়তো তারও পরীক্ষা এরপর তাঁর রচনায় দেখতে পাবো আমরা। ইতিমধ্যে কেবল এ- পর্যন্ত ধরতে পারছি যে, ফ্রি-ভার্স বা থেকে- থেকে আপাত পদ্যের দিকে টান দেবার পরীক্ষায়, গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার এই মিশ্র ধরনে। যেমন শিল্পকে জীবনের দিকে নয়, জীবনকেই শিল্পের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণ করতে চান কবি, যেমন তাঁকে বলতেই হয় 'তোমার জীবনে এখনো ফলিত ললিতকলার রূপরস/আমার জীবনে শুধু শিল্পের উপাদান' – তেমনি বাঁধাছন্দ থেকে গদ্যের দিকে নয়, গদ্যকেই তিনি তুলে নিতে চান স্পন্দনমহিমায়।'[১৮] নাটকের এই অংশ শব্দ ব্যবহারেও স্বতন্ত্র। এখানে নাট্যকার সংস্কৃত শব্দের সাথে ব্যবহার করেন প্রচুর কথ্যশব্দ, যা প্রায় মুখের ভাষার কাছাকাছি। যেমন, 'বোনঝি', 'মাসি', 'ঠাকুরঝি', 'বৌদি', 'রঙ্গ', 'শিকলি', 'ছুঁড়ি','খুঁড়ি' 'বুড়ি', 'ছোকরা', 'বোকড়া' প্রভৃতি – এমনকি ব্যবহার করেন দু'একটি *স্ল্যাং* শব্দও। যেমন : 'ধুমসো' 'মিঙ্গে' ইত্যাদি।

পুরুষ-রমণীদের সংলাপ-দৃশ্যের পর জনতার অংশগ্রহণে রাজপথে অনুষ্ঠিত দৃশ্যটির সংলাপ রাজনৈতিক আবহে স্লোগানধর্মী –

জনতার উগ্রকণ্ঠ

(নেপথ্যে)

নিপাত যাক, নিপাত যাক;

পাপিষ্ঠেরা নিপাত যাক!

... ...

দলপতি

ধ্বংস হোক ! ধ্বংস হোক !

অন্যেরা

(সমস্বরে)

পাপিষ্ঠ সব রাজন্যদের

ধ্বংস হোক!

দলপতি

মন্ত্র শোন ! মন্ত্র শোন ! মন্ত্র শোন !

অন্যেরা

(সমস্বরে)

আমরা আজ শক্তিমান দু:শাসন।

দলপতি

কণ্ঠে তোল অট্টরোল শঙ্খনাদ –

লুটবো রাজ দণ্ড আজ আমরা !

অন্যেরা

(সমস্বরে)

লুটবো রাজ দণ্ড আজ আমরা।

প্রথম অঙ্কে দলপতি ও নগরের মদমত্তা নরনারীদের কেন্দ্র করে নির্মিত অপর দুটি দৃশ্যেও লঘুছন্দে রচিত এবং এখানেও সংস্কৃত শব্দের সাথে কথ্য শব্দের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। যেমন -

চতুর্থ পুরুষ

ঢাল কণ্ঠে ধান্যেশ্বরী, টান অঙ্কে কামেশ্বরীকে।

তৃতীয় পুরুষ

না, না! – আর ধান্যেশ্বরী নয়।
এবার সীধু, মধু, কোহলে হবো মগ্ন।

দলপতি

আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছই ঈশ্বর।

দ্বিতীয় পুরুষ

আমাদের বৌগুলো সব জাউ পান্তা, ধ'রে আন
ওদের একঝাঁক গনগনে জোয়ান কিঙ্করী –
যেন লঙ্কা ঘি লবণ মাখা তপ্ত নবান্ন।

তৃতীয় পুরুষ

না, না! কিঙ্করী কেন? আর কিঙ্করী কেন?
এব্যার বিশুদ্ধ আর্যনারী – লেলিহান।
বাসুদেবের নাৎনি আছে অগুনতি।'

জনতার ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাদের জীবনের অনুষঙ্গ – 'ধান্যেশ্বরী', 'জাউ পান্তা', 'লঙ্কা ঘি লবণমাখা তপ্ত নবান্ন', 'স্নিগ্ধ তাল', 'সজল তালশাঁস' প্রভৃতি – এমনকি প্রবাদ-প্রবচনও, যেমন- 'আজ ঠগ বাছতে ভূ-ভারতে উজোড় হবে গাঁ!', কিংবা নারীদের আর্তস্বরের সংলাপে লৌকিক দেবীদের অনুষঙ্গ – 'মা ষষ্ঠী বাঁচাও! মা লক্ষ্মী বাঁচাও! মা দূর্গা বাঁচাও!' বুদ্ধদেব বসু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং *অনাম্নী অঙ্গনায়* কিছু কিছু লোকজ শব্দের ব্যবহার করেন, কিন্তু, তা *কালসন্ধ্যার* মতো এত বেশি নয়। তবে কথ্যভাষা এবং পদ্যছন্দ *কালসন্ধ্যায়* একটি আরেকটির পরিপূরক হয়ে ওঠে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় – '*কালসন্ধ্যায় কথ্যভাষায় চাল আর ছন্দের চালের সাযুজ্য নাটককে এগিয়ে নিয়ে* যায়। কথ্যস্রোতে যে উপভোগ্য ঝাকুনি (*jerk*), যে আকস্মিক মোড়ফেরা লক্ষ করি, কাব্যনাটকের চরিত্র পাত্রদের মুখের ভাষাতে কাব্যছন্দ তাকে অমান্য করেনি।'[১১]

তবে পুরানের অনুসরনে দ্বারকাপুরীর মানুষের দুঃস্বপ্ন-ভ্রান্তি-অধ্যাসকে চিত্রিত করতে নাটকে বুদ্ধদেব বসু স্ত্রীলোকদের যে সংলাপে নির্মাণ করেন তা অনেকাংশে সম্প্রকাশবাদী (*expressionistic*) –

প্রথম স্ত্রীলোক

ভয় পেয়েছি গো, ভয় পেয়েছি আমরা'।

দ্বিতীয় স্ত্রীলোক

গাভী বিয়ালো ছাগল, পায়রাগুলো হক্কাহুয়া চ্যাঁচায়'

তৃতীয় স্ত্রীলোক

আমাদের ঘুমের মধ্যে রাত্রি ভ'রে ইঁদুর
খুঁটে খায় চুল, নখ, গায়ের চামড়া।'

চতুর্থ স্ত্রীলোক

স্বপ্নে দেখি আমাদের বুকের দুধ শুষে নিচ্ছে
বিকট জোঁক, রক্তমুখী বাদুড়;

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম স্ত্রীলোক

আর দেখ লক্ষ কৃমিকীট আমাদের অন্নে।'

আবার মদের ভাঁড় হাতে প্রহরীদ্বয়ের সংলাপে নাট্যকার ব্যবহার করেন সংস্কৃত শব্দ –

প্রথম প্রহরী

(ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিবে)

চেয়ে দ্যাখ – চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ
ওদের কতনা ছিলো ভোস্য :
মৃগয়ার উল্লাস, যজ্ঞের সৌরভ,
রণক্ষেত্রে জয়লক্ষ্মী
প্রণয়িণী বণিতার অঙ্ক
এবং দীপ্তিশালী সন্তান,
মধুর স্তোত্রপাঠে মিশ্রিত প্রভাতের তন্দ্রা
এবং নৃত্যে-গীতে মন্দ্রিত সন্ধ্যার মন্দির –
যা-কিছু উৎসাহিত করে মরজীবনে।
অথচ ওরাই আজ শেষ পর্যন্ত
চীৎকৃত বায়ুবেগে বলছে :
ধ্বংসের মতো আর সুখ নেই।

এই নাটকে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে *কোরাসের* মতো করে 'পুরুষ-রমণীর সংলাপ, জনতার সংলাপ, স্ত্রীলোকদের সংলাপ, প্রহরীদের সংলাপ নির্মাণ করেন বুদ্ধদেব বসু এবং আলাদা আলাদা শব্দ, ছন্দ ও ভঙ্গি প্রয়োগ করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কোরাসের চরিত্রগুলো এবং তাদের উদ্দেশ্যকে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করে দেন। আবার সবগুলো দৃশ্য মিলে দ্বারকাপুরীর অবক্ষয় চিত্রের পুরিপূর্ণ রূপটি পরিস্ফুট করে তোলেন। রীতিটা অনেকটা কোলাজধর্মী। ড: কণিকা সাহার মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত –'এলিয়ট নাটকে *কোরাস* ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ঠিক সেভাবে *কোরাস* ব্যবহার না করলেও তার সংলাপ গ্রন্থনের ক্ষেত্রে *কোরিক* আবেদন যথেষ্টই রয়েছে। নাটকের চরিত্রাবলী একই ভাববৃত্তের অর্ন্তগত, তাই তাদের অভিজ্ঞতা এক হয়েও প্রকাশে বহু। তাদের বাচনভঙ্গি আলাদা, কণ্ঠস্বর আলাদা – যা তাদের আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। তারা নানাভাবে চিত্রিত হলেও তার ভিতর থেকে জেগে উঠেছে এক সুর।'[২০]

সত্যভামা ও সুভদ্রা যেহেতু অভিজাত চরিত্র, ফলে তাদের সংলাপ স্বভাবতই মার্জিত এবং গদ্যছন্দে, নির্বাচিত শব্দ ব্যবহারে তাতে কখনো শঙ্কা, কখনো ধিক্কার, কখনো রোমন্থন, কখনো সম্ভাবনা, কখনো হতাশার ভাব ব্যক্ত হয়। যেমন-

সত্যভামা

সুভদ্রা, আমার মন অন্য কথা বলে।
অকস্মাৎ দেখি যেন রশ্মিরেখা, যা এখনো দিগন্তে লুকোনো।
জানো তো, যখন রাত্রি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অমায় মগ্ন,
তখনই নূতন উষা আসন্ন, প্রস্তুত।

সুভদ্রা

আমি দেখি দ্বারকায় সর্বনাশ উড়িয়েছে ধ্বজা,
উন্মাদ রাজন্যকুল, আশঙ্কায় বিহ্বল জনতা,
পঞ্চভূত উতরোল, চরাচরে ওঠে প্রতিবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

কখনো কখনো তাদের সংলাপে ব্যক্ত হয় জীবন সম্পর্কে সাধারণ দর্শন। যেমন-

সুভদ্রা

কে আছে এমন দুঃখী, যে নয় অন্তরতলে জীবনভিক্ষুক?

সত্যভামা

অশ্রুময় মর্ত্যলোক, তবু জীব নিরন্তর আশায় উৎসুক।

কিংবা

সুভদ্রা

আমাদের সব সুখ – অন্তরালে বয়ে যার অশ্রুর প্লাবন।

সত্যভামা

জ্বলে প্রেম আত্মভুকঃ লালসায়, বিচ্ছেদের তীব্র তাপে, ঈর্ষার জ্বালায়

সুভদ্রা

কখনো বোঝেনা কেউ কোন গুপ্ত ছিদ্রপথে যৌবন পালায়।

সত্যভামা সুভদ্রার অন্ত্যমিল যুক্ত এই সংলাপ-পরম্পরার সাথে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সাদৃশ্য লক্ষ করেন গ্রিক ট্র্যাজিডির *Stichomythia* আঙ্গিকরীতির'।[২১] সুভদ্রার শেষোক্ত সংলাপে চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়। সত্যভামা - সুভদ্রার সংলাপে অলঙ্কারের আরো অনেক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় :

সুভদ্রা

জনগন ছোটে উদ্‌ভ্রান্ত,
আর্তি ও আক্রোশে ফুঁপে ওঠে গর্জন,
বাত্যাচালিত যেন বহ্নি অশান্ত।'

রাজপথের উদ্দেশ্যে ছুটে চলা সুরামত্ত বিশৃঙ্খল জনতার সাদৃশ্যে সুভদ্রা তার সংলাপে এ উৎপ্রেক্ষাটি উল্লেখ করে। সত্যভামার সংলাপেও ব্যবহৃত হয় উপমা–

সত্যভামা

সুভদ্রা, মাভৈ।
ঐ তিনি আসছেন ।
মুখশ্রী উদ্বেগহীন,
ধীর শান্ত পদক্ষেপ –
সুন্দর চিরকিশোর, নির্মেদ, শ্যামল,
বসন্তের হরিৎ ভূর্জের মতো কান্তিমানঃ
তুমি যাঁর ভগ্নি, আর আমি যাঁর মানিনী বণিতা।

কালসন্ধ্যা নাটকে বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনের ধারক চরিত্র কৃষ্ণ। কাব্যনাটকে 'যদিও সমস্ত চরিত্রের মধ্যে অপক্ষপাত স্রষ্টার মতো বিরাজ করা তাঁর (নাট্যকারের) কর্তব্য, তবুও কোনো কোনো সময় যে চরিত্র কাব্যনাটকের সত্তার অন্ত র্নিহিত সম্ভাবনাকে আলোয় টেনে বের করে, সেই সমস্ত চরিত্রের মুখের কথার সঙ্গে কাব্যনাটকের নিজের কথা যেন দ্বৈতকণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে। কারণ কাব্যনাট্যকার শুধু বহুরূপী স্রষ্টা নন, তিনি কবি, তিনি দ্রষ্টা। পরিস্থিতি-পরিবেশ অনুযায়ী, চরিত্রসঙ্গতি বজায় রেখে সংলাপের বাক্যপুঞ্জে একটি প্রাথমিক অর্থ থাকে, অন্যদিকে কাব্যনাট্যকারের

Dhaka University Institutional Repository

নিজের তরফ থেকে সেই একই বাক্যপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তিনি সঞ্চারিত করে দেন কোনো স্বতন্ত্র মহত্তর ব্যঞ্জনা।'[২২] *কালসন্ধ্যায়* বুদ্ধদেব বসু কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে অন্তর্প্রবিষ্ট হয়ে, তার সংলাপের মধ্য দিয়ে মহাকালের বৈনাশিক সত্তা ও জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্মের দর্শনকে ব্যক্ত করেন। কৃষ্ণের সংলাপ তাই গূঢ় ও প্রতীকার্থক –

কৃষ্ণ

... এও নিয়মের অংশ, আদিষ্ট অলঙ্ঘনীয়,
আঘাতের প্রত্যাঘাত, ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি,
লোষ্ট্রাহত জলের কম্পান শুধু।
জেনো, যারা ছিলেন বিশ্রুত বীর, তারা অনাবশ্যক এখন,
তাই প্রত্যাহৃত।
জেনো, এই ধ্বংস - এও ভালো। এরই সংযোজনে
ফিরে এলো বৃত্তবিন্দু, পূর্ণ হ'লো কালের ঘূর্ণন।

অর্জুনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ-প্রেরিত বার্তাও প্রতীকী তাৎপর্যময় – 'সময়ের উচ্ছিষ্ট যা ছিলো,/ধবল ও কৃষ্ণবর্ণ মুষিকেরা তাও আর রাখল না বাকি।' কৃষ্ণের সংলাপে প্রতিফলিত হয় তার স্বভাবসুলভ নিরাসক্তি। যেমন- 'দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভব' কিংবা 'জন্ম থেকে সকলেই মৃত/চিরকাল সকলেই মৃত,/ জীবিত ও মৃতে কোন ভেদ নেই।' অথবা 'যা আছে, তা চিরকাল ধ্বংসের অতীত,/ যা নেই তা কখনো ছিলো না' প্রভৃতি। তবে, কৃষ্ণের মুখে যদুবংশের ধ্বংসের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ। ক্রমবিস্তারিত দাবাগ্নির চিত্রকল্পে কৃষ্ণ বর্ণনা করেন যদুবংশের হনন-প্রতিহননের ঘটনা –

কৃষ্ণ

যে মুহূর্তে সাত্যকি হঠাৎ রোষে বুদ্ধিভ্রষ্ট
অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন,
সেই ক্ষণ থেকে এক অনল বিস্তীর্ণ হ'লো
সবর্ভুক উৎসাহে রক্তিম,
জন থেকে জনান্তরে, তৃণ থেকে তৃণান্তরে যেন।

জ্ঞাতি-পতনের ঘটনা বর্ণনায় কৃষ্ণ ব্যবহার করেন অসাধারণ সব উৎপ্রেক্ষা ও উপমাগুচ্ছ –

কৃষ্ণ

হত শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ
ইত্যাদি জ্ঞাতিরা – দ্রুত – পরস্পর কিংবা যুগপৎ –
যেন ঝরে শুকনো পাতা অবিরল চৈত্রের বাতাসে,
অথবা ঝাঞ্ঝার বেগে উৎপাটিত অগণন দ্রুম।
... ...
তুলি তৃণ – যাদবেরা পড়ে যায়
কৃষকের উৎকলিত ধানের গুচ্ছের মতো,
অথবা ব্যাধের
বাণবিদ্ধ যেন হংসশ্রেণী

যাদব নারীদের সংলাপে দ্বরকারপুরী-নিমজ্জনের দৃশ্যও কবিত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব বসু এ অংশে ব্যবহার করেন শৃঙ্খল-চিত্রকল্প (*Chain Imagery*) – কোনো কোনো অংশ সমাসোক্তি-প্রবণ ও শব্দ ধ্বনিময় –

দ্বিতীয় নারী

নিমেষে নিমেষে আরো উগ্র, ভয়ংকর

Dhaka University Institutional Repository

ঐ শোন সিন্ধুর চিৎকার।

তৃতীয় নারী

অশ্বখুরধ্বনি, চক্রের ঘর্ঘর
প্রলয়ের কলরোলে ডুবে যায়।

চতুর্থ নারী

স্বচক্ষে আজ তবে এও হ'লো দেখতে –
সমুদ্র দ্বারকার রাক্ষস।

পঞ্চম নারী

ফেনময়, দন্তিল, কুৎসিত উল্লাসে
ছুটে আসে উত্তাল বন্যা।

প্রথম নারী

যত যাই, তত আসে নিষ্ঠুর এগিয়ে,
গিলে নেয় উজ্জ্বল নগরী।

দ্বিতীয় নারী

গিলে নেয় উদ্যান, প্রান্তর, লোকালয়,
মুহূর্তে ডোবে জীবজন্তু।

... ...

পঞ্চম নারী

ক্রমশ আকাশ, জল হ'য়ে আসে নির্ভেদ,
তরঙ্গ যেন গিরিশৃঙ্গ।

... ...

দ্বিতীয় নারী

এখন শব্দ শোন অশ্বখুরধ্বনি
কানে-কানে বাতাসের নিস্বন।

দ্বিতীয় অঙ্কে দস্যুদের আক্রমনে যাদব-নারীদের অসহায়ত্ব এবং স্বেচ্ছাসমর্পণের দৃশ্য ছন্দে রচিত। নাটকের দৃশ্যান্তরে ভাবগত বৈচিত্র্য সৃষ্টিই এর লক্ষ্য। যাদব নারীদের সংলাপে –

দ্বিতীয় নারী

ঠমক ছাড়, এগিয়ে চল, লজ্জা কী?

তৃতীয় নারী

দুস্য, তোর অস্ত্র হেনে আমায় বাঁচা

চতুর্থ নারী

তার চেয়ে বোন মিন্সেটাকে বাঁদর নাচা।

প্রথম নারী

হে ভগবান, রক্ষা করো, হে দয়াময়।

দ্বিতীয় নারী

Dhaka University Institutional Repository

যা বলিস না,　　ওরা তেমন　　কুশ্রীও নয়।

তৃতীয় নারী

বিষ এনে দে,　　গলায় ঢালি　　এক্ষুণি

চতুর্থ নারী

ঠকম ছেড়ে　　হাত মেলা না!　　লজ্জা কী?

মূলত নাটকীয়তা ও কবিত্বের পরম্পরা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব বসু *কালসন্ধ্যা* নাটকে এই ছন্দ ও ছন্দপাতের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। এ অংশেও সংগত কারণেই তিনি ব্যবহার করেন লোকজ শব্দ, এমনকি অনুসরণ করেন লোকজ ভঙ্গি পর্যন্ত। যেমন -

দুস্য দলপতি

ও বিধবা বৌ
ওলো ওমুক কুলের ঝি
আয় আমাদের সঙ্গে, আবার
হবি ত্রয়োস্ত্রী।　কিংবা,

দুস্য দলপতির সংলাপে লক্ষ করা যায় প্রবাদের ব্যবহার –

দস্যু দলপতি

কেন রে যমের ভিটে মাড়াবি,
সাধ্য কী আমাদের তাড়াবি!

অভিজাত চরিত্র হিসেবে অর্জুনের সংলাপে লক্ষ করা যায় সংস্কৃত শব্দাধিক্য। যেমন - দস্যু আক্রান্ত নির্বীর্য, নিঃসহায় অর্জুনের সংলাপ –

অর্জুন

(চোখ খুলে, অর্ধেক উঠে ব'সে)

কেন আর আসে না স্মরণে
সেই দিব্যাস্ত্র, আমার যাতে
অদ্বিতীয় ছিল অধিকার?
শরজাল জ্যামুক্ত বিদ্যুৎ যেন,
অগ্নিগর্ভ অসি,
বজ্রতুল্য দণ্ড ও নারাচ,
পক্ষবান পাশ, প্রাস, পরশু, তোমর–
এদের আহ্ববানমন্ত্র –

কালসন্ধ্যা নাটকে কৃষ্ণের মতো ব্যাসদেব চরিত্রটিও বুদ্ধদেব বসুর মুখপাত্র। ফলে *উত্তরকথনে* ব্যাসদেবের সংলাপ তাৎপর্যপূর্ণ, সংস্কৃত শব্দবহুল, গদ্যছন্দ রচিত এবং দার্শনিক দার্ঢ্য ও ওজস্বিতাপূর্ণ –

ব্যাসদেব

শেখো ঃ
কাল সেই গর্ভ, বীজ, ধাত্রী, ও শ্মশান,
যা ঘটায় নিরন্তন আবর্তনে, জন্ম, বৃদ্ধি অবক্ষয়, অবলুপ্তি,

Dhaka University Institutional Repository

আনে কীর্তি, এবং কীর্তির ধ্বংস;
আনে যাকে লোকে ভাবে যুগান্তর,
কিন্তু যা নিতান্ত পুনরাবৃত্তি, শুধু বধ্য – ঘাতকের স্থান-বিনিময়।' কিংবা

ব্যাসদেব
এই সব কুশীলব – ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,
একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার।

চরিত্রানুযায়ী সংস্কৃত ও লোকজ শব্দের যথাযথ ব্যবহার, অলংকারিতা, গদ্যছন্দ ও মিশ্রছন্দের সার্থক প্রয়োগে *কালসন্ধ্যা* নাটকের সংলাপ ও শব্দ-ভাষা নিরীক্ষাধর্মী, নতুনত্ব চিহ্নিত।

অনাম্নী অঙ্গনা

অনাম্নী অঙ্গনা একাঙ্ক নাটক। *অনাম্নী অঙ্গনার* সংলাপ অন্তর্মময়তা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক। ফাল্গুনের এক অপরাহ্নে সিঁড়ির নিম্নতম ধাপে উপবিষ্ট অঙ্গনার গানে নাটক আরম্ভ হয় –

অঙ্গনা
অনেক দূরে ছোট্ট এক কুটির,
খড়ের চালে রৌদ্র জ্বলে সোনা,
সামনে উঠোন, খিড়কি দোরে পুকুর,
তেঁতুলতলায় শিউরে ওঠে ছায়া;
দূর, অনেক দূর।
... ...
অনেক দূরে সুঠাম এক যুবক
নিপুণ হাতে বোনে রঙিন সুতো,
দেখা হ'লে চক্ষে হাসে মধুর,
কোমল স্বরে দু-চার কথা বলে;
- দূর, অনেক দূর।

গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গে রচিত গানটিতে অঙ্গনার স্বপ্ন-কল্পনা সঞ্চারিত হয়ে একটি রোমান্টিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। খড়ের চালে রৌদ্রের ঝিকিমিকি, 'তেঁতুলতলার শিউরে ওঠা ছায়া, সুঠাম যুবক, তার নিপুন হাতে রঙিন সুতো বোনা, মধুর হাসি এবং বহুদূরের ইঙ্গিতে চিত্রময়তার সাথে এক ধরনের রোম্যান্টিক রহস্যময়তা তৈরি হয় অঙ্গনার গানে। গানটিকে বলা যায় যথার্থ 'গদ্য-গান'– যেখানে সহজ সরলভাবে অঙ্গনার মুখের কথাই সুরে পরিণত হয়। অঙ্গনার এ গানে অন্ত্যমিলের ধারবাহিকতা নেই : 'কুটির', 'পুকুর', 'মধুর' এ ধরনের শব্দগুলোকে মিল না বলে, বুদ্ধদেব বসু বলতেন 'অর্ধমিল' বা 'স্বরানুপ্রাস'। এ গান ছন্দ-নির্ভর নয়, সুর-নির্ভর। নাটকে অঙ্গনার অপর দু'টি গান ও 'গদ্যগান' এবং গেয়।[২৩]

অঙ্গনার গানের পরেই সখীদের সাথে তার কথপোকথনের অংশটিতে বুদ্ধদেব বসু প্রাকৃত জীবন ও মনস্তত্ত্বকে রূপায়িত করেন। অঙ্গনার সাথে তার সখীদের কথোপকথন দৃশ্যে সংস্কৃত শব্দের সাথে কিছু কথ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন –

প্রথম সখী
এত অধ্যবসায় – তবু অপুত্রক
চাষির বৌ সাত ছেলের মা হ'য়ে যেতো।

Dhaka University Institutional Repository

বল তো,
রাণী হয়ে কী লাভ যদি স্বামী হন বন্ধ্য ?

কবিত্বের অনির্বচনীয় উদ্ভাসনের সাথে সাথে কাব্যনাটককে নেমে আসতে হয় প্রাত্যহিক জীবনের স্থূলতায়। খুঁজে নিতে হয় 'জীবন থেকে সেইসব কথ্য, আঁকাড়া, হয়তোবা অমার্জিত শব্দ'। অথচ তাতে থাকতেই হয় 'কবিতার গূঢ় ব্যঞ্জনা'।[২৪] 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় রাজবাড়ির অন্তঃপুরের পরিচারিকাদের মুখের ভাষায় কথ্য শব্দ অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা যথেষ্ট কবিত্বপূর্ণ'। যেমন - অঙ্গনার উদ্দেশ্যে তৃতীয় সখীর সংলাপ –

তৃতীয় সখী

কিন্তু দেখিস –
এই যৌবনকাল – ফাল্গুনমাসঃ
পথ চলতে প্রণয়,
জল তুলতে প্রণয়,
পায়ে-পায়ে তাই বিপদ, তাই ভয়।
সহজে নামে স্বপ্ন – বড়ো সহজে,
বুকের মধ্যে কাঁপন - বড়ো সহজে,
অঙ্গনা,
মনে রাখিস হলদে সুতোয় বাঁধতে হবে আগে,
তারপর অন্যসব।

সংলাপটি ভাবের দিক থেকে বাস্তবসম্মত হয়েও ধ্বনি-পুনরাবৃত্তি – এমনকি শব্দ পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে তা লিরিক ব্যঞ্জনাপ্রাপ্ত। অঙ্গনার সংলাপে ব্যবহৃত উৎপেক্ষাটি তাদের জীবনেরই অনুষঙ্গে রচিত –

অঙ্গনা

রুমা, সুনন্দা, হিরন্ময়ী
স্নিগ্ধ তোমাদের বচন, যেন শ্রমের পরে দিঘির জলে স্নান।

অঙ্গনার সংলাপে তার প্রণয়ের চিত্রকল্পটি কবিত্বপূর্ণ –

অঙ্গনা

আর তাই আমার প্রণয়
এখানে শুধু ক্ষীণ এক তরু, যাতে সবেমাত্র একটি - দু'টি কুঁড়ি
কাঁপছে আশায়, ভোরের বাতাসে, উদীয়মান দিনের দিকে তাকিয়ে।

অঙ্গনা এবং তার সখীদের সংলাপে ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলো প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিতি সব অনুষঙ্গকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও কবিত্বের প্রসাদে সেগুলো অসাধারণত্বপ্রাপ্ত। যেমন – অঙ্গনার প্রথম সখীর একটি সংলাপ –

প্রথম সখী

তোর বিষাদ
ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের মনে,
যেমন বৈশাখের মেঘ
প্রথমে আমার হাতের মতো ছোটো, তারপর আকাশ-জোড়া।

কখনো অক্ষম ক্রোধে বঞ্চিত এইসব অঙ্গনাদের সংলাপ হয়ে ওঠে তির্যক, ব্যঙ্গপ্রবণ –

অঙ্গনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত সমালোচকদের এই মন্তব্যে 'নারী-পুরুষের সংলাপ' বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ *অনাম্নী অঙ্গনায়* প্রত্যক্ষভাবে কোন পুরুষ চরিত্র নেই। ফলে তাদের সংলাপ ও থাকার প্রশ্ন উঠে না। নাটকটি নারীচরিত্রকেন্দ্রিক এবং তাদের সংলাপেই নির্মিত। তবে, কখনো কখনো কোনো নারীচরিত্রের সংলাপে পুরুষের মন্তব্য পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন - সত্যবতীর সংলাপে পরাশর মুনির উদ্ধৃতি –

সত্যবতী

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,
শ্রীমতী, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। আমাকে বিমুখ কোরো না

কিংবা, অঙ্গনার সংলাপে ব্যাসদেবের কথার উল্লেখ –

অঙ্গনা

একটি দীর্ঘ নির্ঘোষে ব'লে গিয়েছিল –
রাজবধূর ছদ্মবেশে, রাজপত্নীর শয্যায় – নারী, তুমি কে?

এছাড়া কোনো পুরুষচরিত্রের প্রত্যক্ষ সংলাপ *অনাম্নী অঙ্গনার* কোথাও লক্ষ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কেবল 'মহাভারতীয় পরিবেশ অক্ষুন্ন ও অবিকল রাখার প্রয়াসে' বুদ্ধদেব বসু *অনাম্নী অঙ্গনায়* অভিজাত-অনাভিজাত চরিত্রের সংলাপ-পার্থক্য ঘটান না - এ যুক্তি তেমন জোরালো নয়। কারণ বুদ্ধদেব বসুর সবগুলো কাব্যনাটকই মহাভারতাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং বিশেষভাবে *কালসন্ধ্যায়* তিনি চরিত্রানুযায়ী কথ্যভাষার প্রচুর প্রয়োগ করেন। কথা সত্য যে, *কালসন্ধ্যার* মতো *অনাম্নী অঙ্গনায়* চরিত্রানুযায়ী ভাষা-পার্থক্য তত প্রকট নয় এবং এখান অন্ত্যজ চরিত্রের সংলাপে কথ্যভাষার প্রয়োগ খুব অল্প, কিন্তু, তার পেছনে দু'টি কারণ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। প্রথমত অঙ্গনার বিবর্তনই যেহেতু নাটকের অন্যতম লক্ষ্য, সেহেতু অঙ্গনার সংলাপ ও ভাষাগত বিবর্তনটিও গুরুত্বপূর্ণ। আর এ বিবর্তনটি যদি তীব্র ও প্রকট হয়, তবে তা হতো বিসদৃশ, অবাস্তব। অঙ্গনার বিবর্তন তখন হতো – 'সিনেমাটিক'। সেজন্যই নাটকের প্রথম অংশে অঙ্গনা-যে সামান্য পরিচারিকা মাত্র, তার ভাষার সাথে বিবর্তিত অঙ্গনার ভাষার পার্থক্যকে সহনীয় রাখার জন্যেই বুদ্ধদেব বসু লোকজ শব্দের পরিমিত ব্যবহার করেন এ অংশে। আর অঙ্গনার সাথীরা যেহেতু স্বভাবতই চিন্তা-ভাবনা এবং কথাবার্তায় তার সমগোত্রীয়, সেহেতু তাদের ভাষাও হয় অঙ্গনার ভাষার অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, কাম-সম্পর্কিত মহত্তর দর্শনকে রূপান্বিত করতে বুদ্ধদেব বসু *অনাম্নী অঙ্গনায়* একটি আনুপূর্বিক কবিত্বের 'মুড়' বজায় রাখতে চান। *কালসন্ধ্যার* মতো ভাবগত ও ভাষাগত বৈপরীত্য এখানে প্রয়োগ করলে সেই অন্ত নিহিত 'রিদম' বা সুর ব্যাহত হতো। সেক্ষেত্রে নাটকের ভাষা এর কবিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতো। তাছাড়া *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং *কালসন্ধ্যার* তুলনায় *অনাম্নী অঙ্গনা* ছোট নাটক। ঐ নাটকগুলোর বিস্তৃতি অনুযায়ী বিশেষ দৃশ্যে কথ্যভাষার ব্যবহার মানানসই, কিন্তু 'অনাম্নী অঙ্গনা'র ছোট্ট পরিসরে অন্ত্যজ চরিত্রের মুখে প্রচুর পরিমাণে কথ্যভাষার প্রয়োগ ঘটালে নাটকটি প্রায় কথ্যভাষা - সর্বস্ব নাটকে পরিণত হতো- বিশেষত প্রধান চরিত্র অঙ্গনার সংলাপে যদি অন্ত্যজ ভাষা ব্যবহার করা হয়। তাই বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে অঙ্গনা ও তার সাথীদের সংলাপে লোকজ ভাষার পরিমিত ব্যবহার করেন, যেন নাটকের মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে অভিজাত চরিত্রের সংলাপের সাথে অন্ত্যজ চরিত্রের সংলাপের পার্থক্য সৃষ্টি করেন একটি বিশেষ কৌশলে তিনি অন্ত্যে ক্রিয়াপদ বর্জন করেন, কখনো ক্রিয়াপদই বর্জন করেন এবং সংস্কৃত শব্দাধিক্য ঘটান; অপরদিকে অপ্রধান চরিত্রের সংলাপে ক্রিয়াপদের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখেন, বর্জন করেন সংস্কৃত শব্দ। যেমন : অঙ্গনার সখীদের সংলাপে-

প্রথম সখী

মনে পড়ে গেলো
শুকনো কাপড় ঘরে তোলা হয়নি –
সূর্য অপরাহ্নে নামলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দেবী অম্বিকা
আমাকে মুক্তি দিতে সম্মত নন –
(ব্যঙ্গ ও বেদনামিশ্রিত সুরে)
তিনি আমাকে স্নেহ করেন।

তৃতীয় সখী

(তীক্ষ্ণ ও বিদ্রূপের স্বরে)

পক্ষিণীর প্রতি মাংসাশী যেমন স্নেহশীল!

দ্বিতীয় সখী

যেমন গাভীর প্রতি দুগ্ধজীবী ব্রাহ্মণ!

প্রথম সখী

যেমন মৃগের প্রতি মৃগয়াসক্ত ক্ষত্রিয়!

অঙ্গনাদের সংলাপে একঝাঁক ব্যঙ্গের তীর নিক্ষিপ্ত হয় রানী অম্বিকার উদ্দেশ্যে। চিরকালের শোষক শ্রেণির প্রতি সুবিধা বঞ্চিত, অবদমিত এই মানুষগুলোর ব্যঙ্গের ভাষা, শেলের মতো তীক্ষ্ম, তীব্র আবার কখনো বেদনায় তা করুণ। অঙ্গনার সংলাপে –

অঙ্গনা

বেশ্যারমণ, পরদার গমন, পরপুরুষের সংস্রব,
বিধবার গর্ভে সন্তান, কুমারীর গর্ভে সন্তান –
সব শ্লাঘ্য তাঁদের পক্ষে। কেননা তাঁরা
তৃপ্তিহীনভাবে দোহন করেন, বসুন্ধরা ও বৈকুণ্ঠ
কেননা তারা প্রবল।
আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন,
আমরা শুধু দেখে যাবো – মেনে নেবো – কথা বলবো না।

এ সংলাপে ঋষি ও রাজন্যকুলের তৃপ্তিহীন বিত্তলোভ ও সম্ভোগ পিপাসার প্রতিতুলনায় যেমন 'হরিৎ ও নীলবর্ণ' কামধেনুর উপমা ব্যবহৃত, তেমনি অবদমিত মানুষের তুলনায় ব্যবহৃত হয় মৃত্তিকালগ্ন তৃণের উপমা। কাব্যনাটককে 'আমাদের পরিচিতি অধঃপতিত স্বপ্নের জগৎ, বিশ্বাস ভঙ্গের ভুবন, তার একখণ্ড বস্তুমরীচিকা' ধারণ করতে হয়, ' তারই মধ্যে আবার বিম্বিত করতে হয় উপলব্ধির নির্যাসকে, প্রতীকী সত্যেকে। মানুষের জগৎকে বর্জন করে নাটক রচিত হতে পারে না, কেননা *It is the anthropomorphic form par excellence*। মানুষের সঙ্গেই এসে যায় মানুষের সংঘাত পরিশ্রম স্বেদের লবণ। কিন্তু কাব্যনাট্য সেই দিনানুদিনের স্তরে থাকে না, তাকে উঠতে হয় ধ্যানময় সত্যের স্তরে, স্থায়ী উপলব্ধির অতিমর্ত্য জগতে।'[২৫] *অনাম্নী অঙ্গনায়* অঙ্গনার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মহত্তর দর্শনকে রূপায়ন করা বুদ্ধদেব বসুর লক্ষ্য, কিন্তু তা বাস্তব জগতের ভিত্তি বর্জিত উর্ধ্বচারী কল্পনা বিলাস নয়। অঙ্গনা ও তার সাথীদের সংলাপের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু কল্পনার সাথে বস্তুজগতের সম্বন্ধ ঘটান। তবে কোনো কোনো সামালোচক এ অংশে অন্ত্যজ নারীদের মুখে মার্জিত ভাষার ব্যবহার অসঙ্গত বলে মনে করেন – 'স্বভাবতই একটি প্রশ্ন থেকে যায়। *অনাম্নী অঙ্গনায়* আছে অভিজাত ও অনভিজাত দুই শ্রেণির নারী ও পুরুষের সংলাপে শিষ্টভাষায় প্রয়োগ মেনে নেওয়া গেলেও সাথীদের সংলাপের শিষ্টতা কতোদূর শিরোধার্য বুদ্ধদেব শিল্পসৃষ্টির তাগিদে একথা বেমালুম বিস্মৃত হয়েছেন ভেবে কষ্ট পাই। এ কষ্ট পাওয়ার হয়তো বাস্তব কারণ থাকতে পারে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি যে, যে কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে আহৃত সেই মহাভারতীয় পরিবেশ অক্ষুণ্ন ও অবিকল রাখার প্রয়াস বুদ্ধদেব ভাষার শিষ্টতা রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন; তখন সংলাপ রচনার অসংগতি আর দুর্বিষহ ঠেকেনা।'[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত সমালোচকদের এই মন্তব্যে 'নারী-পুরুষের সংলাপ' বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ *অনাম্নী অঙ্গনায়* প্রত্যক্ষভাবে কোন পুরুষ চরিত্র নেই। ফলে তাদের সংলাপ ও থাকার প্রশ্ন উঠে না। নাটকটি নারীচরিত্রকেন্দ্রিক এবং তাদের সংলাপেই নির্মিত। তবে, কখনো কখনো কোনো নারীচরিত্রের সংলাপে পুরুষের মন্তব্য পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন - সত্যবতীর সংলাপে পরাশর মুনির উদ্ধৃতি –

সত্যবতী

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,
শ্রীমতী, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। আমাকে বিমুখ কোরো না

কিংবা, অঙ্গনার সংলাপে ব্যাসদেবের কথার উল্লেখ –

অঙ্গনা

একটি দীর্ঘ নির্ঘোষে ব'লে গিয়েছিল –
রাজবধূর ছদ্মবেশে, রাজপত্নীর শয্যায় – নারী, তুমি কে?

এছাড়া কোনো পুরুষচরিত্রের প্রত্যক্ষ সংলাপ *অনাম্নী অঙ্গনার* কোথাও লক্ষ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কেবল 'মহাভারতীয় পরিবেশ অক্ষুন্ন ও অবিকল রাখার প্রয়াসে' বুদ্ধদেব বসু *অনাম্নী অঙ্গনায়* অভিজাত-অনাভিজাত চরিত্রের সংলাপ-পার্থক্য ঘটান না - এ যুক্তি তেমন জোরালো নয়। কারণ বুদ্ধদেব বসুর সবগুলো কাব্যনাটকই মহাভারতাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং বিশেষভাবে *কালসন্ধ্যায়* তিনি চরিত্রানুযায়ী কথ্যভাষার প্রচুর প্রয়োগ করেন। কথা সত্য যে, *কালসন্ধ্যার* মতো *অনাম্নী অঙ্গনায়* চরিত্রানুযায়ী ভাষা-পার্থক্য তত প্রকট নয় এবং এখান অন্ত্যজ চরিত্রের সংলাপে কথ্যভাষার প্রয়োগ খুব অল্প, কিন্তু, তার পেছনে দু'টি কারণ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়। প্রথমত অঙ্গনার বিবর্তনই যেহেতু নাটকের অন্যতম লক্ষ্য, সেহেতু অঙ্গনার সংলাপ ও ভাষাগত বিবর্তনটিও গুরুত্বপূর্ণ। আর এ বিবর্তনটি যদি তীব্র ও প্রকট হয়, তবে তা হতো বিসদৃশ, অবাস্তব। অঙ্গনার বিবর্তন তখন হতো – 'সিনেমাটিক'। সেজন্যই নাটকের প্রথম অংশে অঙ্গনা-যে সামান্য পরিচারিকা মাত্র, তার ভাষার সাথে বিবর্তিত অঙ্গনার ভাষার পার্থক্যকে সহনীয় রাখার জন্যেই বুদ্ধদেব বসু লোকজ শব্দের পরিমিত ব্যবহার করেন এ অংশে। আর অঙ্গনার সাথীরা যেহেতু স্বভাবতই চিন্তা-ভাবনা এবং কথাবার্তায় তার সমগোত্রীয়, সেহেতু তাদের ভাষাও হয় অঙ্গনার ভাষার অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, কাম-সম্পর্কিত মহত্তর দর্শনকে রূপান্বিত করতে বুদ্ধদেব বসু *অনাম্নী অঙ্গনায়* একটি আনুপূর্বিক কবিত্বের 'মুড' বজায় রাখতে চান। *কালসন্ধ্যার* মতো ভাবগত ও ভাষাগত বৈপরীত্য এখানে প্রয়োগ করলে সেই অন্ত নিহিত 'রিদম' বা সুর ব্যাহত হতো। সেক্ষেত্রে নাটকের ভাষা এর কবিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতো। তাছাড়া *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* এবং *কালসন্ধ্যার* তুলনায় *অনাম্নী অঙ্গনা* ছোট নাটক। ঐ নাটকগুলোর বিস্তৃতি অনুযায়ী বিশেষ দৃশ্যে কথ্যভাষার ব্যবহার মানানসই, কিন্তু 'অনাম্নী অঙ্গনা'র ছোট্ট পরিসরে অন্ত্যজ চরিত্রের মুখে প্রচুর পরিমাণে কথ্যভাষার প্রয়োগ ঘটালে নাটকটি প্রায় কথ্যভাষা - সর্বস্ব নাটকে পরিণত হতো- বিশেষত প্রধান চরিত্র অঙ্গনার সংলাপে যদি অন্ত্যজ ভাষা ব্যবহার করা হয়। তাই বুদ্ধদেব বসু এ নাটকে অঙ্গনা ও তার সাথীদের সংলাপে লোকজ ভাষার পরিমিত ব্যবহার করেন, যেন নাটকের মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন থাকে। তবে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে অভিজাত চরিত্রের সংলাপের সাথে অন্ত্যজ চরিত্রের সংলাপের পার্থক্য সৃষ্টি করেন একটি বিশেষ কৌশলে তিনি অন্ত্যে ক্রিয়াপদ বর্জন করেন, কখনো ক্রিয়াপদই বর্জন করেন এবং সংস্কৃত শব্দাধিক্য ঘটান; অপরদিকে অপ্রধান চরিত্রের সংলাপে ক্রিয়াপদের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখেন, বর্জন করেন সংস্কৃত শব্দ। যেমন : অঙ্গনার সখীদের সংলাপে-

প্রথম সখী

মনে পড়ে গেলো
শুকনো কাপড় ঘরে তোলা হয়নি –
সূর্য অপরাহ্নে নামলেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সখী

আমি যাই।

শুক – সারীকে পদ্মের ডাঁটা খাওয়াতে হবে।

তৃতীয় সখী

তোর বুঝি কাজ নেই অঙ্গনা?

অম্বিকা দেবীর কেশচর্চার সময় হয়নি?

এখানে প্রায় প্রত্যেক বাক্যের অন্ত্যে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত, সংস্কৃত শব্দ প্রায় নেই, দু'একটি কথ্য শব্দ রয়েছে। অপরদিকে সত্যবতীর একটি সংলাপ লক্ষ করা যাক –

সত্যবতী

ভেবো না আমি ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক,

কিন্তু এ মুহূর্তে আমি অক্ষম।

কেননা তোমার প্রতি আমার এই আজ্ঞা-

জেনো, শুধু আমার নয় – সব পূর্বপুরুষের ভাবীকালের স্বয়ং

বিধাতার।

আমি সেই বিশ্ববিধানে বাধ্য, তুমিও তা-ই।'   কিংবা,

সত্যবতী

যেমন ভীষ্মের নাভি আমার সঙ্গে যুক্ত ছিলো না কখনো,

তেমনি ব্যাসের ধমনী শান্তনুর সম্পর্ক রহিত।

আমার পুত্র ব্যাসদেব।

আমি তাকে জন্ম দিয়েছিলাম যমুনার দ্বীপে

আমি যখন ধীবরকন্যা - অনূঢ়া।

সংলাপের ওজস্বিতা বৃদ্ধি করতে বুদ্ধদেব বসু এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তবে, সংলাপের যেসব অংশে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, অপরাগতা কিংবা অন্তরাবেগ প্রকাশের প্রয়োজন হয়, ভাষাকে নমনীয় ও কঠোর করতে অথবা নাটকীয়তা বৃদ্ধি করতে সেখানে তিনি অনায়াসে বাক্যের শেষে ব্যবহার করেন ক্রিয়াপদ। যেমন, সত্যবতীর সংলাপ – 'রাজকন্যা, রাজবধূ,/এখনো তুমি রাজমাতা - হ'তে পারোনি। সেই গৌরবের জন্য, গুণবতী, এবার প্রস্তুত হও।' কিংবা অম্বিকার সংলাপ – 'মাতা সত্যবতী, আমাকে ক্ষমা করুন – আমি পারবো না।' *অনাম্নী অঙ্গনায়* বিশেষভাবে সত্যবতীর সংলাপে আভিজাত্য, গাম্ভীর্য ও গুরুভার প্রকাশে বুদ্ধদেব বসু সংস্কৃত শব্দ ও ক্রিয়াপদবর্জিত শব্দ ব্যবহার করেন। সত্যবতী প্রবীণা, ফলে কাল অনুযায়ী তার ভাষায় প্রাচীনত্ব সৃষ্টির জন্যেও বুদ্ধদেব বসু এই ভাষাগত 'টেকনিক' ব্যবহার করেন। অম্বিকা পৌরাণিক চরিত্র হয়েও এ নাটকে যেহেতু আধুনিক, স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, ফলে তার ভাষার সাথে সত্যবতীর ভাষার খানিকটা দুরত্ব ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ বৈশিষ্ট্যে অম্বিকার ভাষা অঙ্গনার ভাষার নিকটতর হয়ে যায়। বিশেষত বিবর্তিত অঙ্গনার ভাষা কবিত্ব ও উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় অম্বিকার ভাষাকেও অতিক্রম করে যায়।

অনাম্নী অঙ্গনা নাটকে পৌরাণিক প্রতিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম অবলম্বন সত্যবতী ও সংলাপ। কারণ, সত্যবতী চরিত্রে পৌরাণিক ভাবাদর্শের অতিরিক্ত তেমন কোনো আধুনিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় না – পরাশর মুনির সাথে তার মিলনের বর্ণনা ব্যতিত। সত্যবতীর সংলাপে কবিত্ব অপেক্ষা উপযোগিতা বেশি। তার সংলাপ সংস্কৃত শব্দবহুল, অলঙ্কার সমৃদ্ধ। যেমন বিচিত্রবীর্যের সাথে ব্যাসদেবের তুলনার ক্ষেত্রে তার সংলাপ –

Dhaka University Institutional Repository

সত্যবতী

পুত্রী, তুমি জেনো,
এক সহস্র রূপবান বিচিত্রবীর্য
একজন মাত্র ব্যাসের তুলনায়
ঠিক তেমনি - যেমন সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ।

কিংবা ঋষিদের সম্পর্কে সত্যবতীর সংলাপ –

সত্যবতী

তিমিঙ্গিল যেমন সরোবরে আশ্রয় নিতে পারে না,
তেমনি তাদের পক্ষে অসম্ভব
স্নেহের শাসন, পারিবারিক বন্ধন, গার্হস্থ্য।

অথবা

সত্যবতী

চন্দনের পঙ্ক যেমন নির্মল
তেমনি ঋষির স্পর্শ কলঙ্কহীন, পবিত্র।

অনাম্নী অঙ্গনা নাটকে সত্যবতীর সংলাপ একবারই কবিত্বের ব্যঞ্জনায় আবেগাশ্রয়ী হয়ে ওঠে – পরাশর মুনির সাথে তার মিলনের স্মৃতিচারণের সময় অম্বিকাকে ব্যাসদেব সম্পর্কে আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে সত্যবতী যখন আবেগবশত তার জীবনের প্রথম মিলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, তখন স্বভাবতই সত্যবতীর সংলাপ হয়ে ওঠে কবিত্বপূর্ণ। এখানে তার ভাষা নমনীয়, সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য আঁটোসাঁটো নয় আর, আবেগের মুক্তিতে বাক্যের ক্রিয়াপদও তার স্বাভাবিক রূপে স্বস্থানে দেখা দেয় –

সত্যবতী

সেদিন ছিলো আজকের মতোই ফাল্গুন মাস –
কিন্তু সেই ফাল্গুনের তুলনা হয় না।
যে-কোনো দিনের মতোই একটি দিন হয়তো –
কিন্তু - যদিও দীর্ঘকাল ধ'রে বেঁচে আছি –
আমাকে দেখা দেয়নি অন্য কোনো দিন, সেই দিনের মতো
আমার নৌকায় উঠলেন মুনি পরাশর,
আমি দাঁড় টানছি, তিনি মুখোমুখি ব'সে আছেন,
নৌকা দুলছে, জলে কাঁপছে সূর্যকিরণ,
কলস্বরে নদী ব'য়ে যায়।
আমি অনুভব করছি তাঁর দৃষ্টি আমার - অনাবৃত বাহুতে-
দাঁড়ের ছন্দে আন্দোলিত আমার বাহুতে-কটিতটে-
তালে-তালে বিস্ফারিত ও সংকুচিত স্তনমণ্ডলে
নৌকো যখন মধ্যনদীতে
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,
শ্রীমতী, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। আমাকে বিমুখ কোরোনা
... ...
কেন আমার চক্ষু বুজে এলো,
সুখে না আশঙ্কায় – তাও জানি না।
আমার লজ্জা, আমার ভীরুতার উপর

Dhaka University Institutional Repository

মুনি নামিয়ে আনলেন গাঢ় যবনিকা,
কুজ্ঝটিকায় ঢেকে দিলেল দিগন্ত –
নদী লুপ্ত, আকাশ লুপ্ত – একটি তরণী শুধু ভাসমান
এমনি ক'রে মুনির সঙ্গে ধীবরকন্যার মিলন হলো।

লক্ষণীয় সত্যবতীর বর্ণনায় নেই জড়তা, গ্লানি, ক্লেদ – বরং জীবনের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিরোমপন্থনে তিনি যেন বর্তমান-বিস্মৃত । অম্বিকা যথার্থই বলে, সত্যবতীর বর্ণনায় এ কাহিনী যেন 'গুণীকণ্ঠে ধ্রুবপদ'। পরের দৃশ্যেই অঙ্গনার উদ্দেশ্যে অম্বিকা একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে, কিন্তু তা কবিত্বহীন বর্ণনামাত্র। অভিজ্ঞতা ও আবেগের বাঙ্ময় এই প্রকাশেই বুদ্ধদেব বসুর সত্যবতী চরিত্রটি পুরানের সত্যবতী থেকে পৃথক হয়ে যায়।

অনাম্নী অঙ্গনায় অম্বিকার সংলাপ বিচিত্র মাত্রিক – কখনো দ্রোহী, কখনো অহংপ্রবণ, কখনো অনুনয়ে নমনীয়, কখনো উন্নাসিকতাযুক্ত, কখনো উপলব্ধিময়, প্রায়শই নানা ধরনের অলংকারের ব্যবহার লক্ষ করা যায় তাঁর সংলাপে। ব্যাসদেবের সাথে পুনর্বার মিলনের আদেশে তাঁর সংলাপ হয়ে ওঠে তীক্ষ্ম, প্রতিবাদী – 'আমি রাজকন্যা, রাজবধূ - বিদগ্ধা!/ রুচিরহিতা গাভীর মতো/ যে- কোনো বৃষের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি না।' সত্যবতীর সৌন্দর্যকে উদ্দেশ্যে করে উচ্চারিত তার সংলাপটি উৎপ্রেক্ষাযুক্ত – 'তবু/আপনি যেন শুক্লা দ্বাদশীর জোৎস্না/ব্যাসদেবের অমাবস্যার তুলনায়'। অম্বিকার চক্ষ, রুচি ও রতির পক্ষে উৎপীড়ক ব্যাসদেবের প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় তার ভাষায় ব্যবহৃত হয় নানা অলংকার যেমন 'সেই রুক্ষ জটাজুট – দুর্গন্ধ-রক্তিম ঘূর্ণিত লোচন,/দগ্ধ কাষ্ঠের মতো গাত্রবর্ণ, যাতে রাত্রির স্বাভাবিক অন্ধকার/হয়ে ওঠে অভেদ্য, যেন রুদ্ধ করে দেয় নিশ্বাস' আবার অঙ্গনাকে তার প্রস্তাবে সম্মত করার জন্য অম্বিকা ব্যসদেবের এই ভারিত্ব ও কঠিনত্বকে তুলনা করে অন্তঃশীল নির্ঝরিণীর পার্বত্য শিলাখণ্ডের সাথে –

অম্বিকা

আর এই মাননীর মহাত্মা
যেন শিলাখণ্ডের মতো কঠিন - গম্ভীর - নিষ্কম্প্র,
বিরাট কোনো শিলাখণ্ড – কালো –
যার মধ্যে থেকে পার্বত্য নির্ঝরিণী
নিঃসৃত হয় খরস্রোতে অকস্মাৎ।

এই স্বাধ্যায়বান, জ্ঞানী মহাত্মাকে অম্বিকা তুলনা করে হিমালয়ের সাথে 'পর্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, তেমনি তিনি জ্ঞানীবংশে শ্রেষ্ঠ।' ঋষি-সংসর্গ যে নিদোর্ষ, কলঙ্কচিহ্নহীন – অঙ্গনাকে সে বিষয়ে আশ্বস্ত করতে অম্বিকা তার সংলাপে ব্যবহার করে – উপমা ও চিত্রকল্প –

অম্বিকা

কোন ঋষি যাকে স্পর্শ করেন, অঙ্গনা,
সেই নারী থাকে নির্দোষ নির্মল, কলঙ্করহিত,
হোক কুমারী, সধবা, বা ভর্তৃহীনা।
সেই সংযোগ
জলচিহ্নের মতো বিলীন হ'য়ে যায় মুহূর্তে
সেই নারী ফিরে পায় তার পূর্বাবস্থা
যেমন সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক হ'য়ে যায় রৌদ্রে।

অনন্যোস্পায় অম্বিকা অঙ্গনাকে উদ্বুদ্ধ করতে শূদ্রজন্ম সম্পর্কেও স্তুতিপরায়ন হয়ে ওঠে –

অম্বিকা

Dhaka University Institutional Repository

আর হয়তো এই ধারণাও ভুল
যে শূদ্রজন্ম অধম। মহৎকর্মে পাত্রভেদ নেই,
যে-কোনো ইন্ধনে অগ্নিশিখা সমান উজ্জ্বল।

কিন্তু, তার স্বভাবগত অহমবোধকে যে বেশিক্ষণ অবদমিত রাখতে পারে না, ফলে, পরক্ষণেই তার সংলাপে প্রকাশ পায় অহঙ্কার আর উন্নাসিকতা - অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা, কখনো কখনো ঈর্ষা আর ভর্ৎসনাও –

অম্বিকা

(তার চোখে রোষের বিস্ফোরণ, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ)
কী এত স্পর্ধা! এত কূটবুদ্ধি!
ভাবছিস তোর পুত্র হবে কুরুজঙ্গলের রাজা,
আর তুই-দাসী-রাজমাতা হবি সত্যবতীর মতো!
মূর্খ! জানিস না,
মাতা যার শূদ্রাণী, আর পিতা যার বর্ণসংকর –
সেই পুত্র যত না পূর্ণাঙ্গ হোক,
অন্ধের চেয়েও, ক্লীবের চেয়েও
শতগুণে রাজা হবার অযোগ্য!

অম্বিকার সংলাপই পরিস্ফুট করে তোলে তার চরিত্রের নানামাত্রিকতাকে – তার দ্রোহ, অহম, অসহায়ত্ব, চাতুরী ও কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্যকে। তবে, *অনাম্নী অঙ্গনায়* অম্বিকা যেহেতু স্পষ্টবাদী, উদ্দেশ্যপরায়ণ এবং আধুনিক, ফলে তার সংলাপ সাধারণ – তাতে কবিত্ব বা গূঢ়ত্ব নেই, আছে আবেগের সরল প্রতিফলন। কিন্তু, এ নাটকে অঙ্গনার, বিশেষ করে রূপান্তরিত অঙ্গনার সংলাপ অভূতপূর্ব, বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনায় বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। কারণ, অঙ্গনার সংলাপই এ নাটকে বুদ্ধদেব বসুর দার্শনিক উপলব্ধির শব্দ-ভাষ্য। অঙ্গনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষা ও সংলাপ ক্রমশ হয়ে ওঠে জটিল, চিত্রকল্পাত্মক ও প্রতীকী। রূপান্তরের কিছুক্ষণ পূর্বেও অম্বিকার সাথে কথোপকথনকালে অঙ্গনার সংলাপ থাকে সরল ও সহজবোধ্য –

অঙ্গনা

আমি চিরকাল জেনেছি
সেই বিবাহ কলঙ্কিত, বধূ যেখানে পূর্বব্যবহৃতা।
আর আমার কাম্য
দাসীত্ব থেকে মুক্তি, আর মন্ত্রপূত বিবাহের বন্ধন।
আমি চাই আমার স্বামীকে আমার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিতে,
ভাগ্যে যদি স্বামীলাভ ঘটে কখনো।
ক্ষাত্রধর্ম ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র – এই নিয়মের
বশবর্তী।

কিন্তু যে মুহূর্তে অঙ্গনা শুনতে পায় দূরাগত কোনো সাংকেতিক আহবান, সেই মুর্হূত থেকেই তার ভাষা হয়ে ওঠে দুর্বোধ্য – তার চেতনার মতোই উদ্বায়ী – যেন কোনো সত্যের লক্ষ্যে ঊর্ধ্বগামী। অঙ্গনার সংলাপে চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তার এই রূপান্তরের উপলব্ধিই ব্যক্ত হয় –

অঙ্গনা

(যেন অম্বিকার কথা শুনতে না পেয়ে)
আমরা জীবন
যা এতদিন আমারই সীমায় বন্ধ ছিলো,

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎপাত্রের মধ্যে যেমন তণ্ডুল,
এখন তা আমাকে অতিক্রম ক'রে যেতে চাইছে,
রন্ধনকালীন অন্নকে ছেড়ে বাষ্প যেমন উর্ধ্বে উঠে যায়।

ব্যাসদেবের সাথে মিলনের পূর্ব মুহূর্তে গুঞ্জনস্বরে গীত উন্মনা অঙ্গনার গানটিও সরল থেকে ক্রমশ প্রতীকী হয়ে ওঠে –

অম্বিকা

(গুঞ্জনস্বরে গান)

কেন বধূবেশে কেন চন্দনমাল্য,
দাসীর অঙ্গে রাজ্ঞীর আভরণ,
গভীর নিশার গহ্বরে অবশেষে
যদি হ'তে হয় জন্তু।

রাজ্ঞী, দাসীর বিভেদ সেখানে লুপ্ত
শুধু আছে দেহ, শোণিতের উষ্ণতা;
চরাচরহীন তরণী বা শয্যায়
এক মুহূর্তে আত্মবিসর্জন।

কে আসে কঠিন, আঁধার আগন্তুক,
এক মুহূর্ত – না কি তা-ই চিরকাল?
না কি সেই হত জন্তুই নবজন্মে
হবে বিশুদ্ধ নারী?

গানটির প্রথম স্তবকে ব্যাসদেবের শয্যায় প্রেরিত অঙ্গনা নিজেকে কল্পনা করে জন্তুর মতো, কিন্তু তৃতীয় স্তবকে 'আঁধার আগন্তুকে'র আগমনে সেই হতজন্তুর নবজন্ম সূচিত হয় বিশুদ্ধ নারীরূপে। এখানে 'আঁধার আগন্তুক' ব্যাসদেবের প্রতীক এবং জন্তু থেকে রূপান্তরিত বিশুদ্ধ নারী অঙ্গনার প্রতীক রূপে উপস্থাপিত।

অনাম্নী অঙ্গনায় ব্যাসদেবের সাথে অঙ্গনার কামের দৃশ্যটি সাংকেতিক। আলো-অন্ধকারের পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং – অঙ্গনার সোপান আরোহন ও অবতরণের মধ্য দিয়ে তাদের মিলন সংকেতায়িত। অঙ্গনার গানে প্রতীকের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়, তাই বাস্তবায়িত হয় এই সাংকেতিক মঞ্চ-দৃশ্যে – নাট্যকারের বর্ণনায় –

> গান শেষ ক'রে ধীরে উঠে দাঁড়ালো অঙ্গনা, ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগালো। তার প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যাস্তের আভার মতো মিলিয়ে গেলো মঞ্চের আলো। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার, তারপর ধীরে-ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো, কোমল রৌদ্রে, আবার দেখা গেলো অন্ধকার; তারপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো, কোমল রৌদ্রে আবার দেখা গেলো অঙ্গনাকে, সিঁড়ির শেষ ধাপে উপবিষ্ট।

ব্যাসদেবের সাথে মিলনের পর অঙ্গনার ভাষা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ। রাণী অম্বিকার কৌতূহলের উত্তরে অঙ্গনার প্রথম কামোপলব্ধির বর্ণনা উপমা ও চিত্রকল্পময় –

অন্ধকারে একবার তার দৃষ্টি আমাকে বিঁধলো – ভীষণ, উজ্জ্বল
অগ্নিকুণ্ডের মতো চুক্ষ। একবার তাঁর বাহু
অশ্বত্থের জটের মতো লম্বিত হ'লো আমার দিকে।
একবার তিনি অরণ্যের মতো
আমাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়লেন। নীড়ের মধ্যে পাখির মতো

Dhaka University Institutional Repository

আমার মুখ –
হারিয়ে গেল তাঁর শশ্রুদামের তৃণে দূর্বায় পল্লবে।
আর আমার দেহ যেন আমার সঙ্গে বিবাদ ভুলে হয়ে উ'ঠলো মধুর।

ব্যাসদেবের সাথে জৈবসংসর্গে অঙ্গনার কল্পনা ও অনুভব ব্যাপ্ত হয় প্রকৃতিতে - তার ভাষার অলঙ্কারে উঠে আসে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ –

অঙ্গনা

অন্ধকার – আমার দৃষ্টি ছিলো অস্পষ্ট।
যদি কিছু দেখে থাকি,
তা রেখাঙ্কিত এক মুখমণ্ডল, পরতে পরতে কুঞ্চিত,
যেন কর্ষিত বীজপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র,
বা প্রাচীন কোনো বৃক্ষের কাণ্ড, কালচিহ্নে সংকেতময়।
তবু
যেমন বৃদ্ধ বট থেকেও নির্গত হয়
তরুণ হরিৎ বাসন্তিক পল্লবগুচ্ছ,
তেমনি একটি হাসি - একটি মুহূর্ত –
খ'সে পড়লো সেই মুখ থেকে আমার অন্তঃকরণে,
আমার অন্তর থেকে নিঃসৃত হ'য়ে তাঁর সর্বাঙ্গে মিলিয়ে গেলো।
কোনো দূরত্ব আর রইলো না।

অঙ্গনার বর্ণনায় স্বতোৎসারিতভাবে চলে আসে তার পূর্বের প্রাকৃত জীবনের অনুষঙ্গ –

অঙ্গনা

ততক্ষণে আমাকে নিজের মধ্য থেকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে
ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি –
যেন নবান্নের ধান,
যা ঢেঁকির আঘাতে খোশা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়,
বৎসরের সঞ্চয় হবার জন্য।

ব্যাসদেবের সাথে মিলনের বর্ণনায় অঙ্গনার সংলাপে ব্যবহৃত হয় দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, জৈব সমস্ত ধরনের চিত্রকল্প। যেমন - অঙ্গনার সংলাপে ঘ্রাণকল্পের একটি দৃষ্টান্ত –

অঙ্গনা

দেবী, তার গন্ধে আমি বিবশ হয়েছিলাম –
এক মিশ্রিত গন্ধ –
যেন তৃণময় প্রান্তর থেকে উত্থিত,
মুঞ্জা, ইষিকা, বন্যপশুর, অরণ্যের,
কোনো দূর সমুদ্রের লবণাক্ত গন্ধ যেন,
সেই মাটির ঘ্রাণ, যা এই মাত্র হলকর্ষণে দীর্ণ হ'লো।
যত ফুল ছিলো আমার মালায়,
যত চন্দন আননে ও বক্ষে,
সেই বিশাল গন্ধে ডুবে গেলো সব – নদীর জলে লোষ্ট্রের মতো,
আর সব অলংকার

Dhaka University Institutional Repository

নিক্কণ ভুলে, আমাকে না-ব'লে আমারই অঙ্গ থেকে স্খলিত হ'লে
গাছের গা থেকে শুকনো ডালপালার মতো অজান্তে
আর, যেমন তীরে এসে যাত্রী
নৌকো ছেড়ে চ'লে যায় দূরে, তেমনি আমার দেহ
বেশবাস থেকে বিচ্যুত হ'য়ে রইলো প'ড়ে
যেন তারার আলোয় পরিত্যক্ত এক স্রোতস্বিনী,
যার উপর দিয়ে, সেতুর মতো, আনত হলেন সেই তিমিরবর্ণ পুরুষ।

ঘ্রাণকল্পের সাথে উপমা এবং তার সাথে একের পর এক চিত্রকল্পের প্রয়োগে অঙ্গনার সংলাপ হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনুভববেদ্য। তার ইন্দ্রিয়ঘন সংবেদনার সঙ্গী হয়ে ওঠে আমাদের মন। তার সংলাপের শ্রাব্যকল্পে আমাদের শ্রুতি হয় সক্রিয় –

অঙ্গনা

আমি জানিনা
সেকি বাইরে বাতাসে শব্দ, পল্লবের মর্মর,
না কোনো নিশাচর পাখি উড়ে যেতে-যেতে
একটি দীর্ঘ নির্ঘোষে বলে গিয়েছিলো –
রাজবধূর ছদ্মবেশে, রাজপত্নীর শয্যায় - নারী তুমি কে?

প্রকৃতই অঙ্গনার ভাষা অতিক্রম করে তার উক্তির সীমা-উত্তীর্ণ হয় শব্দ ও শব্দাতীত ব্যঞ্জনায়। অঙ্গনার বর্ণনায় শ্রুতিগ্রাহ্যতা সৃষ্টি হয় উপমার প্রয়োগেও –

অঙ্গনা

হঠাৎ মনে হ'লো, তিনি
আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।
দূর থেকে শোনা সমুদ্রের মতো তাঁর স্বর
নববর্ষার প্রথম মেঘমন্দ্রের মতো।
তাঁর বার্তা আমি যে সব বুঝেছিলাম তা নয়,
কিন্তু, এটুকু স্পষ্ট মনে পড়েঃ
তোমার পুত্র হবে ধীমান, প্রাজ্ঞ,
নম্র, মৃদুভাষী, ধীর।
তুমি তার নাম দিয়ো বিদুর, কেননা বিদ্যা হবে তার স্বভাবসিদ্ধ।

শ্রুতিকল্প ছাড়াও অঙ্গনার সংলাপে লক্ষ করা যায় আস্বাদকল্প। যেমন :

অঙ্গনা

একি আশ্চর্য নয়,
যে আমি জেনেছি নারীদেহের রহস্য, নিয়েছি স্বাদ
আমার নারীত্বের,
যেন পান করেছি নিজেরই নির্যাস, কোনো সঞ্জীবনী সুরার মতো,
আপনার আজ্ঞায়, এক রাত্রে, চিরকালের জন্য?

অনাম্নী অঙ্গনা নাটকের অসাধারণত্ব এই যে, এখানে কবিত্ব দিয়েই নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন বুদ্ধদেব বসু। তাই, অঙ্গনার রূপান্তরের নিয়ামক যে 'কাম' – তা এখানে শব্দ-বর্ণ-গন্ধ-দৃশ্য ও চিত্রময়। ব্যাসদেবের প্রসঙ্গে অঙ্গনার

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপে কালো রঙের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাসদেবের কৃষ্ণত্ব একটি প্রগাঢ় ও পরিব্যাপ্ত সত্তারূপে অনুভূত হয় অঙ্গনার নিকট –

অঙ্গনা

ভয় নয়, অন্য এক অনুভূতি।
বিশাল - কালো - প্রগাঢ় এক সত্তা,
এত বড়ো – পালঙ্ক ছাপিয়ে উপচে পড়ে,
কক্ষ ছাড়িয়ে দূর চ'লে যায়,
বিস্তীর্ণ রাত্রির মধ্যেও ধরানো যায় না।
কোনো পুরুষ, না কি শুধু ব্যাপ্তি - কে জানে।

ড. কণিকা সাহার বিশ্লেষণে *অনাম্নী অঙ্গনায়* এই কালোরঙের সাংকেতিক ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – 'রবীন্দ্রনাথের *রাজা* নাটকের রাজার মতো ব্যাসদেবও এখানে এক সাঙ্কেতিক সত্তায় পরিণত। উভয়েই কালো, বিশাল, কুৎসতি, প্রগাঢ়, নিষ্ঠুর অথচ কোমল। অঙ্গনা যেমন ব্যাসদেবের সংস্পর্শে এসে নারী জীবনের রহস্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করেছে, রাণী সুদর্শনাও তেমনি রাজাকে অনুভূতির গভীরতায় উপলব্ধি করে সার্থক হয়েছে।'[২৭] সাদৃশ্যটি চমৎকার। তবে, 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা কেবল রূপ থেকে অরূপের দর্শনে উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু *অনাম্নী অঙ্গনায়* অঙ্গনা বস্তুসীমায় অবস্থান করে পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের সঙ্কল্পে মহত্তর দর্শনে উপনীত হয়। 'রাজা' নাটকে রাজা 'অন্ধকার' কিংবা 'অরূপ' রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের প্রতীক। কিন্তু, অনাম্নী অঙ্গনায় তাই সব নয়; অন্ধকারের স্বরূপ উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ নয় অঙ্গনা, আসন্ন যুদ্ধে পৃথিবী যখন রক্তাক্ত হয়ে উঠবে, তখন তার পুত্র হবে, 'একমাত্র ধবলতার সংকেত' – নিজের গর্ভে যে লালন করে সেই বীজ, যার ভোক্তা হবে ভবিষ্যত পৃথিবী। অঙ্গনার সংলাপে চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় তার এই সিদ্ধান্তেরই প্রকাশ ঘটে –

অঙ্গনা

তাই দেবী,
আমার পক্ষে দাসীত্ব আজ বরণীয় গুণ্ঠন,
নামহীন অস্তিত্ব এক দুর্গধাম,
যার অন্তরালে আমার বীজময় রাত্রি –
বিনা বিক্ষেপে, বিনা অপব্যয়ে –
ফ'লে উঠতে পারে গুচ্ছ-গুচ্ছ সোনালি ধানের মতো,
আমারই মধ্যে উৎপন্ন, কিন্তু ভোক্তা যার ভবিষ্যৎ।

অঙ্গনার শেষ গানটি প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণ। অঙ্গনার বির্তনের সাথে সাথে তার স্বপ্ন কল্পনাময় প্রথম গানটির সাথে এই শেষ গানের স্বভাবগত দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় –

অঙ্গনা

যে ছিলো তরুণ তরু।
রাতের অন্ধকারে
নিষ্ঠুর বেগে মহাবিহঙ্গ নামলো।
অঙ্গে অঙ্গে হানলো কঠিন চঞ্চু,
তীক্ষ্ণ নখরে দেহ ক'রে দিলো দীর্ণ।
লুণ্ঠিত হ'লো পুষ্পকোরক,
সব পল্লব ছিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

কোন দূরে উ'ড়ে অদৃশ্য হ'লে তুমি,
মহাবিহঙ্গ সুন্দর!
উন্মূল তরু মূর্ছায় অবসন্ন।
কিন্তু তোমারই চলার বাতাসে
ক্ষুদ্র নতুন পাখি
মৃত্তিকা ছেড়ে ধীরে উঠে গেলো ঊর্ধ্বে,
ঊষার আলোয় – নীলিমায় – নিঃশব্দে।

এ গানে 'তরুণ তরু' অঙ্গনার প্রতীক। 'মহাবিহঙ্গ'রূপী ব্যাসদেবের কামের কঠিন অভিঘাতে, তার চঞ্চু ও তার তীক্ষ্ণ নখরে বিদীর্ণ ও উন্মূল হয় তরুণ-তরু ও তার স্বপ্ন-রূপ 'পুষ্পকোরক'। মহাবিহঙ্গ অদৃশ্য হয়, কিন্তু তার চলার বাতাসে 'ক্ষুদ্র নতুন পাখি, যা অঙ্গনারই চেতনার প্রতিরূপ, ঊষার আলোয় নিলীমার উদ্দেশে হয় ঊর্ধ্বগামী। সমালোচক যথার্থই বলেন, *অনাম্নী অঙ্গনার* বড়ো সম্পদ তার গান'।[২৮]

সাংকেতিক আবেদনে, প্রতীকী তাৎপর্যে, বিচিত্র ধরনের চিত্রকল্পের ব্যবহারে, গদ্যছন্দে শব্দ-ভাষার স্বতস্ফূর্ততায়, কবিত্বের মাধ্যমে নাটকীয়তা সৃজনের সার্থকতায় *অনাম্নী অঙ্গনার* সংলাপ শৈল্পিক সূক্ষ্মতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

প্রথম পার্থ

প্রথম পার্থ নাটকে গদ্যছন্দে সংলাপ রচনায় বুদ্ধদেব বসু আরো সাবলীল এবং এ সংলাপে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে অধিকতর সক্ষম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বদিন, এক অঘ্রান অপরাহ্ন থেকে নাটক আরম্ভ হয়, বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপে। প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে দুপুর-অতিক্রান্ত, সদ্য অপরাহ্নের সেই চিত্র বর্ণিত –

আজ সেই দিন, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম এতকাল:
অঘ্রান মাস, তিথি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী।
দুপুর পেরিয়ে গেলো, সূর্য নামে পশ্চিমে।
ধীরে, সূর্যদেব, ধীরে,
আজ ত্বরা করবেন না,
আজ বিলম্বিত হোক আপনার সান্ধ্যস্নান।
সময় দিন, আমাদের সময় দিন,
আমরা উৎকণ্ঠিত, আমাদের সময় দিন:
কেননা আজ সূর্যাস্তের আগে এক বিশাল
সিদ্ধান্ত নেবেন নেতারা: কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে,
নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা,
মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল-কুকুর হস্তিনাপুরে–
সেই সিদ্ধান্ত।

এ নাটকে সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সময়বৃদ্ধির সাথে অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘতর হতে হতে নাটকীয়তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুন্তীর সাথে কর্ণের কথোপকথনের পর ক্রমাগ্রসর সময়ের সাথে সাথে সংকটের মীমাংসাহীনতায় শঙ্কা প্রকাশ পায় প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে –

প্রথমবৃদ্ধ

ছায়া দীর্ঘতর,
রৌদ্রে লাগে অপরাহ্নের হলুদ

Dhaka University Institutional Repository

এখনো মীমাংসা হ'লো না।

নাটকে একাধিকবার অগ্রহায়ন মাসের উল্লেখও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মঙ্গলমাস অগ্রহায়ন – সমস্ত প্রকৃতি যখন ফলন্ত, পরিপূর্ণরূপে শোভিত, তখনই সম্ভাব্য যুদ্ধের আশঙ্কায় সবার মনে তৈরি হয় এক শীতল আততি। প্রকৃতির বৈপরিত্যে যুদ্ধের অনতিকালপূর্বের এই সময়টি উত্তেজনাঘন অথচ করুণ। কৃষ্ণের সংলাপে –

কৃষ্ণ

চেয়ে দেখো, কর্ণ, দৃষ্টিপাত করো চারদিকে
মঙ্গলমাস অগ্রহায়ন ,
শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, ঋতু প্রসন্ন
সুখস্পর্শ বায়ু, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা,
সোনালি ধানে সোনালি রোদ বিস্রান্ত।
বৃক্ষ ফলবান, জল স্বাদু, পশুরা পরিপুষ্ট,
ঘরে-ঘরে নবান্নভোজের আয়োজন।
কিন্তু অগ্নিবাণে দগ্ধ হবে শস্য, ভস্মীভূত হবে গ্রাম,
সর্পবাণে বিষাক্ত হবে বায়ু,
বরুণাস্ত্রে আবিল হবে জল,
ব্রহ্মাস্ত্রে গর্ভের শিশু নিহত হবে।
কর্ণ, এই কি তোমার অভিপ্রেত?

ফলে *প্রথম পার্থের* প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপেই বিস্তৃত হয় এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়, কিন্তু লক্ষ্য এক, যুদ্ধ। দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপে রাষ্ট্র, 'সৌভ্রাত্র', 'মৈত্রী', 'বৈরিতা', 'দৌত্য', 'সেনাসংগ্রহ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার এবং তার সাথে সঙ্গত অলংকার প্রয়োগে তৈরি হয় যুদ্ধের আবহ –

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

তাদের আশ্রয়ে সুখে আছি আমরা -
অন্তত ছিলাম:
যতদিন না ধার্তরাষ্ট্র আর পাণ্ডবের মধ্যে বিরোধ
একপাল ইঁদুরের মতো ছিন্ন করেছিলো সেই রজ্জু,
সৌভ্রাত্র যার নাম, যা বেধে রাখে রাষ্ট্রকে।

... ...

কেমন করে নষ্ট হ'লো মৈত্রী
কেমন করে পুষ্ট হ'লো বৈরিতা
এতদূর পর্যন্ত – যে সম্প্রতি
উভয়পক্ষ সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত, আর কৃষ্ণ এসেছেন
দ্বারকার সিন্ধুতট ছেড়ে শান্তির দৌত্য নিয়ে।'

কিংবা, কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের সংলাপে –

কৃষ্ণ

আর তারপর –
হয়তো মদ্রদেশে হাহাকার, মৎসদেশে দুর্ভিক্ষ,
সুদূর কম্বোজপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব,

Dhaka University Institutional Repository

চেদিরাজ্য যুবকহীন, সিন্ধুরাজ্যে সধবা নেই
ভারতরাষ্ট্র বিধ্বস্ত।

প্রথম পার্থের সবগুলো চরিত্র এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তারা যেন বেশ ত্রস্ত, ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত ও উদগ্রীব। ফলে, তাদের সংলাপে কবিত্বের অবসর নেই, মীমাংসাই অধিক প্রয়োজন। এ কারণেই হয়তো *প্রথম পার্থ* নাটকের সংলাপে কবিত্বের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা নাটকীয় সংঘাতের প্রতিফলন অধিকমাত্রায় লক্ষণীয়, অলঙ্করণ বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেয়ে শব্দের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনই অধিকগুরুত্বপূর্ণ। তবে ভাষার যে অলঙ্করণে বুদ্ধদেব বসু সম্পূর্ণ নাটকিকে অনুরণিত করে তোলেন, তাহলো অনুপ্রাসের অন্তর্লীন ধ্বনি-মাধুর্য। তবে, এই অনুপ্রাস ধ্বনি ঝংকার তোলে না, শব্দ থেকে শব্দান্তরে, বাক্য থেকে বাক্যান্তরে সমস্ত নাটক জুড়ে সৃষ্টি করে ধ্বনির সূক্ষ্ম অন্তর্বয়ন। এর অন্তর্নিহিত গতিময়তা শ্রুতিকে তৃপ্ত করে নিয়ে চলে সামনের দিকে – জাঁকালো কোনো অলংকারে প্রলুব্ধ করে ব্যহত করে না গতিকে। এক অন্তঃশীল প্রবাহমানতায় নাটকে সৃষ্টি করে মসৃন গতিময়তা – যেমন পাহাড়ী নদী চলার পথে দু'একটি উপলখণ্ডকে অনায়াসে অতিক্রম করে যায় কিংবা কোনো কঠিন প্রতিবন্ধকতায় প্রতিহত হয়ে আরো বেশি বেগবান হয়ে উঠে, তেমনি এর ভাষা আর তা গদ্যছন্দে, কথ্যশব্দে আরো বেশি গতিশীল। অন্তর্নিহিত আনুপ্রাসিকতা লক্ষ করা যায় *প্রথম পার্থের* সংলাপের প্রায় সর্বত্র। যেমন, কর্ণের সংলাপে –

কর্ণ,
তাহলে শুনুন আমার ক্ষুদ্র একটি কাহিনী:
সেদিন রাজপুত্রদেবের অস্ত্রশিক্ষার প্রর্দশনীতে
উপস্থিত ছিলেন নানা দেশের আমাত্য; হস্তিনাপুরের
আবালবৃদ্ধবনিতা।
আমি ছিলাম অন্যতম প্রতিযোগী। কৃপাচার্য আমার
বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন,
আমার উত্তর শুনে হেসে উঠলেন অভিজাতবর্গ।
আমি বেরিয়ে এলাম লক্ষ চোখের তলা দিয়ে,
বিনা পরীক্ষায় পরাস্ত, অবমানিত-
আমি কুন্তীর প্রথম সন্তান।
হয়তো ভীষ্ম তা ভুলে গেছেন, যিনি আমাদের পূজ্য
হয়তো দ্রোণ তা ভুলে গেছেন, যিনি কুরুপাণ্ডবের গুরু,
কিন্তু-আমি ভুলিনি।

'ন,' 'ক্ষ', 'শ,' 'প্র', 'প', 'জ', 'ল', 'ভ', 'ন' প্রভৃতি ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে কর্ণের অভিযোগ যেন আরো প্রবল ও মর্মন্তুদ হয়ে ওঠে। কবিমাত্রেই ধ্বনি-আর্বতনে আগ্রহী থাকেন, কিন্তু *প্রথম পার্থে* ধ্বনির এই মেলবন্ধন এত সহজ ও স্বাভাবিক – যে, শ্রুতির আবেশে সম্মোহিত হলেও তার অস্তিত্ব আলাদাভাবে টেরও পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সব নাটকেই ধ্বনি নিয়ে কমবেশি খেলা করেন কিন্তু, *প্রথম পার্থ* তাঁর সেই ধ্বনি-ক্রীড়ার সর্বোচ উৎকর্ষের স্বাক্ষর। এখানে বাক্যমাত্রেই ধ্বনি-স্পন্দিত। যেমন কৃষ্ণের সংলাপে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার মুগ্ধকর –

কৃষ্ণ
তুমি বুদ্ধিমান-
মন্ত্রণাসভায় যোগ দাও নি। কিছু নেই
মন্ত্রণার মতো ক্লান্তিকর। মত, মতান্তর বাদ, প্রতিবাদ,
ব্যর্থ বিচার, নিস্ফল বিশ্লেষণ
ক্ষাত্রধর্ম, ক্ষমাধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ -

Dhaka University Institutional Repository

এক বিরাট বন্ধ্য কণ্টকবন –

যুক্তবর্ণের পুঞ্জিত প্রয়োগ যেমন মন্ত্রণাসভার কণ্টকাকীর্ণতার ভাব প্রকাশে সহায়ক, তেমনি কৃষ্ণের সংলাপে গাম্ভীর্য সৃষ্টিতে সক্ষম। শুধু ধ্বনি নয়, প্রায়শই কথ্যরীতি এবং কথনভঙ্গিতে অন্তরাবেগকে পরিব্যপ্ত করতেই শব্দ প্রযুক্ত হয় বারংবার। যেমন কর্ণের সংলাপে অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনামের পুনঃপুনঃ ব্যবহারে তার অবচেতনের ভাষাকে করে তোলে মর্মসঞ্চারী।

কর্ণ

(উন্মনভাবে, স্বগতোক্তির ধরনে)

কবে তা মনে পড়ে না
কারমুখ থেকে মনে পড়ে না
কোনো কল্পনার কম্পন হয়তো, কোনো দূরশ্রুত প্রবাদ,
কোনো গহন স্বপ্নে অতর্কিতে যা ভেসে ওঠে,
জন্মান্তরের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট
আমি শুনেছিলাম, ভুলেছিলাম, ভেবেছিলাম,
ভুলে যেতে-যেতে ভুলতে পারিনি
মেনে নিতে-নিতে মানতে পারিনি
রাজকন্যার কুন্তী আমার জন্মদাত্রী,
আমার পিতা সূর্যদেব।

শুধু সর্বনাম নয়, ক্রিয়ার যৌগিকতা, অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার সহাবস্থান সৃষ্টিতেও আবেগ সঞ্চারিত হয় সংলাপটিতে। একইভাবে অব্যয়ের পুনরুক্তি ঘটিয়ে কিংবা বিভক্তি যুক্ত করেও সংলাপকে প্রাণস্পর্শী করে তোলেন বুদ্ধদেব বসু। যেমন, দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপ-

দ্বিতীয় বৃদ্ধ

হায়, ক্ষত্রনারীর ভাগ্য
চিরকাল
প্রেমে জন্ম দিয়ে
প্রেমে স্তন্য দিয়ে
প্রেমে যত্নে পরিচর্যায় উৎসর্গিত হয়ে
তারপর সেই পুত্রকেই স্বেচ্ছায় সগৌরবে
হত্যাকাণ্ডে অর্পণ, হিংসার যূপে বলিদান।

কিংবা, পাঞ্চলীর উদ্দেশ্যে কর্ণের রুদ্ধ আবেগের সেই রোম্যান্টিক উচ্চারণে –

কর্ণ

ভালো নয়, পাঞ্চালী,
ভালো নয় নতুন করে বেদনা জাগানো,
নতুন করে সেই জ্বালা,
সেই প্রতিকারহীন অবিচার।
দ্রুপদ কন্যা, ফিরে যাও।
তোমার রূপের রশ্মি আমার পক্ষে দুঃসহ,
তোমার ললিত কণ্ঠ আমার পক্ষে উৎপীড়ন।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সর্বনাম, অব্যয় এমনকি ক্রিয়াবাচক শব্দ কিংবা বিভক্তিযুক্ত শব্দের পুনরাবৃত্তি *প্রথম পার্থের* ভাষাও সংলাপকে যেমন আধুনিক ও ব্যবহারোপযোগী করে তোলে, তেমনি আবেগ ও কবিত্বসঞ্চারী বৈশিষ্ট্য দান করে। জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যের ব্যবহার এখানে সুপ্রচুর এবং প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা আবেগের প্রবাহমানতা যে কত শৈল্পিক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত এখানে অগুণিত। যেমন কুন্তী ও কর্ণের সংলাপে –

(ব্যগ্র স্বরে)

তুমি জানতে? তুমি আগেই জানতে? তাহলে দূরে
ছিলে কেন এতদিন?
যদি স্বপ্নে তোমাকে ধরা দিয়েছিলো সত্য, তাহলে
কেন স্বগৃহে ফিরে আসেনি?

কর্ণ

আমার স্বগৃহ? তা কোথায়
(ক্ষণকাল পারে ভিন্ন সুরে)
কিন্তু কে নয়,
কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে?

উপর্যুক্ত সংলাপ পরম্পরায় জিজ্ঞসাসূচক বাক্য একইসাথে ধারণ করে কুন্তীর আবেগ ও ব্যগ্রতা, কর্ণের উনন্ম আত্মকথন এবং তার দর্শনকে। সংলাপের ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক বাক্যের এই নানামাত্রিকতা বিশেষত দ্বান্দ্বিকতা ও নাটকীয়তা সৃষ্টিতে এর বিস্ময়কর ক্ষমতাকে আবিষ্কার করা যায় বুদ্ধদেব বসুর *প্রথম পার্থে*। যেমন, কুন্তীর প্রতি কর্ণের অভিযোগ –

কর্ণ

(চাপা গলায়)

আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে। কিংবা,

কর্ণ

(আগ্রহের সুরে)

তুমি লজ্জা পেলেনা, নতুন করে লজ্জা পেলেনা
আজ আমার সামনে এসে দাঁড়াতে, আমাকে পুত্র বলে ডাকতে?

কথ্যশব্দে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্যে কর্ণের সংলাপ দৈনন্দিন মুখের ভাষার সাবলীলতা অর্জন করে। প্রশ্নবোধক বাক্যের এই অপ্রমেয় ক্ষমতা লক্ষ করা যায় এ নাটকে দ্রৌপদীর সংলাপেও –

দ্রৌপদী

এখনো জ্বালা-এতদিন পরেও
দ্যূতসভায় তোমার প্রতিশোধ কি পূর্ণ হয়নি?

কর্ণ

(আগ্রহের সুরে)

তোমার মনে আছে? তোমার মনে আছে? দ্যূতসভায় আমি কি বলেছিলাম? কী করেছিলাম?

এ নাটকে কর্ণের নিস্পৃহা এবং তার অনমনীয়তাকে আঘাত করতে বারংবার ব্যবহৃত হয় প্রশ্নবোধক সংলাপ। দ্রৌপদী তার সংলাপে উপর্যুপরি জিজ্ঞাসার বাণ নিক্ষেপ করে কখনো ধিক্কারে কখনো ভালোবাসায় জাগ্রত করতে চায় কর্ণকে। যেমন-

দ্রৌপদী

তুমি কি তাহলে মৃত্যু পণ করেছো?

Dhaka University Institutional Repository

এই সুন্দর পৃথিবীতে, এই রৌদ্রালোকে
তুমি কি বাঁচতে চাও না কর্ণ?
কেউ নেই, যাকে তুমি ভালোবাসো? কিংবা

দ্রৌপদী

(কোমল স্বরে কটুভাবে)
তবু তোমার কাছে একটি জিজ্ঞাসা আমার,
ঐ যাকে অবিচার বললে তুমি,
তার দৃষ্টান্ত
শুধু কি আমার স্বয়ংবরসভা?
তুমি দুর্যোধনকে বলো তোমার সুহৃদ। কিন্তু তার কাছে
কী পেয়েছো তুমি? এক মুঠো রাজত্ব?
কিন্তু তোমার ঐ পদবি
তা কি নয় অন্তঃসারহীন অভিধামাত্র?
ক্ষমতা সব দুর্যোধনের, কর্তৃত্ব সব দুর্যোধনের
তুমি শুধু ব্যবহার্য তার- যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর।
বীর তুমিঃ এই কি তোমার যথাযোগ্য সম্মান?

লক্ষ্যণীয় যে, দ্রৌপদীর তার সংলাপে একবার জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ব্যবহার করে স্বরকে তীব্র, গতিশীল, প্রাত্যহিক করে তোলেন, আবার সরল ও ব্যঞ্জনাময় বাক্য ব্যবহার করে সংলাপকে শ্লথ ও কবিত্বমণ্ডিত করেন নাটকের গতি ও ভারসাম্যকে বজায় রাখার জন্য।

চরিত্রানুযায়ী সংলাপ-পার্থক্য *প্রথম পার্থে* তেমন প্রত্যক্ষ বা প্রকট নয়। কারণ, প্রত্যেকটি চরিত্রই চারিত্রধর্মে অভিজাত, এমনকি দুই অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ বৃদ্ধও। সার্বিকভাবেই *প্রথম পার্থে* সংস্কৃত শব্দের স্বচ্ছলতা বিদ্যমান, লোকজ শব্দ প্রায় দুর্লভ। কথ্যভাষাতেই এখানে আভিজাত্য সৃষ্টি হয়, কথ্যভাষাতেই তৈরি হয় দিনানুদৈনিকতা। কথ্যভাষাতেই নাটকীয়তা, কথ্য ভাষাতেই কবিত্ব সঞ্চারিত - তাতে অনুভব করা যায় *স্পিরিচুয়াল রিয়ালিটি*। তবে, *প্রথম পার্থের* অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক আবহে কুশলী ও কার্যকরী সংলাপ সৃষ্টি। কুন্তী- দৌপদী-কৃষ্ণের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে এবং সমস্ত প্রলোভনের মুখে কর্ণের আত্মসিদ্ধান্তে অটল থাকার প্রয়োজনে *প্রথম পার্থের* সংলাপ কখনো আক্রমণাত্মক কখনো প্রতি-আক্রমণাত্মক। এখানে প্রতিটি সংলাপ যেন প্রবল ভীষণ বাক্-যুদ্ধের একেকটি ব্রহ্মাস্ত্র বা শক্তিশেল যা প্রতিক্ষেত্রে দুটি চরিত্রের সংকটকে দ্বান্দ্বিক করে তোলে, নাটকীয় সংঘাতকে উত্তুঙ্গ করে তোলে। যেমন কৃষ্ণের সাথে কর্ণের সংলাপের দ্বৈরথ –

কৃষ্ণ

কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্য, নিখিলের দুঃখ মোচনের জন্য
তুমি কি আজ নম্য হতে পারো না?
পারো না তোমার স্বরক্ত শাখায় ফিরে যেতে,
ভুলতে পারো না তোমার আত্মাভিমান?

কর্ণ

আত্মভিমান ছাড়া আর কী আছে আমার?

কৃষ্ণ

অসংখ্যের দুঃখ বা সুখ তাও বিবেচ্য নয়?

Dhaka University Institutional Repository

কর্ণ

আমি প্রার্থনা করি সুখ, আয়ু, শান্তি – অসংখ্যের জন্য

কৃষ্ণ

কিন্তু ইচ্ছুক নও তার সম্পাদনায়?

কর্ণ

আমার যুদ্ধ আমার নিজস্ব – আমার ব্যক্তিগত

কৃষ্ণ

কার সঙ্গে? কিসের জন্য? কোন আকর্ষণে?

কর্ণ

আমি চাই অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ – আর কিছু নয়।

কৃষ্ণ

এখনো চাও? অর্জুনকে ভাই বলে জেনেও।

কর্ণ

সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা।

কৃষ্ণ-কর্ণ সংলাপের এ অংশ বাদী-বিবাদী রীতিতে নির্মিত। এখানে কৃষ্ণের সংলাপে অনুনয়, কর্ণের সংলাপে অস্বীকৃতি –

কৃষ্ণ

তোমার ছিন্ন শির মিলিয়ে যাবে রশ্মির মতো
উর্ধ্বাকাশে, সূর্যমণ্ডলে।

কর্ণ

(হঠাৎ কেপে উঠে)

তুমি-এই করবে?

কৃষ্ণ

আমার চোখে পলক পড়বে না।

কর্ণ

তুমি লজ্জা পাবে না
মিথ্যাচারে – প্রতারণায়?

কৃষ্ণ

আমি তোমাকে অগ্রিম জানিয়ে দিলাম –
এর নাম মিথ্যাচার?

কর্ণ

অর্জুন লজ্জা পাবে না
অন্যায় যুদ্ধে জয়ী হতে?

কৃষ্ণ

সব যুদ্ধই অন্যায়।
সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত সংলাপ-পরম্পরায় পূর্বোক্ত সংলাপ-পরম্পরার বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। এখানে কর্ণের সংলাপে দৌর্বল্য এবং কৃষ্ণের সংলাপে সপ্রতিভতা। এভাবে সংলাপের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসু একদিকে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন, অপরদিকে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করেন।

নাটকীয় সংঘাতময় এইসব সংলাপ ব্যতীত ও *প্রথম পার্থে* লক্ষ করা যায় কিছু আবেগঘন সংলাপ। যদিও *অনাম্নী অঙ্গনায়* যেমন অর্থালঙ্কারের আধিপত্য, *প্রথম পার্থে* তেমনটি দৃষ্ট হয় না। তবে এ ধ্বনি-প্রাধান্যের মধ্যেও মাঝে মাঝে নিবিড় অর্থদ্যোতক কোন অলঙ্কার চোখে পড়ে, যা নাটকীয়তার মধ্যে সঞ্চারিত করে আবেগ–ভারসাম্য বজায় রাখে নাটকে। যেমন কুন্তীর সংলাপে পুঞ্জ-উপমার ব্যবহার –

কুন্তী

আমি তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম
যেমন ঘটের মধ্যে হুতাসন,
যেমন মাটির ভাণ্ডে বৈদূর্যমনি,
যেমন গুহার আঁধারে মহাব্যঘ্র,
আমিই তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম
যাতে সে প্রকাশিত হতে পারে
যথাকালে যথাস্থানে,
দুর্জনের বিনাশের জন্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য –
এই হস্তিনাপুরে, যার প্রান্ত ছুঁয়ে জাহ্নবী ব'য়ে যায়।

কিংবা কুন্তীর আহ্বানে সূর্যদেবের আগমন ও তাদের মিলনের চিত্র, রূপ ও গন্ধময় বর্ণনাটিও অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ –

কুন্তী

আমি জপ করলাম সেই মন্ত্র – সূর্যদেবের উদ্দেশে।
রাত কেটে গেলো অস্থির,
আধো ঘুমে, আধো জাগরণে যেন মোহমুগ্ধ।
কখনো ঘরের মধ্যে ঝড় ব'য়ে যায়,
কখনো চমক দেয় বিদ্যুৎ, বিরাট শব্দে বজ্র ডেকে ওঠে
কখনো ভেসে আসে তীক্ষ্ণ কোনো সুগন্ধ
কখনো শুনি মর্মভেদী রাগিনী।
আর তারপর যখন দিনের উন্মেষে ভরে উঠছে আকাশ
তখন আদিত্য, পুষণ, দিনমণি,
তরুণ সম্রাটের মতো সূর্যদেব
প্রেরণ করলেন আমার অন্তঃস্থলে তাঁর দৃষ্টি-একটি
কোমলতর রশ্মিরেখা-
অন্তত আমার, তাই মনে হ'লো। নামলো গভীর চিন্তা আমার
চেতনায়।
জেগে উঠে বুঝলাম, আমি অন্তঃসত্ত্বা।

এখানে কুন্তীর চেতন-অবচেতনের অনুভব – তার মনোজগতের ইমপ্রেশন প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্য দিয়ে শব্দ-ভাষায় প্রকাশিত। সূর্যের অসহনীয় তেজঃপুঞ্জের সাথে কুন্তীর মিলনের প্রতিবেশ সৃষ্টি হয় ঘরের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ঝটিকার প্রবাহ, বজ্রের নির্ঘোষ, বিদ্যুতের চমক, তার সাথে কোনো মর্মভেদী রাগিনীর আলাপন ও তীব্র কোনো সৌগন্ধের সমন্বয়ে – সবকিছু মিলে শব্দ, দৃশ্য, শ্রুতি ও ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় ব্যক্ত হয় কুন্তীর স্মৃতি- অনুভবের শব্দমালা। আর এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধতার পর আদিত্যের সাথে তার মিলনের চিত্র্যকল্পটি অসাধারণ। রশ্মি সহযোগে কুন্তীর গর্ভধারণের এই চিত্রটি গ্রিকপুরাণের দেবতা জিউসের স্বর্ণবৃষ্টিরূপে মর্ত্য-নারীর গর্ভ সঞ্চারের কাহিনীর প্রভাব বলে উল্লেখ করেন চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত – 'সূর্যের সহযোগে নারীর সন্তানবতী হবার একাধিক কাহিনী সমগ্র বিশ্বের পুরানকথা মন্থন করে সঙ্কলন করেছিলেন স্যার জেমস ফ্রেজার তাঁর *দ্য গোলডেন বাও-এ স্টাডি ইন ম্যাজিক রিলিজ্যান* (১৯২৩-১৯৩৭) গ্রন্থে। গ্রিক পুরাণে আছে দেবরাজ জিউস স্বর্ণধারার রূপে রুদ্ধকক্ষে প্রবেশ করে রাজকন্যা ড্যানীর গর্ভসঞ্চার করেছিলেন। ফ্রেজার এই স্বর্ণপ্রবাহকে সোনালি সূর্যকিরণরূপে ব্যাখা করেছেন। সাইবেরিয়ার কিরঘিজদের মধ্যে প্রচলিত এক লোকপুরাণের গল্পও তিনি উদ্ধার করেছেন, যেখানে বর্ণনা রয়েছে কিভাবে সূর্যদেবতার দৃষ্টিপাতেই সন্তানসম্ভাবিতা হন এক রাজদুহিতা। বুদ্ধদেব সম্ভবত এই দু'টি কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন: কুন্তীর শয়নকক্ষে সূর্যরশ্মির অনুপ্রবেশ এবং মার্তণ্ডদেবতার দৃষ্টিক্ষেপের ফলে তার অন্তর্বত্নী হওয়ার যে বর্ণনা এ নাটকে আছে, তার সঙ্গে ফ্রেজারের উল্লিখিত কাহিনী দু'টির ভাবরূপের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।'[২৯]

অনুঢ়া কুন্তীর প্রথম গর্ভধারণের কবিত্বপূর্ণ সংলাপ ছাড়াও *প্রথম পার্থে* বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে তাদের আবেগময় মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির আলঙ্কারিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। যেমন বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদীর লেলিহান সৌন্দর্যের বর্ণনায় কর্ণের সুপ্ত রোম্যান্টিক চেতনার শব্দভাষ্য –

কর্ণ

আমারও স্মৃতি অস্পষ্ট। শুধু মনে পড়ে,
হঠাৎ তোমাকে সভাস্থলে দেখতে গেলাম -
চোখে তোমার অশ্রুর বন্যা, চোখে তোমার রোষাগ্নি,
বিস্রস্ত কেশ, বিশৃঙ্খল বসন,
লজ্জায় তুমি উজ্জ্বলতর, অপমানে দেদীপ্যমান,
লেলিহান বহ্নিশিখার মতো সুন্দর,
ঝাঞ্ঝা হত তরণীর মতো অশান্ত,
এক আশ্চর্য, অরুন্তুদ উম্মোচন,
এক অবিশ্বাস্য চিত্তমন্থন আবির্ভাব।

মৃত্যুর মূল্যে মহত্ত্ব অর্জনের কঠিন সিদ্ধান্তে স্থিতধী কর্ণের মহাকাল সম্পর্কিত দার্শনিক উপলব্ধি প্রতীকী চিত্রকল্পাত্মক –

কর্ণ

জানি, আমিও জানি
সব এক অলঙ্ঘ্য সূত্রে গাঁথা হ'য়ে আছে।
আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট,
যার ডালে-ডালে পক্ব হয়ে ফ'লে ওঠে
অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা,
অসংখ্য কার্যকারণের একটিমাত্র উত্তর।
সেই মহাবৃক্ষের কোনো - একটি শাখায় এবার দুলবে
রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু।

বহমান জীবনের অসংখ্য ঘটনা ও কার্যকারণের মধ্যে মাত্র দু'একটি অক্ষয় হয় প্রাচীন মহাবৃক্ষরূপী মহাকালের শাখায় ঝুলে থাকা দুর্লভ ফলের মতো। কর্ণের মৃত্যুও তেমনি মহান কিংবদন্তী হয়ে বেঁচে রইবে কালের ইতিহাসে –

Dhaka University Institutional Repository

মহাবৃক্ষের রক্তিম একটি ফলের মতো। *প্রথম পার্থ* নাটকে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি অলংকারের মধ্যে কর্ণের সংলাপের এই সংহত, গূঢ়, প্রতীকী চিত্রকল্পটি যেন বৈদূর্যমণি রত্ন।

প্রথম পার্থ নাটকে সংলাপের ওজস্বিতা বৃদ্ধিতে এবং মাঝে মাঝে দ্যুতি ছড়াতে রূপকের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যেমন প্রথম বৃদ্ধের প্রতি কুন্তীর সংলাপে --

কুন্তী

(ঈষৎ তীব্র স্বরে)

আপনি ব্রাহ্মণোচিত বাক্য বলেছেন, কিন্তু পারবেন কি
দুর্যোধনের ঈর্ষানল নিবিয়ে দিতে
যোগবলে বা মন্ত্রবলে?
দুর্মদ সে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দেবে না।
তবে কি শান্তিরক্ষার জন্য পঞ্চপাণ্ডবকে
ভিক্ষান্ন খেয়ে বাঁচতে হবে চিরকাল?

উদ্ধৃত সংলাপে 'ঈর্ষানল', 'যোগবল', 'মন্ত্রবল', 'ভিক্ষান্ন'- শব্দগুলি রূপক। এছাড়া কুন্তীর সংলাপ – 'কালস্রোত, 'কর্ণ আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়েছিলাম'- এ 'কালস্রোত' রূপকটি সংলাপে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে বৃদ্ধি দেয়, সৃষ্টি করে ব্যঞ্জনা। কর্ণ-উচ্চারিত সংলাপ – 'কৃষ্ণ/আমার গরলপাত্র মধুর হয়ে উঠলো আজ।' – এ '*বিরোধাভাস* অলংকারের সার্থক-যোজনা পরম গুণান্বিত।'[৩০] বিশেষণের ব্যবহার কখনো কখনো *প্রথম পার্থ* নাটকের সংলাপকে করে তোলে অন্তর্স্বভাবী। বিশেষত কর্ণের সংলাপে তার অপচয়িত জীবনের আক্ষেপ প্রকাশে বিশেষণের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যে কর্ণের সংলাপে –

কর্ণ

(ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে যেন আপন মনে)

নষ্ট আশা
ব্যর্থ পরিতাপ,
দুর্মর স্মৃতি
আমার অপহৃত নিষ্পাপ যৌবন –
ভাবিনি সেই তোমাকে আবার চোখে দেখবো।

কিংবা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কর্ণের সংলাপে –

কর্ণ

শত্রুতা? কে বলে শত্রুতা?
প্রেম, কৃষ্ণ, তীব্রতম প্রেম!
ঘনিষ্ঠতম ভ্রাতৃত্ব, নিবিড়তম মিলন।
ছিন্ন ত্বক
দীর্ণ মাংস
শোণিত স্রাব
স্বেদ, কম্পন, মূর্চ্ছা, যন্ত্রণা, আনন্দ –
হত্যার তুরীয়ানন্দে মিলন।
আমার বন্দী বাসনা মুক্ত,
আমার রুদ্ধ আবেগে তৃপ্ত,
আমার নিভৃত স্বপ্ন সফল –

Dhaka University Institutional Repository

আর তারপর
সমাপ্তি -শান্তি-নির্বাপণ
হয় অর্জুনের, নয় কর্ণের।

কথ্যভাষার সুষম প্রয়োগ, গদ্যছন্দের প্রবহমানতায়, ধ্বনির অন্তর্লীন আনুপ্রাসিকতায়, অলংকরণের পরিমিতিবোধে এবং নাটকীয়তা সৃষ্টির সক্ষমতায় *প্রথম পার্থের* সংলাপ সাবলীল, স্বচ্ছন্দচারী ও শিল্পিতা-সমৃদ্ধ।

সংক্রান্তি

বুদ্ধদেব বসুর শেষ মৌলিক কাব্যনাটক *সংক্রান্তির* সংলাপ *প্রথম পার্থের* চেয়েও আরো বেশি ঋজু, স্বচ্ছন্দ, গদ্যছন্দে দীর্ঘ পর্ববিন্যাসে অনেক বেশি গদ্যময়, নাটকীয়তা সৃষ্টিতে উপযোগী, অনাবশ্যক অলঙ্করণ ছাড়াই ভাষা কবিত্বপ্রাপ্ত।

সংক্রান্তি শুরু হয় ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপময় দীর্ঘ সংলাপে তার বিলাপটি অনেকটা স্বগত কথনের মতো এবং সংলাপটি কবিত্বপূর্ণ হওয়ায় *প্রথমপার্থের* মতো এখানেও ধ্বনি অনুরণন অনুভব করা যায় –

ধৃতরাষ্ট্র

দিন, বদান্য দিন, উষ্ণতার উৎস,
যাতে সর্বজীব জেগে ওঠে চঞ্চল,
পাখি নাড়ে ডানা, গান গায় পতঙ্গ,
আর মানুষেরা যে যার পাপে লিপ্ত হয় আবার –
দিন, আলো, স্বর্গের বিভা, জগৎ যাতে উদ্ভাসিত,
কিন্তু কেউ-কেউ কখনোই যা দেখতে পায় না:
তোমাকে নমস্কার জানাই
আমি
অন্ধ, বৃদ্ধ, অক্ষম, অসহায়
ধৃতরাষ্ট্র।

একই ভাবে 'শ' এর আনুপ্রাসিকতায় স্বাদু হয়ে ওঠে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে কারুণ্য –

ধৃতরাষ্ট্র

আর
যাকে গর্ভে ধরেছিলো অনিচ্ছায় এক নারী
এক শঙ্কাময় শয্যায় যার আরম্ভ,
সেই শূন্যসার আধার, শুধু সম্বোধনে রাজা
শুধু জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়, কোনো কর্ম করিনি কখনো
কিছুই করেনি কখনো- শুধু কথা শুনেছে, কথা বলেছে
আর মনে মনে
অনেক, অনেক চিন্তা করেও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি –
অন্ধ, ভীরু, অক্ষম, অপ্রতিষ্ঠ, ব্যর্থনামা ধৃতরাষ্ট্র –

সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রণত দৃষ্টিহীন ধৃতরাষ্ট্রের দীর্ঘ, নৈঃসঙ্গ্য, নিরুত্তাপ বার্ধক্য এবং ব্যর্থ, বৈচিত্র্যহীন মন্থর জীবনের উপলব্ধি প্রকাশে তার সংলাপে ধ্বনি পুনরাবৃত্তি ছাড়াও বিশেষণ ও বিশেষণের অতিশায়ন লক্ষণীয় –

Dhaka University Institutional Repository

ধৃতরাষ্ট্র

দীর্ঘ ছিলো এই রাত্রি, দীর্ঘতর আমার পক্ষে,
হিম, হিমতর এই শীতের রাত্রি ,
হিমতর শোনিত, ক্ষীণতর ধমনী,
কম্বল, কার্পাশ আর পশুরোমের আবরণ সত্ত্বেও।
অস্থির নিদ্রার পরে গাঢ়তর ক্লান্ত,
আমি শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছি তোমার কাছে
হে সূর্য, ধর্মের প্রতিভু, পৃথিবীর প্রতিপালক
তোমার অনন্ত দানসত্র থেকে একমুঠো তাপের জন্য প্রার্থী

এ সংলাপে 'দীর্ঘ', 'হিম', 'ক্ষীণ' ও 'গাঢ়' বিশেষণের সাথে হিমতর, ক্ষীণতর, গাঢ়তর শব্দগুলো যুক্ত হয়ে বিশেষণের অতিশায়ন ঘটায়, যা ধৃতরাষ্ট্রের অসহায়ত্বকে আর্তিময় করে তোলে ।

ধৃতরাষ্ট্রের এই দীর্ঘ আত্মকথনটি ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে না কারণ, এতে ধ্বনিসুষমা যেমন বিদ্যমান তেমনি উপমার ব্যবহারে ও ঘটনার ইঙ্গিতে তা অর্থবোধক –

ধৃতরাষ্ট্র

দ্যাখো : আমার শতপুত্র ছিলো অর্ধমাস আগেও
আজ একজন মাত্র অবশিষ্ট।
ছিলো অগন্য জ্ঞাতি, বন্ধু, সামন্ত,
অক্ষৌহিণী সেনানী –
আজ সিংহভুক্ত মহিষের মতো কঙ্কালসার।
আমি ছিলাম ভারতবংশীয় রাজা, রাজপিতা,
জঠরাগ্নিতে অন্নের মতো জীর্ণ সেই রাজত্ব আজ,
এমনকি আমার পিতৃত্ব
একটিমাত্র ক্ষীণ সূত্রে কম্পমান।

*সংক্রান্তি*তে ধৃতরাষ্ট্রের এই সংলাপটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, *কালসন্ধ্যা* ও *প্রথম পার্থে* বৃদ্ধদ্বয়ের সংলাপ যে ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ ঘটনার ইঙ্গিত প্রদান – এ নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপ সেই ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রের এই সংলাপ-বৈশিষ্ট্য *সংক্রান্তি* নাটকের মৌল প্রবণতা নয় – অর্থাৎ ধ্বনিব্যঞ্জনা কিংবা অলংকৃতি সংক্রান্তির প্রধান উদ্দেশ্য নয়, ভাষাকে কবিত্ব বা ঐশ্বর্য প্রদান বুদ্ধদেব বসুর মূল লক্ষ্য নয় বরং কথ্যশব্দে প্রায় গাদ্যিকতা সৃষ্টির জন্য এখানে ধ্বনি-অনুপ্রাসের ব্যবহার স্বল্প, এমনকি ক্রিয়াপদ বর্জন করে প্রথম পার্থের তুলনায় স্বল্প এমন কি ক্রিয়াপদ বর্জন করে ভাষাকে সংহত করার যে প্রয়াস পূর্ববর্তী নাটকগুলোতে লক্ষ্য করা যায় এখানে তা ও প্রায় অননুসৃত। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের অজস্র ব্যবহারে *সংক্রান্তি*র সংলাপে সঞ্চারিত হয় গতি ও প্রত্যক্ষতা। যেমন, ধৃতরাষ্ট্রে ও সঞ্জয়ের কথোপকথনে –

ধৃতরাষ্ট্র

(হঠাৎ তিক্ত স্বরে)

মহান আদর্শ ! ধর্মরাজ্য!
তুমি ও তা-ই বলো, সঞ্জয় ?

সঞ্জয়

মন্ত্রনাসভায় একবার যা শুনেছিলাম
আমি তারই পুনরুক্তি করছি। আমি কিছু বলিনা।

Dhaka University Institutional Repository

ধৃতরাষ্ট্র

কূটনীতি নয়, সর্তকতা নয়
আমি তোমার কাছে সরল সত্য শুনতে চাই,
শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে, তত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে –
যেমন বন্ধু কথা বলে বন্ধুর সঙ্গে,
বা পতির সাথে রহস্যালাপে কান্তা,
তেমনি ক'রে বলো আমাকে, সঞ্জয়,
তোমার কি মনে হয় কুরুক্ষেত্র
ধর্মক্ষেত্র? এই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ?

'গান্ধারীর সংলাপে ক্রিয়াপদের অভিঘাতে তার একেকটি অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হয়ে বিদ্ধ করে ধৃতরাষ্ট্রকে। অন্তর্বর্তী ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়াপদবর্জিত বাক্যে সংলাপটি এতবেশি প্রত্যক্ষ হতো না –

গান্ধারী

কিন্তু কেন যুদ্ধ? কেন এই পরিকীর্ণ সন্তাপ ?
স্বামী স্মরণ করো,
তোমার সতী পুত্রবধুর ক্রন্দনরোল, যা স্বকর্ণে শুনেও নিষ্ক্রিয়
ছিলে তুমি,
আর তোমার পৌরজনের বেদনা, যাতে অংশ ছিল তোমারও
তোমার সুহৃদবর্গের সদুপদেশ, যা নিস্ফল হ'লো
একজনের জন্য।
স্মরণ করো, কে
নির্জিত করেছিলো পাঞ্চালীকে – সভাস্থলে, গুরুজনের
চোখের সামনে,
কে চীৎকার ক'রে বলেছিলো, 'বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমি দেবো না'।
আর কোন পিতা তার পরও নিশ্চেষ্ট ছিলেন –
বিবেকদুঃখী, তবু নিশ্চেষ্ট ।
তখনও সময় ছিলো, মহারাজ তখনও সম্ভব ছিলো –
কেউ উপেক্ষা করলে
তোমার ভ্রাতার মঙ্গলবাক্য – দাসীপুত্র মহাত্মা সেই বিদুর,
যিনি ভীষ্মের মতোই কুরুবংশের বন্ধু?
কেন কর্ণপাত করলে না
শতপুত্রের জননী, শতগুণে শঙ্কিতা,
তোমার হিতৈষিণী, প্রণয়িনী পত্নীর ভর্ৎসনায় - প্রার্থনায়?
আর এখন এই শেষ মুহূর্তে –
যাকে স্নেনশীল তুমি পরিত্যাগ ক'রে বাঁচালে না
নির্মম হ'য়ে আশ্রয় দিলে না,
দুঃখ দিয়ে আশীর্বাদ করলে না,
ঠেলে দিলে
ধর্ম থেকে স্খলিত ক'রে ধ্বংসের মুখে –
এখন ভাবছো কোনো দেবতা তাকে রক্ষা করবেন?
মূঢ় পিতা, এখনো তুমি অন্ধ!

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াপদের প্রচুর ব্যবহারে কোনো গদ্যনাটকের সংলাপের মতোই গান্ধারীর এ সংলাপে সঞ্চারিত হয় ক্ষিপ্রতা, নাটকীয়তা, প্রত্যক্ষতা। সরাসরি নাটকীয় সংঘাত *সংক্রান্তি* তে নেই। বরং ঘটনার বিবরণ ও চরিত্রের প্রতিক্রিয়াই এখানে ব্যক্ত হয় পরোক্ষভাবে সংলাপের মধ্য দিয়ে, যেহেতু যুদ্ধের ঘটনা নেপথ্যে সংঘটিত হয়। 'এ্যাকশন' অপেক্ষা 'রিঅ্যাশকন' গুরুত্বপূর্ণ বলেই এ নাটকে চরিত্রের সংলাপকে প্রত্যক্ষতা দেয়ার প্রয়োজনে ভাষার গদ্যিক আবেদন অপরিহার্য। এ কারণেই, অন্ত্যে ক্রিয়াপদের এই প্রাচুর্য – এমনকি সঞ্জয়ের দার্শনিক মন্তব্যেও –

সঞ্জয়

মহাকাল! মহান! আমিও প্রণাম করি তোমাকে।
লোকে তোমাকে বলে দণ্ডধারী, দণ্ডদাতা,
কিন্তু আমার মনে হয় স্বহস্তে তুমি সংহার করো না,
শুধু হরণ করো বুদ্ধি, রোপণ করো উন্মাদনা।
আর এমনি ক'রে ইন্দ্রগণ পতিত হন,
মানুষের ইতিহাসে আসে ক্রান্তিকাল,
মহৎ বংশ লুপ্ত হ'য়ে যায়।

সংক্রান্তি নাটকে সাধু ও কথ্যভাষার সুষম প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ফলে, চরিত্র ভেদে সংলাপের ভাষার পার্থক্য ক্ষীণ হয়ে আসে। এ নাটকে ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বা গান্ধারীর ভাষার শব্দ-ব্যবহারে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত নয়। এর কারণ এই যে, হয়তো এ পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাটকে সমস্ত চরিত্রের জন্য সমান উপযোগী একটি সর্বজনীন ভাষারূপ নির্মাণ করতে চান, যা দ্বারা কবিত্ব ও নাটকীয়তা উভয়ই সৃষ্টি করা সম্ভব। সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণে ভাষাগত এই ভারসাম্য *সংক্রান্তিতে* সুপ্রতিষ্ঠিত। একই কারণে *সংক্রান্তিতে* অলংকারের ব্যঞ্জনা বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অপেক্ষা শব্দের অভিঘাত অধিক সক্রিয়। অন্তর্বাস্তবতার সাথে বহির্বাস্তবতা অর্থাৎ যুদ্ধ-ঘটনার সংযোগ ঘটায় *সংক্রান্তির* ভাষা অলংকার অপেক্ষা শব্দের উপর অধিক নির্ভরশীল। যেমন-

সঞ্জয়

অজগরতুল্য আলিঙ্গনে
আবদ্ধ হলো মদ্রসেনা আর কম্বোজবাহিনী।
ছুটে এলো যদুকুলের বীরবৃন্দ, অন্ধকদেশীয় যোদ্ধারা।
এখন সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি, মহারাজ,
যা অনেকবার বলতে হয়েছে আমাকে,
প্রায় একই ভাষায় বৈচিত্র্যহীন।
ওড়ে ধাতুখণ্ড, ছিন্ন অঙ্গ, প'ড়ে যায়,
জড়িয়ে যায় অশ্বরজ্জু ও অন্ত্রতন্ত্র,
লোষ্ট্র নরমুণ্ড যেন নির্ভেদ।
পশু আর মানুষ, উচ্চ আর নীচ বংশ
শত্রু, মিত্র রক্তের স্রোতে নির্ভেদ।

এ সংলাপে মদ্রসেনা আর কম্বোজবাহিনীর অজগরতুল্য আলিঙ্গন প্রত্যক্ষ উপমারূপে ব্যবহৃত হতে পারতো যুদ্ধের বীভৎস চিত্রটি একটি অসাধারণ চিত্রকল্পে ব্যক্ত হতে পারতো, কিন্তু নাট্যকার উদ্দেশ্যমুলকভাবে অলংকারকে এখানে শব্দে পরিণত করেন। একইভাবে, গান্ধারীর নিম্নোক্ত সংলাপটিতেও অলংকারকে ভেঙে দিয়ে শব্দমূর্তি দান করেন বুদ্ধদেব বসু –

গান্ধারী

আমি চেয়েছি সে জয় করুক – নিজেকে।
তার যুদ্ধ হোক সেই সব শত্রুর সঙ্গে,

Dhaka University Institutional Repository

যা তারই মধ্যে ভুজঙ্গের মতো গর্জমান।
এই আমার প্রার্থনা ছিলো –প্রতিদিন। কিন্তু এখন
বিষাক্ত দাঁত বিদ্ধ হয়েছে, মহারাজ,
আর সময় নেই।

গান্ধারীর এ সংলাপে একটি সম্পূর্ণ চিত্রকল্পের সম্ভাবনাকে অবদমিত রেখে বুদ্ধদেব বসু শুধু একটিমাত্র উপমা, 'ভুজঙ্গে'র ইঙ্গিতে শব্দ-ভাষা দ্বারা বিবৃত করেন বক্তব্যকে। অর্থাৎ অলংকারকে শব্দের প্রচ্ছন্ন করে দেন নাট্যকার – পৃথকভাবে অলংকারের অস্তিত্ব বুঝতে দিন চান না। অলংকারের প্রত্যক্ষতা কাম্য নয়, শব্দের দ্বারাই কবিত্ব সঞ্চার করতে চান নাট্যকার। বুদ্ধদেব বসু এতদিন ধরে অন্যান্য কাব্যনাটকে যেভাবে অলংকারগুলোকে সযত্নে সাজিয়েছেন, শেষদিকে গদ্যাবেদনের প্রয়োজনে ক্রমশ সেগুলো একে একে স্খলিত করেন নিজেই। যেমন, ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে –

ধৃতরাষ্ট্র

বনে, নির্জনে – যেখানেই যাও
আছে জন্ম, জীবন, জীবনের শৃঙ্খল।
শিশুরাও নিষ্পাপ নয়, গান্ধারী।
মাতার স্তন্যে সংক্রমিত হয় পাপ,
পৃথিবীর অন্নে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে
সব কর্মে পাপ, সব ধর্মাচরণে পাপ –
দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরে কোনো ভেদ নেই।

কোনো অলঙ্কারের ব্যবহার ছাড়াই এই সংলাপ শব্দ দ্বারা কবিত্ব মণ্ডিত এবং একই সাথে নাটকীয়। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* থেকে *সংক্রান্তি* পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের ভাষা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই এই বিবর্তনটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবিতাকে গদ্যের কত নিকটতর করা যায় – সেই নিরীক্ষাই হয়তো *সংক্রান্তি* তে বুদ্ধদেব বসুর অন্বিষ্ট – তাঁর ভাষা-ব্যবহারের উদ্দেশ্য। একারণেই *অনাম্নী অঙ্গনার* মতো চিত্রকল্পের ব্যবহার এখানে দুর্লক্ষ। বরং উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার বেশি করে লক্ষ করা যায়। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বরং ভাষাকে প্রত্যক্ষ করে তোলাই *সংক্রান্তিতে* বুদ্ধদেব বসুর মূল উদ্দেশ্য। আর চিত্রকল্প ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্থ করে তোলে, ভাষাকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে কিন্তু উপমা-উৎপ্রেক্ষার সংক্ষিপ্ত অলংকরণ যে সুযোগ স্বল্প, বরং ভাষাকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে সাহায্য করে তা। এ কারণে বুদ্ধদেব বসু *সংক্রান্তিতে* চিত্রকল্পের পরিবর্তে প্রচুর উপমা- উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন। যেমন, কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের দুই বিপরীত পক্ষের সংঘর্ষের চিত্রকে বিবৃত করে তুলতে সঞ্জয়ের সংলাপে ব্যবহৃত হয় উৎপ্রেক্ষা – 'এখন বেগবান – ক্রমশ আরো ত্বরান্বিত–/ঝাঁপিয়ে পড়ে পরস্পরের মধ্যে – উত্তাল –/ দুই বিপরীতগামী ঝঞ্ঝার যেন সংঘর্ষ।' কিংবা, শল্যের মৃত্যু-দৃশ্য বর্ণনায় উপমার ব্যবহার –'তার দীর্ণ দেহ থেকে রুধির/ উৎসমুখ থেকে জলধারার মতো নিঃসরমান।' একইভাবে 'তীরে-তীরে ধিক্কার দিচ্ছে পাণ্ডবসেনা।/ পবিত্র দ্বৈপায়নের জলে লোষ্ট্রের মতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, দম্ভোক্তি'। কিংবা, 'চক্ষু থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো তাচ্ছিল্যকণা ছড়াতে- ছড়াতে/অগ্নির মতো অগ্রসর হলেন দুর্যোধন।', কিংবা, গদাযুদ্ধরত দুর্যোধন ও ভীমের বর্ণনায় –'রক্তক্ষরণে রঞ্জিত হ'য়ে/দুই দেহ যেন পুষ্পিত দুই শাল্মলীবৃক্ষ।' অথবা, দুর্যোধনের মৃতকল্প মুহূর্তের বর্ণনায় – 'ধীরে-ধীরে চোখের জ্যোতি নিবে যায়, যেন দিনের শেষ রশ্মি' কিংবা, সঞ্জয়ের বর্ণনায় দুর্যোধনের নিস্পন্দ দেহ 'কোনো উৎপাটিত অশ্বত্থের মতো বিস্তীর্ণ হ'লো'। আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয় *সংক্রান্তির* বহু উপমার উপমান-উৎস পশু শ্রেণী। যুদ্ধে বীরত্ব বা পাশবিকতাকে তুলনা করতে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় পশুর উপমা। যেমন, দুর্যোধন প্রসঙ্গে সিংহের উপমা প্রায়শই ব্যবহৃত হয় সঞ্জয়ের সংলাপে দুর্যোধনের সুঠাম দেহের বর্ণনায় – 'দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু বিরাটবক্ষ/সিংহের মতো কটি, স্তম্ভের মতো উরুদ্বয়'। চারদিক থেকে শত্রুবেষ্টিত হ্রদাশ্রিত দুর্যোধনকে সঞ্জয় শিকারী আক্রান্ত গুহাবাসী সিংহের সাথে তুলনা করে। তার সংলাপে –

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্জয়

যেমন মৃগয়াচারী পুরুষবৃন্দ
পরিবৃত করে সিংহকে, কোনো শান্ত বনপথে, অকস্মাৎ
গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত, উত্তেজিত, ঝাঁপিয়ে পড়ে
উদ্যত অস্ত্রধারীদের মধ্যে – মৃত্যুর মুখে –
তেমনি এরা উৎসাহিত, উন্মুখর, কর্কশ;

পাণ্ডবগণের ধিক্কারে উঠে আসা দুর্যোধনের বর্ণনায়ও গজ, অশ্ব ও গণ্ডার এমনকি কাকের প্রসঙ্গ আসে –

সঞ্জয়

অঙ্কুশ যেমন গজরাজের অসহ্য,
উত্তম অশ্ব কশাঘাতে অস্থির,
শল্যবিদ্ধ গণ্ডার যেমন দুর্মদ –
তেমনি
হ্রদের জল মন্থন ক'রে,
তরুপল্লবে কম্পন তুলে,
কাকের কণ্ঠে শঙ্খের মতো নিনাদ জাগিয়ে
তীরে উঠলেন
সিক্ত, সংক্ষুব্ধ, নিশ্বসিত –
আপনার পুত্র দুর্যোধন।

এভাবে বীরত্ব, ভীরুতা, পাশবিকতা, চতুরতা প্রভৃতি ইঙ্গিত করতে *সংক্রান্তিতে* বারবার বিভিন্ন পশুর উপমা বা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়। যেমন, সঞ্জয়ের সংলাপে দুর্যোধন প্রসঙ্গে – 'তিনি উপেক্ষা করেছিলেন/ ইতরের দুর্বাক্য, ব্যঘ্র যেমন শৃপালের রবে চঞ্চল হয় না'। অন্যায়ভাবে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের অভিসন্ধি নিয়ে উদ্যত ভীমসেনের প্রসঙ্গে সঞ্জয়ের সংলাপে প্রযুক্ত হয় মৎস্যলোভী বিড়ালের উপমা–'আর ভীমসেন/রন্ধনশালায় মৎস্যলোভী মার্জরের মতো/বক্র চোখে তাকালেন।' গদযুদ্ধরত ভীম ও দুর্যোধনের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয় বৃষ, হাতী ও সিংহের প্রসঙ্গ –

সঞ্জয়

তারা আক্রমণ করলেন পরস্পরকে
যেন ক্ষিপ্ত দুই বৃষ
বা মদস্রাবী দুই হস্তী,
বা যুগল সিংহ – একই সিংহী জন্য কামোন্মত্ত
তর্জনে
গর্জনে
আস্ফালনে
দণ্ডঘর্ষণে
অতিভীষণ–দুর্দান্ত –রোমহর্ষণ।

যুক্তব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিতে যথাযথ শব্দ-ব্যবহার ও উপমার প্রয়োগে গদাযুদ্ধের দৃশ্যটি যেন প্রত্যক্ষ হয় ওঠে সঞ্জয়ের বর্ণনায়। পাণ্ডবদের পৈশুন্য ও নির্বিবেকী আচরণের প্রতি ধিক্কারে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ব্যবহৃত হয় পশুর উপমা – যেমন, – ' ঊরুভঙ্গ – নাভির নিম্নে আঘাত,/ নীতির বিরুদ্ধে, নিয়মের বিরুদ্ধে –/ বিবেকবুদ্ধিকে গোবৎসের মতো বলিদান!'। প্রাণী অনুষঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে আরেকটি অসাধারণ চিত্রকল্প উল্লেখযোগ্য –

Dhaka University Institutional Repository

ধৃতরাষ্ট্র

... কেননা যুদ্ধ কোনো অপরাধ নয়, ধর্ম।
আর, বনভূমিতে মাতঙ্গ দল ধাবিত হ'লে
যেমন লুপ্ত হয়ে যায় হরিণ-শশকের পদচিহ্ন,
তেমনি উৎপাটিত হয় করুণা
রণক্ষেত্রে, যোদ্ধার প্রতি পদক্ষেপে।

সংক্রান্তি নাটকে সবচেয়ে অলংকারবহুল ও কবিত্বপূর্ণ সংলাপ সঞ্জয়ের। অথচ সে নিরাসক্ত কথকমাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় সঞ্জয়ের সংলাপ অসাধারণ কবিত্বমণ্ডিত –

সঞ্জয়

আপনার পুত্রের মতোই
ইতস্তত ঘূর্ণমান সব নেতারা,
দৃশ্য - কখনো অদৃশ্য - তাঁদের অস্ত্রপাত বিরতিহীন,
যেন ভাদ্রের শেষ বর্ষণধারা
প্রতি মুহূর্তে প্রবলতর, বর্ধিতবেগ,
বিদ্যুতে ও বজ্রপাতে ভয়ংকর,
যেন একই সাথে দাবানল আর বন্যা,
ঐ জ্ব'লে উঠলো আগুন
অর্জুনের গাণ্ডীব থেকে লক্ষ শিখায় লেলিহান,
আর, যেন অদম্য কোনো আকর্ষণে
ঝাঁকে - ঝাঁকে পতঙ্গের মতো স্বেচ্ছায় বা অসহায়ভাবে
দগ্ধ হচ্ছে কম্বোজসেনা, সৌবীর সেনা,
আর অন্ধক আর সংশপ্তক বাহিনী।
অন্যদিকে, প্লাবনের মতো
দুর্যোধনের বিস্ফারিত বিক্রম
স্খলমান পল্লীর মতো ভাসিয়ে নিচ্ছে
পাণ্ডবপক্ষের সম্বল, যারা মৎস্য মগধ চেদিরাজ থেকে এসেছিলো –
কিন্তু কেউ আর নিজের দেশে ফিরবে না।

তথ্যের সাথে কবিত্ব, বিবরণের সাথে ব্যঞ্জনার এবং ধ্বনি-অনুপ্রাসের অভূতপূর্ব সমন্বয় সঞ্জয়ের সংলাপে আরো লক্ষ করা যায়। বিশেষত এ নাটকের সবচেয়ে কবিত্বপূর্ণ মুহূর্তটি সঞ্জয়ের সংলাপেই বিবৃত –

সঞ্জয়

নামলেন তিনি জলে মন্থর পায়ে
যেন পুষ্করবাসী দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত। তাঁর মাথায়
ঝ'রে পড়লো তীরবর্তী দেবদারু থেকে পল্লব
দূর্বার মতো, যেন আশীর্বাদে। আর জল
তাকে ঘিরে-ঘিরে স্নাত ক'রে দিলো সস্নেহে।
আমার মনে হয় জলদেবী আর বনদেবীরা
যুক্ত হয়েছেন শরণার্থীর পরিচর্যায়।
আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের হাতের স্পর্শ – কল্যাণময়, কোমল,
যা ধুয়ে দেয় গ্লানি, হরণ করে ম্লানিমা;
যেন প্রায় শুনতে পাচ্ছি
তাঁদের তরল অথবা মর্মরস্বরে সান্ত্বনা।

দৃশ্য, শ্রুতি ও স্পর্শকল্পের সমবায়ে সঞ্জয়ের এ বর্ণনা ইন্দ্রিয়স্পর্শী। নিরাসক্তির সাথে কবিত্বের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায় সঞ্জয়ের চিত্রকাল্পিক সংলাপে – ব্যবহারে –

মৃত্যু অবশেষে জয়ী শুধু মৃত্যু,
মহাকালের খাদ্য আজ প্রচুর –
এই সুন্দর অগ্রহায়ণে –
ক্ষেত্র থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ পরিপক্ব ধান্যের মতো
দেহ থেকে উৎপাটিত জীবাত্মা –
গণনার অতীত, বেদনার অতীত, বিমিশ্র –
তারা কথা বলতো ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায়, এখন একইভাবে স্তব্ধ।

*সংক্রান্তি*তে নাটকীয়তা বৃদ্ধির জন্য বুদ্ধদেব বসু অনাবশ্যক অলংকারকে পরিহার করেন। কিন্তু, সঞ্জয়ের সংলাপে ব্যবহৃত এই ধরনের কিছু চিত্রকল্প নাটকটিকে অন্তঃরাশ্রয়ী করে তোলে। নাটকীয়তার সাথে কবিত্বের ভারসাম্য সৃষ্টি করে। যেমন - দুর্যোধনের মৃত্যু-মুহূর্ত সকরুণ হয়ে ওঠে সঞ্জয়ের সংলাপে –

সঞ্জয়

তিনি এগিয়ে দিলেন গ্রীবা, তাঁর ওষ্ঠাধর খুলে গেলো,
কিন্তু তাঁর কণ্ঠ থেকে হঠাৎ
উদগীর্ণ হ'লো ঝলকে-ঝলকে রক্ত –
একটি রক্তিম ধারা মাটিতে
বিভক্ত হ'য়ে, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো
সূর্যাস্তের লোহিত বর্ণ আলোর মধ্যে।
তার মাথা এগিয়ে পড়লো, দীর্ঘদেহ লম্বমান।

সঞ্জয়ের সংলাপে এই কবিত্ব-করুণ বর্ণনা নাটকে ট্র্যাজিক আবেদন সৃষ্টি করে। এভাবে সঞ্জয়ের সংলাপের মাধ্যমে *সংক্রান্তি*তে অন্তর্নাট্য ও বহির্নাট্যের সমন্বয় সাধিত হয়।

সংক্রান্তি নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপ সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময় – তাতে কখনো কারুণ্য, কখনো অহিষ্ণুতা, কখনো উৎসাহ, কখনো ভর্ৎসনা, কখনো নিঃসহায়তা। যেমন দুর্যোধনের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্রের সংলাপে ধ্বনিত হয় মর্মভেদী হাহাকার, 'জীবিতের যন্ত্রণা' –

ধৃতরাষ্ট্র

রুদ্ধ হোক সূর্যোদয়! নির্বাপিত হোক জ্যোতিষ্কেরা
বিধ্বস্ত হোক দিন, রাত্রি, বৎসর।
আমারই চক্ষুর মতো চরাচর হোক অন্ধকার,
সব হৃদয় প্রস্তর হয়ে যাক
সব বেদনা লুপ্ত,
লুপ্ত আশা, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন, ক্রন্দন।
হায় পুত্র! হায় সংসার! হায় মরত্ব!

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধারীর সংলাপে স্বভাবতই তার চরিত্রের দার্ঢ্যের প্রতিফলন ঘটে –

গান্ধারী

হৃদয়, মহারাজ, আমার হৃদয় এক শবাচ্ছন্ন শ্মশান,
যেখানে আমি কিঞ্চিৎ স্থান বাঁচিয়ে রেখেছি এখনো,
অতি কষ্টে, আরো একজনের জন্য।

কিন্তু যে মুহূর্তে সে সঞ্জয়ের মুখে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা-বর্ণনা শুনতে পায়, সেই মুহূর্তেই তার অবদমিত মাতৃত্ব জেগে ওঠে। তবে, *সংক্রান্তিতে* গান্ধারীর সংলাপের মৌল প্রবণতা হলো বাস্তবতা, আদর্শ ও মমতা এই তিনের অন্তর্সংঘাতে সৃষ্ট দ্বান্দ্বিকতা –

গান্ধারী

বাছা, ফিরে আয়! ফিরে আয় শিশু হ'য়ে আমার কোলে
শুধু সদ্যোজাত শিশুরা নিষ্পাপ।
ভারতশ্রেষ্ঠ, আমাকে স্পর্শ করো। আমাকে আলিঙ্গন করো,
স্বামী –
যদি পারো, আরো একটি পুত্র দাও আমাকে।
তাকে নিয়ে, এই রাজপুরী ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে,
আমি অনেক দূরে কোনো নির্জন বনে চ'লে যাই।

গদ্যছন্দে তৎসম ও কথ্যভাষার সুষম প্রয়োগে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে প্রত্যক্ষতা সৃষ্টিতে অনাবশ্যক কবিত্ব বর্জনে ও শব্দের মাধ্যমে গতিশীলতা সঞ্চারে *সংক্রান্তির* সংলাপ নির্মেদ, নিঃসংশয়ী – বুদ্ধদেব বসুর শিল্প-নিরীক্ষার সফল ফলশ্রুতি।

কাব্যনাটক যেহেতু ভাষা-নির্ভর শিল্প, ফলে এর সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সংলাপই ঘটনা, চরিত্র, নাট্যক্রিয়া মঞ্চ, দর্শক সমস্ত কিছুর মধ্যস্থতাকারী। কাব্যনাটকে সংলাপই নাট্যকারের দর্শন ও শিল্প-প্রতীতির বাহন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর পাঁচটি মৌলিক কাব্যনাটকে সংলাপ-নির্মাণের ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিরীক্ষাশীল এবং প্রতিনিয়ত উৎকর্ষমুখী, আত্মঅতিক্রমণকারী। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* থেকে *সংক্রান্তি* পর্যন্ত প্রত্যেকটি নাটকের সংলাপের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যেমন অনুভবযোগ্য, তেমনি সংলাপের মৌলিক বিষয়গুলো, যেমন কবিত্ব ও নাটকের ভারসাম্য বিধান, শব্দ ও ধ্বনির উৎকর্ষ সাধন, ভাষার প্রসাধনে মাত্রাচেতনা সর্বোপরি ভাষার গতিশলীতা বৃদ্ধিতে বুদ্ধদেব বসু প্রতিমুহূর্তে সচেতন, তন্নিষ্ঠ ও স্বাতিক্রমণশীল একজন স্রষ্টা। মহত্তর জীবনবোধ ও শিল্প-প্রত্যয়ের সমসূত্রিতায় তাঁর কাব্যনাটকগুলো অক্ষয় বটরূপী মহাকালের শাখায় ঝুলন্ত দুর্লভ এক একটি ফল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি :

১ রামবসু,'কাব্যনাটক', 'নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নভেম্বর ১৯৯৪, পুস্তক বিপণি বেনিয়াটোলা লেন, কলকতা-৯, পৃ. ৩০৭

২ মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য', ফেব্রুয়ারি ২০০৯, নবযুগ প্রকাশনী ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, পৃ. ১৪

৩ T.S. Eliot 'The Three Voices of Poetry, 'Selected Essays' 2000, Doaba Publications, 4497/14, Guru Nanak Market, Nai Sarak, Delhi-110006, Page. 83.

৪ Ibib, Page. 80.

৫ 'লোলাপাঙ্গীর এই কথায় মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার মায়ের কথা। ... উচ্চবংশজাত আনন্দকে হীনকুলজাতা প্রকৃতির জলদানকে তার মা পাগলামী বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির কাছে এই জলদান পাগলামির ব্যাপার ছিল না। সে স্পষ্টই জানিয়েছিল তার মাকে, 'কেবল এক গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হলো সেই জল। সাতসমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে ডুবে গেল। আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।' কন্যা কাছে যা অকপট স্বীকারোক্তি, মায়ের কাছে তা ভয়ের, অধর্মের; হয়ত উচ্চ বর্ণের মানুষের এ এক জাদু যার মন্ত্র চণ্ডালিনীকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। মা বলেছে, 'ওদের মন্তরের খেলা আমি বুঝিনে। আজ তোর কথা চিনছিনে, কাল তোর মুখ চিনতে পারবনা।' – ড: জগন্নাথ ঘোষ, 'নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু', ১৯৯৮, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পৃ.২৭-২৮

৬ অশ্রুকুমার সিকদার, 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা', 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর ১৯৮৩, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা-৬, পৃ. ২৮৭

৭ ড, কণিকা সাহা, 'আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ', জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট কলকাতা-৬, পৃ. ১৪৫

৮ T.S. Eliot 'The Need for Poetic Drama, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

৯ মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য', ফেব্রুয়ারি ২০০৯, নবযুগ প্রকাশনী ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, পৃ. ১৫

১০ অশ্রুকুমার সিকদার, 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা', 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর ১৯৮৩, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা-৬, পৃ. ২৮৭-২৮৮।

১১ বুদ্ধদেব বসু, 'প্রযোজনার জন্য পরামর্শ' 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', আষাঢ় ১৪০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃ. ৮৪

১২ ড. কণিকা সাহা, আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য ও উদ্ভব ও বিকাশ, জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট কলকাতা-৬, পৃ. ১৪৫

১৩ ড. কণিকা সাহা, আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য ও উদ্ভব ও বিকাশ, জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট কলকাতা-৬, পৃ. ১৪৮

১৪ বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা ছন্দ', 'সাহিত্যচর্চা', ফাল্গুন ১৪১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩. পৃ. ১০০

১৫ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ' কাব্যের মুক্তি' 'স্বগত', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ' জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

১৬ কাব্যের এই ধাতুসঙ্করের নির্মিত আধারটির নামই মুক্তছন্দ – Free verse। তাতে নতুন-পুরাতন সকল বয়সের সুরই ইচ্ছানুসারে মেলানো চলে, অথচ পাত্র ফাটবার কোনও ভয় থাকে না। সে-ছন্দকে উপলক্ষের তাগিদে পদ্যের নিয়মে দরবেশী নৃত্যে নামানো সম্ভব, আবার অবস্থান ঘটলে, গদ্যের অনিয়মিত গতিও তাতে বেখাপ্পা লাগে না। সে সন্ন্যাসীর ভেক নেয়নি বটে, কিন্তু তাই ব'লে যে সময়ে সময়ে গৈরিক পরে না, এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কারের বাহুল্যে তার তিলার্ধ অঙ্গ অনাবৃত নেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'ছন্দমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' 'কুলায় ও কালপুরুষ', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ', জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ পৃ. ২৩৬

১৭ প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪১

১৮ শঙ্খ ঘোষ, 'ছন্দের বারান্দা', 'পুনর্মুদ্রণ', 'উত্তরাধিকার', বাংলা একাডেমী, সৃজনশীল ত্রৈমাসিক, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৫০২-৫০৩

১৯ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ-ছায়া', 'বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১২৪

২০ ড. কণিকা সাহা, 'আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ', জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট কলকাতা-৬, পৃ. ১৫৪-১৫৫

২১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক জীবন ও পুরাণ-ছায়া' 'বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে', তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১২৪-১২৫

২২ অশ্রুকুমার সিকদার, 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা', 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর ১৯৮৩, ভারত বুক এজেন্সি, ২০৬ বিধান সরণি কলকাতা-৬, পৃ. ২৮০

২৩ বুদ্ধদেব বসু,'রবীন্দ্রনাথের গানে গদ্য পদ্য', 'পুনর্মুদ্রণ' 'উত্তরাধিকার' বাংলা একাডেমী সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক, ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ৬২৫-৬২৭

২৪ রামবসু, 'কাব্যনাট্য', 'নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা; তরুন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নভেম্বর, ১৯৯৪, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটেলা লেন কলকাতা-৯, পৃ. ৩১২

২৫ অশ্রুকুমার সিকদার, 'কাব্যনাট্য ও তার ভাষা', 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), অক্টোবর ১৯৮৩, ভারতবুক এজেন্সি,০৬ বিধান সরনি কলকাতা-৬, পৃ. ২৮০

২৬ ডঃ জগন্নাথ ঘোষ, 'নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু', বইমেলা ১৯৯৮, করুনা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৭৪

২৭ ড. কণিকা সাহা, 'আধুনিক বাংলা কাব্যনাট-উদ্ভব ও বিকাশ', জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট কলকাতা-৬, পৃ. ১৬৫

২৮ ডঃ জগন্নাথ ঘোষ, 'নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু', বইমেলা ১৯৯৮, করুনা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৭৪

২৯ চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', এপ্রিল ২০০১, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০, পৃ. ১৯৮-১৯৯

৩০ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক', বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, মে ১৯৯৯, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয়তায় আদিম মানুষের বিস্ময় ও কল্পনার প্রতীকী ভাষারূপে মিথের জন্ম, ক্রমরূপান্তর ও বিস্তৃতিতে এর গতি এবং সৃজনের অন্তহীন সম্ভাবনায় এর উৎকর্ষ। মিথ কেবল সমাজ বিকাশের অপরিহার্য উপাদান নয়, শিল্পের মাধ্যমে তা মানব-চেতনার রূপান্তরের অন্যতম নিয়ামক। দ্রুতগতি সভ্যতার উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য মিথের চাই রূপান্তর, ফলে তার প্রয়োজন আধুনিক শিল্পীর চেতনার আশ্রয় আর এই সভ্যতারই ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা, বিকল্প-সন্ধানী শিল্পীর চেতনার স্থির প্রত্যয় ও আশ্বাসের অবলম্বনরূপে প্রয়োজন মিথের। এই দু'য়ের প্রয়োজন যখন একাত্ম, তখনই শিল্প সাহিত্যে আসে নবনির্মাণের মাহেন্দ্র-মুহূর্ত। তখন আধুনিক শিল্পী পুরাণের কোন আখ্যান বা অনুষঙ্গের মধ্যে তার সমকালকে অন্তর্প্রবিষ্ট করেন এবং পৌরাণিক জীবন ও সমকালীন বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়া থেকে একটি সর্বজনীন ও চিরায়ত বোধকে জাগ্রত করে তোলেন তাঁর শিল্পে। একেই বলে মিথের পুনর্নির্মাণ। বস্তুত মিথাশ্রয়ী শিল্প তাই, যা সমকালীন হয়েও স্থানকালোত্তীর্ণ, নতুন সৃষ্টি হয়েও শাশ্বত মহিমায় অন্তর্দীপ্ত এবং সামূহিক চেতনাজাত হয়েও শিল্পীর ব্যক্তিত্বস্পর্শে অভিনব। আর সাহিত্যে মিথ ও কাব্যনাটক এক অসাধারণ রাজযোটক। এ দু'য়ের সংহত ও শৈল্পিক সমন্বয়ে বর্তমান ও চিরন্তন, কবিতা ও নাটক, দর্শন ও আবেগের সহজাত ঐক্যে সাহিত্য হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে এলিয়ট-ইয়েটস, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব বসু মিথাশ্রয়ী কাব্যনাটকের এই ধারার রূপকার। রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব বসুই আধুনিক চেতনা ও প্রজ্ঞানে এবং নতুন কলাকৌশলে মিথের পুনরুজ্জীবন ঘটান বাংলা সাহিত্যে। পৌরাণিক আখ্যান, প্রতিবেশ ও চরিত্রের সমান্তরালে তিনি সঞ্চালিত করেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় আধুনিক মানুষের জীবন, মনস্তত্ত্ব, সংকট ও উপলব্ধির নানা মাত্রিকতা এবং এ রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর চেতনায় সক্রিয় থাকে এক ধরনের মিথিক শুভচেতনা ও কল্যাণ-মানসিকতা। তবে বুদ্ধদেব বসু মিথ-নির্মাণের ক্ষেত্রে সমকাল-চেতন হলেও সমকাল-স্পৃষ্ট নন, বরং যুধ্যমান সমকালে পুরাণ তার নিকট এক আশ্চর্য 'দ্বৈপায়ন হ্রদ', যেখানে তিনি লাভ করেন শান্তি, শুশ্রূষা এবং পুনরায় জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য। বুদ্ধদেব বসু সমকাল-ক্লিষ্ট হননি তার কারণ, তাঁর প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অহমচেতনা এবং শিল্পে ব্যক্তিত্বকে বা আমিত্বকেই উপস্থাপনের নিরলস ও অব্যাহত প্রচেষ্টা। বস্তুবিশ্ব-সচেতন থেকে ও তিনি নিবিষ্ট থাকেন শিল্পের ভেতর দিয়ে আত্ম-অতিক্রমণের প্রবল ও কঠিন সংগ্রামশীলতায়। তাঁর সৃষ্ট যুধিষ্ঠিরের মতোই এক চলমান মহাযুদ্ধের মধ্যে অবস্থান করেও সর্বদাই তিনি মগ্ন থাকতেন এক চিন্তাশীল নৈঃসঙ্গের ভেতর, জীবনের বৃহত্তর অর্থ ও সম্ভাবনাকে আবিষ্কারের লক্ষ্যে। মিথ-চেতনায় বুদ্ধদেব বসু সমকালীনতা অপেক্ষা শাশ্বতের প্রতি অধিক মমত্বপ্রবণ। তাঁর সমকালে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে – সকল আধুনিক কবিরাই অল্পাধিক সমকাল-স্পৃষ্ট ও দেশ-কাল বিদ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করেন। এঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুই সর্বাপেক্ষা কম-কালস্পৃষ্ট এবং সর্বাধিক পরিমাণে মিথ-আকৃষ্ট। কারণ, মিথ-নির্ভরতার ক্ষেত্রে ত্রিশোত্তর যে কোনো কবি অপেক্ষা বুদ্ধদেব বসুর প্রেক্ষাপট ভিন্নতর, আরো বিস্তৃত। বুদ্ধদেব বসু জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিথকে সঙ্গী করেছিলেন ক্রমশ একটি সমগ্রতায় পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। ফলে, অন্যান্য কবিরা যেখানে সাধারণত তাঁদের সমকাল-বিদ্ধতার প্রকাশ ঘটাতে কবিতায় মিথের রূপক, প্রতীক, উপমা কিংবা চূর্ণরূপ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকেন, সেখানে বুদ্ধদেব বসু আরও গভীর, বিস্তৃত ও সর্বদর্শীরূপে মিথকে জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন। বর্তমানের সংকটকে তিনি একমাত্র বলে জানেননি, ব্যাপৃত কাল ও বহমান সভ্যতার চরিত্র অনুসন্ধান করে সমকালকে একটি সংক্রান্তি রূপে চিহ্নিত করেন, যা মহাকালের গর্ভে বিস্মৃত ইতিহাসরূপে ক্ষীয়মাণ হয়ে যেতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে, সমকাল বুদ্ধদেব বসুর সুবৃহৎ কালচেতনায় বিলীন হওয়া ক্ষুদ্র অস্তিত্বমাত্র। *কালসন্ধ্যা* নাটকে দ্বারকাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংসের প্রতিরূপকে সমকালীন অবক্ষয় ও বিনষ্টির যে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবতা ইঙ্গিতায়িত তাও বুদ্ধদেব বসুর নিকট কালের স্বাভাবিক সংহারক মূর্তিরূপেই ব্যাখ্যায়িত এবং ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবনের ধারাবাহিকতায় তা ইতিবাচক সম্ভাবনায় দূরপ্রসারী। *সংক্রান্তি* নাটকে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রতিরূপকে যুধ্যমান সমকালের সন্ধিক্ষণকেই ইঙ্গিতায়িত করেন নাট্যকার। তবে, সেটিই একমাত্র লক্ষ্য নয় তাঁর বরং এই দুই ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে মহাকালের চিরকালীন বৈনাশিক রূপটি উপস্থাপনে উৎসাহী নাট্যকার। কারণ, সমকালীনতা অপেক্ষা চিরায়ত বোধেই অধিক আস্থাবান বুদ্ধদেব বসু। তাঁর কালে পাশ্চাত্য সাহিত্যিক এলিয়ট-ইয়েটস- জাঁ জিরাদু (*Electra*) কিংবা জাঁ পোল সার্ৎ (মাছিরা, ল্যে মুশ)– প্রমুখ প্রত্যেকেই তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে মিথের আশ্রয়ে যখন মূলত সমকালীন বন্ধ্যাত্মকেই প্রকটরূপে চিত্রণ করেন, তখন বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে অসহনীয়তা বা অস্থৈর্যের প্রকাশ নেই বিন্দুমাত্র। দুর্যোধনরূপী দুঃশীল এই যান্ত্রিক দানব 'দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি'রূপী প্রকৃতিকে কখনোই নগ্ন করতে পারবেনা – এই গভীর আস্থায় বিশ্বাসী তিনি। সমকালীন সংকটকে আত্মস্থ করে নিয়ে তিনি মিথ-নির্মাণের যে বান্ধব-বিরল নিঃসঙ্গ পথ অতিক্রম করেন, তা আপাতদৃষ্টিতে মন্থরগমন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা এক চিন্তাশীল সৃজন-সন্ধানী পথ-পরিক্রমা, যে পথের শেষে থাকে মহৎ জীবনের উদ্ভাসন, জীবনের জটিল দুর্জ্ঞেয় জিজ্ঞাসার সমাধান এবং সংকট উত্তরণের অঙ্গীকার। সেখানে থাকে বর্তমান পৃথিবী, ইতিহাস ও সভ্যতা, ব্যক্তি ও ব্যষ্টির উত্তরণের সুমহান সংকল্প, কল্যাণ ও অস্তিচেতনা। ফলে, কালস্পৃষ্ট চেতনার পরিবর্তে এক কালজ্ঞ ও সত্যসন্ধ শিল্পীর প্রজ্ঞান পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যনাটকে, যা কিয়দংশে তুলনীয় হতে পারে রবীন্দ্রনাথের সৌম্য ও শাশ্বত চেতনার সাথে কিংবা জীবননান্দ দাশের ইতিহাসবোধের সাথে। সভ্যতার ক্লান্তি থেকে আত্মমুক্তির জন্য কিংবা সভ্যতাকেই বিপন্নতা থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ শরণাপন্ন হয়েছিলেন ইতিহাসের – ইতিহাসের শক্তি থেকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন নিজেকে ও পৃথিবীকে। জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে ইতিহাস-চেতনার যে ভূমিকা, বন্ধুদেব বসুর ক্ষেত্রে পুরাণ-চেতনা সেই দায়িত্ব পালন করে। আর মিথ-নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই বন্ধুদেব বসু শেখেন সাহিত্যের চিরন্তন ধর্ম। তবে চিরন্তনতায় বিশ্বাসী বলে বন্ধুদেব বসুর কাব্যনাটকে সমকাল উপেক্ষিত নয় বরং চিরকালীনতার সাথে সমকালীনতার অন্বয়ে তাঁর কাব্যনাটক হয়ে ওঠে আধুনিক, জীবনধর্মী।

যুদ্ধোত্তর যান্ত্রিক সভ্যতায় ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধে ব্যক্তির যৌন-জীবনের অস্থিরতা ভাবায় বন্ধুদেব বসুকে। কাম-চেতনা, যা বিভিন্নভাবে, বিচিত্র বিশ্লেষণে প্রথম থেকেই তাঁকে তাড়িত করে, দণ্ডিত করে এবং ফলশ্রুতিতে আরো বেশি জিজ্ঞাসু করে, তাও ঋষ্যশৃঙ্গের মিথের মোক্ষম আধারে শেষ পর্যন্ত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে দ্বিধাহীন সমাধানে উত্তীর্ণ হয়। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যনাটক। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* রচনার পূর্বে বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনার ক্রমিক বিবর্তন লক্ষ করা গেলেও তা কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের সন্ধান লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, যদি মিথের আশ্রয়ে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* রচিত না হতো তবে তাঁর কামচেতনা এতবেশি উৎকর্ষ অর্জন করতো বলে মনে হয় না। হয়তো নিন্দা, অভিযোগ আর কৈফিয়তের মধ্যে তা বুদ্ধদেব বসুর জীবনদর্শনের একটি গৌণপ্রান্তরূপেই গণ্য হতো। 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'(১৯৬৭) উপন্যাস তার দৃষ্টান্ত। কাব্যনাটকে একটি সংহত চৈতন্য এবং সামগ্রিকতাবোধ দ্বারা বুদ্ধদেব বসু পরিচালিত হন, যা মিথিক জীবনভাষ্যে কিংবা দৃষ্টান্তে অর্জন করে স্থির প্রত্যয়। তাই *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে যৌথ অবচেতনার আশ্রয়ে বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনা বিশুদ্ধ চেতনায় উত্তীর্ণ হয় – অর্জন করে তর্কতীত, নিন্দাতীত সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা, অপর দিকে চরিত্রগুলোর মধ্যে আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রতিফলনে লাভ যায় একালের জটিল জীবনের আস্বাদ।

বুদ্ধদেব বসুর কামভাবনার অপর এক মহৎ উদ্ভাসন রূপায়িত হয় *অনাম্নী অঙ্গনায়* যেখানে কামের মধ্য দিয়ে রাজপ্রসাদের একজন নগণ্য পরিচারিকা উপনীত হয় মাতৃত্বের কল্যাণময় সংকল্পে- নিজের মধ্যে সে লালন করে সম্ভাবনাময় জন্মের অঙ্কুরকে, যিনি একদিন রক্তাক্ত পৃথিবীতে প্রজ্ঞা ও শান্তির দূত বলে প্রণম্য হবেন। অনাম্নী অঙ্গনায় এক কুমারী মাতার আত্মপ্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অহমিকায় পুরাকাল ও সমকাল সমান্তর ব্যঞ্জনায় শিল্পিত হয়। আর,

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বুদ্ধদেব বসু দেশ-কালের সংকটকে মিথের মাধ্যমে একটি শুভার্থবাহী চেতনায় রূপান্তরিত করেন, যা চিরকালীন শিল্পের আবেদন বহন করে।

বিশ শতকীয় বৈশ্বিক ও দৈশিক বাস্তবতায় ব্যক্তির ত্রিশঙ্কু অবস্থা- তার দ্বান্দ্বিক চৈতন্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে বিচ্ছিন্নতাবোধে উন্মূল ও অনিকেত মানসিকতার মিথিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায় *প্রথমপার্থ* নাটকে কর্ণের নৈঃসঙ্গ্যে। *মহাভারতের* উপেক্ষিত কর্ণের দ্বন্দ্ব-সংকট-সংবেদনা-তার উপেক্ষা, বঞ্চনা ও অহম – এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে ত্রিশোত্তর কালের কলোনি-সমাজে মেধাবী অথচ অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-মানসের যন্ত্রণার মিথিক রূপায়ণ বুদ্ধদেব বসুর *প্রথমপার্থ* নাটক। *কালসন্ধ্যা* ও *সংক্রান্তি* তে যদুবংশ ধ্বংস ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চিত্রনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার দু'টি *সংক্রান্তি* চিহ্নিত এবং তা ধারণ করে একই সাথে বুদ্ধদেব বসুর সমকালীন সমাজের সন্ধিলগ্নের চরিত্রকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ধারবাহিকতায় যদুবংশের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে একটি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলয়কে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটকে রূপায়ণ করলেও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পুনুরুজ্জীবনের ইঙ্গিতে তা সুদূরপ্রসারী। এইভাবে, বুদ্ধদেব বসু ব্যক্ত ও ব্যাষ্টির, সমকাল ও চিরকাল, পুরাণ ও আধুনিক জীবনকে সমসূত্রে গ্রথিত করে শেষ পর্যন্ত এক ত্রিকালসঞ্চারী শাশ্বত বোধকে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর কাব্যনাটকে। জীবনভাবনার সাথে শিল্পাদর্শের সুগভীর সান্বয়ে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক সয়ম্ভু, সম্পূর্ণ একেকটি সত্তা যেন। এলিয়ট-ইয়েটস প্রমুখ পাশ্চাত্য নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হলে ও স্বীকরণসাধনায় ও মৌলিক বিশুদ্ধতায় বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলোর সংস্থাপন-রীতি অন্যবিধ, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। আধুনিক জীবন ও প্রতিবেশের সঙ্গে সামাঞ্জস্যসূত্রে পৌরাণিক আখ্যানের যথাযথ সংস্থান, কালগত ব্যবধানেও চরিত্রগুলোর অসম মনস্তত্ত্বের ভারসাম্যসাধন, আধুনিকায়ন এবং তাদের সংলাপ ও ভাষাগত দূরত্বের অন্বয়সাধনে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলো নান্দানিক সংযম ও নিষ্ঠার নির্বিকল্প নির্মাণ। এখানে তাঁর কবিসত্তায় সঞ্চিত শব্দ-অভিজ্ঞান এবং নাটকীয়তার প্রয়োজনে আত্তীকৃত কথ্য ও লোকজ শব্দের প্রয়োগবৈচিত্র্য অসাধারণ। বিশেষত, সংস্কৃত শব্দের নম্র ও অনম্র, অভিঘাতপ্রবণ ও অন্তর্মাধুর্যপূর্ণ প্রকাশে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলো অনন্য বিস্ময়। গদ্যছন্দ ও মিশ্রছন্দের যথাস্থানিক প্রয়োগে, ছন্দ ও ছন্দপাতের বৈচিত্র্যে, কবিত্ব ও নাটকীয়তার সুষম বিন্যাসে শিল্পিত নাটকগুলো। এছাড়া অংলকারের ব্যঞ্জনায় কিংবা প্রতীকিতায়, ধ্বনি-আনুপ্রাসিকতায়, গানের সঙ্গতি ও গূঢ়তায় এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় বুদ্ধদেব বসুর প্রত্যেকটি কাব্যনাটক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈলক্ষণপ্রাপ্ত, স্বতন্ত্র্যআস্বাদযুক্ত। অভিজ্ঞতা ও দর্শনের ঋদ্ধতায়, সৃষ্টিসত্তা ও নন্দন-চেতনায় পরিপূর্ণ বিকাশে বুদ্ধদেব বসুর শিল্পীজীবনে অন্তিকপর্যায়ের এই সৃষ্টিসম্ভার অবন্ধ্যও অনশ্বর। বুদ্ধদেব বসুর এই মৌলিক পাঁচটি কাব্যনাটক অমরাবতীর পঞ্চবৃক্ষের মতো বাংলা সাহিত্যের চিরঞ্জীবী ঐশ্বর্য।

Dhaka University Institutional Repository

মূলগ্রন্থ

১ বুদ্ধদেব বসু, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', আষাঢ় ১৪০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

২ বুদ্ধদেব বসু, 'কালসন্ধ্যা', মাঘ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা।

৩ বুদ্ধদেব বসু, 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ', বৈশাখ ১৪০৮, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা।

৪ বুদ্ধদেব বসু, 'সংক্রান্তি প্রায়শ্চিত্ত : ইক্কাকুসেন্নিস', মাঘ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

১ অশ্রুকুমার শিকদারঃ 'আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়', বৈশাখ ১৪১১ অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬

২ আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত): 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', অক্টোবর ১৯৮৩ ভারত বুক এজেন্সি ২০৬, বিধান সরণি কলকাতা-৬

৩ কালীপ্রসন্ন সিংহঃ 'মহাভারত (বঙ্গানুবাদ) প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, মহালয়া অক্টোবর ২০০৫, বেনীমাধব শীল'স লাইব্রেরি ১৬৭, চীনাবাজার স্ট্রিট, কলকাতা।

৪ চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত 'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া', এপ্রিল, ২০০১, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

৫ জোসেফ ক্যাম্পবেলঃ মিথের শক্তি, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (অনূদিত), ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ঐতিহ্য, রুমী মার্কেট ৬৮৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৬ তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বুদ্ধদেব বসু মননে অন্বেষণে' অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

৭ তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা', অক্টোবর ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

৮ নরেশ গুহ, (সম্পাদিত) 'বুদ্ধদেব বসু কবিতা সংগ্রহ' ১ম খণ্ড, জানুয়ারি ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

৯ নরেশ গুহ, (সম্পাদিত) 'বুদ্ধদেব বসু কবিতা সংগ্রহ' ২য় খন্ড, জানুয়ারি ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

১০ নরেশ গুহ, (সম্পাদিত) 'বুদ্ধদেব বসু কবিতা সংগ্রহ' ৩য় খণ্ড, জানুয়ারি ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ।

১১ ডক্টর কণিকা সাহা, 'আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য উদ্ভব ও বিকাশ', জুন ১৯৯৪, সাহিত্যলোক ৩২/৭ বি ড ন স্ট্রিট কলকাতা-৬

১২ ডক্টর কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা*', আগস্ট ১৯৮০, 'মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

১৩ ডঃ জগন্নাথ ঘোষ, 'নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু, বইমেলা ১৯৯৮, করুনা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা।

১৪ ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, (সম্পাদিত) 'জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সংগ্রহ' ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, মাওলা ব্রাদার্স ৩৯ বাংলাবাজার ঢাকা।

১৫ বার্ণিক রায়, 'কবিতায় মিথ', জুলাই ১৯৮৮, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা।

১৬ বার্ণিক রায়, 'কবিতাঃ চিত্রিত ছায়া', মহালয়া ১৩৭৮, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

১৭ বুদ্ধদেব বসু, 'কালিদাসের মেঘদূত', ডিসেম্বর ১৯৯৯, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার ঢাকা।

১৮ বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা' পৌষ ১৩৯৭, এস.সি সরকার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কালকাতা।

১৯ বুদ্ধদেব বসু, 'সাহিত্যচর্চা', ফাল্গুন ১৪১৩, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা।

২০ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ-১, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

২১ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ-৩, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

২২ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ-৭, নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

২৩ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ-৯ নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

২৪ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ-১১ নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

২৫ বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ-১২ নিরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

২৬ মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালে জীবনভাষ্য', ফেব্রুয়ারি ২০০৯, নবযুগ প্রকাশনী ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৭ সুদক্ষিনা বসু, 'বুদ্ধদেব বসু', ২০মে ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

২৮ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ', জানুয়ারি ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা।

সহায়ক প্রবন্ধ

১ অনুপম হাসান,' বুদ্ধদেব বসু ও বাংলা কাব্যনাটক, 'মহাদিগন্ত' ৯২ শারদীয় ২০০৭, সম্পাদক উত্তম দাশ, পৃ. ১৩৭- ১৫৯

২ উত্তম কুমার চক্রবর্তী 'মহাভারতে যৌনতা ও নারী অবস্থান', 'বোধ' অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৩০৩-৩১৩

৩ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক', 'বৈদগ্ধ্য' বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দময়ন্তী বসু সিং (আমন্ত্রিত সম্পাদক) মে, ১৯৯৯, পৃ. ১১৭-১২২

৪ কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং, 'যৌথ অবচেতন', অনুবাদ শাহাদুজ্জামান, 'নৃ' সাহিত্য ও শিল্প সংকলন। মিথ সংখ্যা, পৃ. ৫৯-৬৫।

৫ কৌশক সেন, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক : অমরা প্রাপ্তি', তাঁতঘর একুশ শতক নবপর্যায়, ১০-১১ সংখ্যা সম্পাদক-অরূপ আশ, ৩১ জানুয়ারি ২০০৬

৬ চিন্ময় গুহ, 'বুদ্ধদেব বোদলেয়ারের অনুবাদ : মিথ ও বাস্তব', অহর্নিশ জানুয়ারি ২০০৮ বিশেষ সংখ্যা সম্পাদক শুভাশিষ চক্রবর্তী

৭ জেমস জর্জ ফ্রেজার : 'গোল্ডেন বাউ, ভাষ্য ও ভাষান্তর : খালিকুজ্জামান, 'নৃ' সাহিত্য ও শিল্প সংকলন) মিথ সংখ্যা, পৃ. ১০৪-১১৫

৮ ড. কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'মিথের ব্যবহার : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাটক', 'নৃ' সাহিত্য ও শিল্প সংকলন) মিথ সংখ্যা, পৃ. ২৩০-২৩৫

৯ দীপেন্দু চক্রবর্তী, 'জন্মশতবর্ষে বুদ্ধদেব বসুর নাটকঃ আমার চোখে', 'জলার্ক', সম্পাদক মানব চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, বইমেলা ২০০৮, পৃ. ৯৬-১০৩

১০ নরথ্রপ ফ্রাই, 'সাহিত্য ও আর্কিটাইপ', অনুবাদ সৈয়দ আসিফ হাসান, 'নৃ' সাহিত্য ও শিল্প সংকলন) মিথ সংখ্যা, পৃ. ১৫৪-১৬৪

১১ বসন্ত লস্কর, 'মহাভারতে নারীর ভূমিকা বিষয়ক', 'বোধ' অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অক্টোবর ২০০১, পৃ. ২৬২-২৭১

১২ বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বুদ্ধদেব বসু : শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি', 'কালি ও কলম' সম্পাদক আবুল হাসনাত পঞ্চম বর্ষ, দশম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪১৫, পৃ. ৭-১০

১৩ বেগম আকতার কামাল, বুদ্ধদেব বসুর নন্দন স্বভাবে মিথের ভূমিকা', 'উলুখাগড়া', (সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক) সংখ্যা ১২, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৫৮-১৬৫

১৪ মীরা চক্রবর্তী, 'মহাভারতে রাজনৈতিক ধারণা এবং বিদ্রোহী নারী', 'বোধ' অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অক্টোবর ২০০১ পৃ. ২৭৭-২৮২

Dhaka University Institutional Repository

১৫ মধু চট্টোপাধ্যায়, 'মহামতি বিদুরের জন্মকথা', 'বোধ' অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অক্টোবর ২০০১, পৃ. ৩৪১-৩৪৬

১৬ মাহবুব সাদিক, 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক : অস্থির কালপুরাণ' 'কালি ও কলম', সম্পাদক আবুল হাসনাত, পঞ্চম বর্ষ, দশম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪১৫, পৃ. ১১-১৫

১৭ রিচার্ড চেজ, 'মিথ চর্চার প্রসঙ্গ কথা', অনুবাদ- নুজহাত আমিন মান্নান, 'নৃ' (সাহিত্য ও শিল্প সংকলন) মিথ সংখ্যা, পৃ. ১৭-২৫

১৮ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, '*তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, বুদ্ধদেব বসু আর এক নোটো, 'বৈদগ্ধ্য' বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দয়মন্তী বসু সিং (আমন্ত্রিত সম্পাদক) মে ১৯৯৯, পৃ. ২৬৮-২৭৬

১৯ সি কেরেনী, 'মিথ চেতনার আদি বিশ্ব' রূপান্তর : বজলুল করিম বাহার, 'নৃ' (সাহিত্য ও শিল্প সংকলন) মিথ সংখ্যা, পৃ. ১৬৫-১৭৪

সহায়ক গ্রন্থ

১ Alokeranjan Dasgupta, *Buddhadeva Bose*, 1977, Sahtya Akademi, New Delhi,

২ D.J. Burrows & others, *'Myths and Motifs in Literature*', 1973, The Shing Co. Inc. New York

৩ Laurence Coupe, *Myth*, 1997, London and New York Routeledge

৪ Maud Bodkin, *Archetypal Patterns in Poetry: Psychological Studies of Imagination*, London 1932, Oxford University pres.

৬ Stepen Spender, *The Struggle of the Modens* University paperbooks are published by Mathue and Co. ltd. 11 New Fetter Lane, London.

৭ Joseph Capbell *The Mask of Good* : *Primitive Mythology*. 1960, London Seckers and Werburg,

৮ Levi Strauss: *Myith and Meaning*, 2006, *Routledge*, London and New York, 2 Park Square, Mitton Park, Abingdon Oxon.

৯ T.S. Eliot,*'On Poetry and poets'*, 1961, Faber and Faber, London.

১০. T.S. Eliot *'Selected Essays'* Doaba Publications, 2000, 4497/14, Guru Nanak Market, Nai Sarak, Delhi.